প্রবোধ চন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

প্রবোধচন্দ্র সেন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

RABINDRANATHER SIKSHA-CHINTA
Rabindranath Tagore's Thoughts on Education
Prabodhchandra Sen

প্রকাশকাল :
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১, মে ৯। ১৩৬৮, বৈশাখ ২৫
দ্বিতীয় প্রকাশ (পরিবর্ধিত) : ১৯৮২, অগস্ট ১৫। ১৩৮৯, শ্রাবণ ৩০ / সি
তৃতীয় প্রকাশ : ১৯৯১, জানুয়ারি / সি

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
শ্রী সুনীল কুমার বক্সী
প্রিন্ট হাউস
৬৩এ/৩, হরিঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : শ্রীকমল শেঠ

মূল্য : পনের টাকা

Published by Shri Sibnath Chattopadhyay, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India, in the Ministry of Human Resources Development (Department of Education), New Delhi.

এই লেখকের গ্রন্থ-তালিকা

কালানুক্রমিক

বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থগুলির প্রকাশকাল স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত।

রবীন্দ্র-চর্চা

১. **ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত**। বিশ্বভারতী, ১৯৪৯ মে।
নূতন সংস্করণ প্রকাশিতব্য।

২. **রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা**। জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৬১ মে।
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ: রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, **১৯৮২** অগস্ট।

৩. **ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ**। এ. মুখার্জী, ১৯৬২ নভেম্বর।
পরিমার্জিত দ্বিতীয় প্রকাশ: দে'জ পাবলিশিং, আশু প্রত্যাশিত।

৪. **India's National Anthem**। বিশ্বভারতী, ১৯৪৯ মে।
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ: বিশ্বভারতী, **১৯৭২** মে।

৫. **ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ**। নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি-ভাষণ (১৯৭৭), বিশ্বভারতী।
মিত্র ও ঘোষ, **১৯৭৮** সেপ্টেম্বর।

সাহিত্য ও ইতিহাস-চর্চা

১. **ধর্মবিজয়ী অশোক**। পূর্বাশা, ১৯৪৭ এপ্রিল।
নূতন সংস্করণ প্রকাশিতব্য।

২. **ধম্মপদ-পরিচয়**। বিশ্বভারতী, **১৯৫৩ জুলাই**।

৩. **বাংলার ইতিহাস-সাধনা**। জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৫৩ সেপ্টেম্বর।
নূতন সংস্করণ প্রকাশিতব্য।

৪. **রামায়ণ ও ভারত-সংস্কৃতি**। জিজ্ঞাসা, ১৯৩২ এপ্রিল।
নূতন সংস্করণ প্রকাশিতব্য।

৫. **ভারতাত্মা কবি কালিদাস**। প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৫)।
প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩ জানুআরি: নূতন সংস্করণ প্রকাশিতব্য।

৬. **আধুনিক বাংলা: গীতিকবিতা**। নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি-ভাষণ (১৯৬৮), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
অণিমা প্রকাশনী, **১৯৭৮ অক্টোবর**।

ছন্দ-চর্চা

১. **বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান**। বিকাশচন্দ্র নন্দী, ১৯৩১ ডিসেম্বর।
দ্বিতীয় প্রকাশ : 'বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ' নামে।

২. **ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ**। বিশ্বভারতী, ১৯৪৫ জুন।
নূতন সংস্করণ প্রকাশিতব্য।

৩. **ছন্দ** (রবীন্দ্রনাথ)। লেখক-কর্তৃক সম্পাদিত : সটীক ও পরিবর্ধিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ : বিশ্বভারতী, ১৯৬২ নভেম্বর।

৪. **ছন্দ-পরিক্রমা**। জিজ্ঞাসা, ১৯৬৫ মে।
নূতন সংস্করণ প্রকাশিতব্য।

৫. **ছন্দ-জিজ্ঞাসা**। জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪ এপ্রিল।

৬. **ছন্দ** (রবীন্দ্রনাথ)। লেখক-কর্তৃক সম্পাদিত : পুনর্বিন্যস্ত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ : বিশ্বভারতী, ১৯৭৬ জানুআরি।

৭. **বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা** (মুখ্যতঃ লেখকের)। জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭ এপ্রিল।

৮. **ছন্দ-পরিক্রমা** (নূতন)। প্রথম খণ্ড জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭ সেপ্টেম্বর।
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিতব্য।

৯. **বাংলা ছন্দ-চিন্তার ক্রমবিকাশ**। শরৎচন্দ্র স্মৃতি-ভাষণ (১৯৭৪), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অণিমা প্রকাশনী, ১৯৭৮ এপ্রিল।

১০. **ছন্দ-সোপান**। অণিমা প্রকাশনী, ১৯৮০ জুলাই।

১১. **বাংলা ছন্দ-সাহিত্য**। অণিমা প্রকাশনী, ১৯৮০ অগস্ট।

১২. **বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ**। রবীন্দ্রচর্চা-ভবন, ১৯৮১ এপ্রিল।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এখন থেকে ভবিষ্যতে, আমার জীবনকালে ও তৎপরে, আমার যেসব অ-গ্রন্থভুক্ত মুদ্রিত রচনা গ্রন্থকারে প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, বর্তমানে অপ্রাপ্য যেসব গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রত্যাশিত এবং বর্তমানে প্রচলিত যেসব গ্রন্থ ভবিষ্যতে অপ্রাপ্য হবে, এই তিন শ্রেণীভুক্ত সব গ্রন্থের আমার আইনসম্মত সমস্ত স্বত্বাধিকার আমি কিছু শর্তসাপেক্ষভাবে সর্বসাধারণের অনুকূলে দান করলাম। প্রধান শর্ত দুটি।—এক, যেসব বই সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণে আমি অক্ষম বা অনিচ্ছুক, সেসব বই আমার অনুমোদিত কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে সম্পাদন করিয়ে প্রকাশ করতে হবে। দুই, আমার মৃত্যুর পরে আমার পত্নী শ্রীমতী রুচিরা সেনের অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করতে হবে। আর, তাঁর মৃত্যুর পরে সমস্ত গ্রন্থ ও রচনা প্রকাশের সম্পূর্ণ নিঃশর্ত অধিকার হবে সর্বসাধারণের। অর্থাৎ, আমার অভিপ্রায় যত দিন আমি স্বেচ্ছায় ও সুস্থ মনে এই অভিপ্রায় প্রত্যাহার বা পরিবর্তন না করব ততদিন এই বিজ্ঞপ্তিপত্রই আইনসম্মত দলিল বলে গ্রাহ্য হবে

যেসব বইয়ের যে যে সংস্করণ আমার উদ্‌যোগে অথবা আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে বা হবে, শুধু সেসব বইয়ের সেই সেই সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলির স্বত্বাধিকার আপাততঃ আমারই থাকবে।

আমার যেসব বই বর্তমানে ক্রয়লভ্য নয়, উপরের তালিকায় সেগুলির নাম সুস্পষ্টরূপে. নির্দেশ করা গেল। এ বিষয়ে আগ্রহী যে-কানো সাহিত্যচর্চা-প্রতিষ্ঠান, প্রকাশ-সংস্থা বা ব্যক্তিবিশেষ সাক্ষাতে বা চিঠি লিখে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে বাকি গৌণ শর্তগুলি সবিশেষে জানানো যাবে।

'রুচিরা', শান্তিনিকেতন

৩০ শ্রাবণ, ১৩৮৮ ১৫ অগস্ট ১৯৮২

প্রবোধচন্দ্র সেন

নিবেদন

দীর্ঘকাল পূর্বে (১৯৩৩) মানুষের জীবনতত্ত্ব-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পুনরাবৃত্তি করেছিলেন এই চিরন্তন সত্যবাণী—"জনসংঘের শ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করবার জন্যে তার রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জিত হয়ে থাকে। সমস্ত জাতি বৃহৎ জীবনযাত্রায় তার থেকে বঞ্চিত হলে ইতিহাসে ধিক্কৃত হয়।" সুখের বিষয় ইতিহাসের সেই ধিক্কারের আঘাতে বহুকালের সুপ্তিমগ্ন ভারত সহসা জেগে উঠে জড়তার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে স্বরাষ্ট্রের অধিকার অর্জন করেছে আপনার অন্তর্নিহিত একতা ও সুবিপুল সংকল্প-বলে। স্বরাষ্ট্রের অধিকারে বিকশিত হয় একটা জাতির পৌরুষশক্তি, আর স্বভাষার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয় তার আত্মার মহিমা। স্বভাষার বৃহৎ ভূমিতে হাজার শিকড় মেলবার সুযোগ না পেলে জাতীয় চিত্ত টবে-লালিত বনস্পতির মতো খর্বকায় ও গৌরব-বর্জিত হয়ে থাকে, ফলফুল বিতরণের সার্থকতা থেকেও হয় বঞ্চিত। স্বরাষ্ট্রের সহায়তায় বাড়ে জাতীয় ধনসম্পদ, তার ঐশ্বর্যগরিমা ; আর স্বভাষার আশ্রয়ে বাড়ে তার চিত্তসম্পদ, তার সাহিত্যমহিমা। আমরা দীর্ঘকাল পরে স্বরাষ্ট্রের অধিকার কেড়ে নিয়েছি বিদেশীর হাত থেকে। কিন্তু স্বভাষার অধিকার কেড়ে নিতে পারি নি অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে—সে শত্রু লুকিয়ে আছে আমাদের অন্তরের বিদেশী শিক্ষার মোহময় বেশে। নিজের মনের অন্তরালে থেকে যে সংস্কার মিত্ররূপে শত্রুতা করে, তাকে সহজে চেনা যায় না। তার প্রচ্ছন্ন বৈরাচারকে প্রতিহত করাও দুঃসাধ্য হয়। এইজন্যই যে বাঙালিজাতি স্বরাষ্ট্রের অধিকার লাভের জন্য দীর্ঘকাল বধ-বন্ধনের অপরিসীম দুঃখবরণে কুণ্ঠিত হয় নি, স্বভাষার অধিকার লাভের জন্য সেই বাঙালিজাতির সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার আভাস-মাত্রও দেখা গেল না। বরং ইংরেজির মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বারবার কারাবরণের প্রচেষ্টাই দেখা গিয়েছে। অথচ এই বঙ্গভূমিরই পূর্বাঞ্চলের বাঙালিরা স্বভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করেছে, অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। ফলে স্বাধীন পূর্ববাংলায় মাত্র দশ বৎসরের প্রচেষ্টাতেই শিক্ষার সব স্তরে এবং সর্ববিধ সরকারি ও বেসরকারি কাজকর্মে, এক কথায় জাতীয় জীবন-চর্যার সর্বক্ষেত্রে, স্বভাষার পূর্ণাধিকার প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তা বলে ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা তথা ইংরেজি ভাষা-বাহিত বিদ্যাচর্চা সেখান থেকে নির্বাসিত হয় নি। আর, এ দিকে আমরা স্বভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইও

করি নি এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদ্গামিতার জন্য লজ্জাবোধও করি না। এই মানসিক অসাড়তাই সব চেয়ে শোচনীয়।

কিন্তু পরাধীনতার দুঃসময়েও রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ শিক্ষায় ও জাতীয় মননক্ষেত্রে স্বভাষাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার কথা বারবার বলে গেছেন। অথচ তাঁর কথা বারবারই 'ইংরেজি-শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য' বলে গণ্য হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর তিরোধানের চল্লিশ বছর পরে আমাদের অবাধ স্বাধীনতার যুগেও ইংরেজি-শিক্ষার মায়ামুগ্ধ মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না, সে মানসিকতার কাছে রবীন্দ্রনাথের আকুল আবেদন এখনও সমভাবে অশ্রাব্য ও অগ্রাহ্য হয়েই রয়েছে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রবাণীর অপব্যাখ্যাও এখন আর বিরল নয়। শিক্ষাদানে ও বিদ্যাচর্যায় মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি, এবিষয়ে রবীন্দ্র-ভাবনার বিশদ পরিচয় দেওয়াই এই পুস্তকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বর্তমানের তর্ককোলাহলে এ বিষয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই এই পুস্তকে। তাই এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

২

১৮৮৩ সালে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে, শিক্ষায় ইংরেজি ও বাংলার আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলাসাহিত্য উন্নতিলাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গ-বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।" —এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি ইংরেজি ভাষা-শেখার বিরোধী তো ছিলেনই না, বরং ইংরেজি শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতেই আগ্রহী ছিলেন। অর্থাৎ শিক্ষার উঁচু পর্যায়ে ইংরেজি শিখতে হবে জ্ঞান আহরণের জন্য এবং সে জ্ঞানকে বাংলায় প্রকাশ করে একদিকে সমৃদ্ধ করতে হবে নিজের সাহিত্যকে আর অন্যদিকে বাংলাবিদ্যালয়ের যোগে সে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বসাধারণের মধ্যে। বোঝা যাচ্ছে—সর্বজনীন লোকশিক্ষার বাহন হবে বাংলা; তবে এ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা যেমন প্রত্যক্ষতঃ বারিত হয় নি, তেমনি উঁচু পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও সকলের পক্ষে

আবশ্যিক বলেও নির্দিষ্ট হয় নি। ১৮৮৩ সালের এই অবস্থান থেকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে একটুও সরে যান নি। পরবর্তী কালে এই উভয়বিধ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হয় মাত্র। উঁচু পর্যায়ে শুধু ইংরেজি কেন, ফরাসি জরমান প্রভৃতি সমৃদ্ধ ভাষা শিখলে আরও ভাল হয়, এ কথাও তিনি বলেছেন বারবার। তবে শিক্ষার ও গবেষণার উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যাচর্চার একমাত্র বাহন হওয়া চাই বাংলা (অবশ্য বাংলাদেশে), আর যদি এখনই তা সম্ভব না হয় তবে অগত্যা সাময়িকভাবে বিকল্পে ইংরেজি বা বাংলা—এই ছিল তাঁর সুদৃঢ় অভিমত। আর যারা ইংরেজি ভাষা যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে অক্ষম, শিক্ষাজগৎ থেকে তাদের নির্বাসিত করার, অর্থাৎ তাদের ললাটে চিরমূর্খতার ছাপ মারার, পক্ষপাতী তিনি একেবারেই ছিলেন না। ইস্কুল পর্যায়েই যদি কারও ইংরেজি ভাষা শেখার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা প্রকাশ পায় তবে তাকে ইংরেজি ছাড়াই অন্যান্য বিষয়ে বিদ্যার্জনের পূর্ণ অধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। বস্তুতঃ যার যতটুকু মেধা তাকে ততটুকু বিদ্যা অর্জনের সুযোগ দেওয়াই তো সুস্থ জনকল্যাণ-চিন্তার পরিচায়ক। আর, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজিশিক্ষা অনাবশ্যক বলেই মনে করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত লোকশিক্ষা-সংসদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিই তার প্রমাণ। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ অভিমত অতি সংক্ষেপে অথচ সুশৃঙ্খলভাবে বিবৃত হয়েছে স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনে। (দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ, পৃ. ২৪-২৫।)

এবার আসি স্কুলশিক্ষার প্রসঙ্গে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কথা। এটি লোকশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রূপে পরিকল্পিতও হয় নি, পরিচালিতও হয় নি। উচ্চশিক্ষালাভের সোপান হিসাবেই এর আবির্ভাব। তাই এর শিক্ষাক্রম থেকে ইংরেজি বর্জনের চিন্তাও আসে নি প্রতিষ্ঠাতার মনে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের মনের মতো করে গড়বার সুযোগও পান নি কখনও। কারণ এখানকার পাঠ শেষ করে ছাত্রদের পাস করতে হত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা। ইংরেজিতে ভাল দখল না থাকলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। এখানে অন্ততঃ ছয়-সাত বৎসর পড়ে দুটি অতি মেধাবী ছাত্র আমাদের ইস্কুলে এসে ভরতি হল নবম শ্রেণীতে। আমার সহপাঠী হিসাবে তাদের সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা হয় তা অব্যাহত ছিল তাদের জীবনান্তকাল পর্যন্ত।

দুই বৎসর তাদের সঙ্গে পড়ে খুব ভালো করেই জেনেছি শান্তিনিকেতন ইস্কুলে ইংরেজি-শিক্ষার মান আমাদের সরকারি জিলা স্কুলের (কুমিল্লা) মানের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। এই গেল উপরের দিক্। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম মেনে সমান তালে না চললে এখানে বাইরের ছাত্র খুব কমই আসত। নীচের দিকেও তাই। প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরেজি না শেখালে সেই যুগে কেউ এখানে ছেলে পাঠাতেন না। এসব কারণে পাঠক্রম নিরূপণে রবীন্দ্রনাথের হাত-পা বাঁধা ছিল। কাজেই শান্তিনিকেতনে অনুসৃত পাঠক্রমের প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রকথিত শিক্ষাদর্শের প্রতিবাদ করলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তা প্রসঙ্গে নিজের বিদ্যালয়ের কথা যে খুব কমই বলেছেন, এটা অহেতুক নয়। নিজের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষাক্রম রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি, তৎকালীন নানা প্রতিকূল সামাজিক প্রভাবে। বিশ্বভারতীর আরও নানা বিভাগেই তাঁর ইচ্ছা ও চিন্তা প্রতিফলিত হতে পারে নি ওই একই কারণে।

তাহলে রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির বিশিষ্টতা বাকি রইল কি? রইল বই কি, অনেক কিছুই বাকি রইল। পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন ও শিক্ষাদান-প্রণালী, ছাত্রশিক্ষক-সম্পর্ক, চরিত্রগঠন ও জীবনচর্যার আদর্শ, প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত মেধা-বিকাশের আনুকূল্য ইত্যাদি। একমাত্র শিক্ষাদান-প্রণালী ছাড়া অন্য কোনো বিষয় বর্তমান গ্রন্থের বিবেচ্য বিষয় নয়। বিদেশী শাসনাধীন ভারতে শিক্ষার সব স্তরে সব শিক্ষণীয় বিষয়েরই বাহন ছিল একমাত্র ইংরেজি ভাষা আর সে ভাষা শিখতে হত শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই। এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে একদিকে দেশব্যাপী জনশিক্ষার পথ অবরুদ্ধ হল আর অন্যদিকে দেশের অসংখ্য লোক উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। ব্যাপক সুশিক্ষার অভাবে সমগ্র দেশের জনশক্তি তথা মনঃশক্তি বিকাশের কোনো সুযোগ থাকল না। এই অশিক্ষাজনিত শক্তিহীনতাই বিদেশী শাসন-ব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী হবার সহায়তা করেছে। এ কথা সত্য যে, এই কালে আমাদের দেশে অনেক মনস্বী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু তা হয়েছে বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থার গুণে নয়, হয়েছে ওই কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার বাধা লঙ্ঘন করে বহির্জগৎ থেকে আধুনিক জ্ঞানসম্পদ আহরণের প্রতিভাশক্তির গুণে। শিক্ষাব্যবস্থা যদি স্বাভাবিক তথা মেধাবিকাশের অনুকূল হত তাহলে ওই সময়ের মধ্যেই দেশে আরও অনেক বেশি শক্তিমান্ প্রতিভাধর ব্যক্তির

আবির্ভাব হত।* যা হক, এসব কারণেই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই ইংরেজির পরিবর্তে মাতৃভাষাকেই সর্ব স্তরে সব শিক্ষার, এমন কি ইংরেজি ভাষা শিক্ষারও বাহন করার প্রস্তাবকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষার নিম্নস্তরে (একেবারে প্রথম স্তর নয়) ইংরেজি শেখাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল অভিভাবকদের আগ্রহে ও কালের দাবি মেটাবার প্রয়োজনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শেখাবার প্রণালীটা দিলেন বদলে, বাংলাকেই করলেন তার বাহন। কেননা, ইংরেজি যখন শেখাতেই হবে তখন সহজ স্বাভাবিক প্রণালীতেই শেখানো উচিত। কিন্তু বাংলাভাষার যোগে ইংরেজি শেখাবার উপযোগী বই তখন ছিল না। এজন্যই তাঁকে প্রথম ইংরেজি-শিক্ষার্থীদের উপযোগী বেশ কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকও লিখতে হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার একেবারে গোড়া থেকেই ইংরেজি-শেখার পক্ষপাতী ছিলেন। বরং তার বিপরীত কথাই বারবার বলেছেন নানা উপলক্ষে। এই বইগুলির দ্বারা শুধু এটুকু প্রমাণ হয় যে, যে বয়সেই ইংরেজি শেখা আরম্ভ হক এই প্রণালীতে শেখালেই ইংরেজি ভাষা সহজে ও স্বল্প সময়ে আয়ত্ত করা যাবে। আমিও তাই মনে করি। বস্তুতঃ আমি আমার বড় দুই কন্যাকে ইংরেজি শেখাতে শুরু করেছিলাম বাংলা-শিক্ষা অনেকখানি পাকা হবার পরে, শুরু করেছিলাম 'ইংরেজি-সোপান' (দুই খণ্ড) ও 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' বই দিয়েই। তাতে সুফল পেতে দেরি হয় নি। (আমার অন্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষারম্ভ হয় শান্তিনিকেতনেই।) এইজন্যই আমি মনে করি 'ইংরেজি-সোপান' প্রভৃতি সবগুলি বই পুনঃ-প্রকাশিত হওয়া এবং অনুরূপ আরও নূতন নূতন বই রচিত হওয়া উচিত দেশের ইংরেজি-শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। তাতে দেশে ইংরেজিশিক্ষার প্রসার দ্রুততর হবে, ল কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হবে না।

৩

আজকাল আর-এক প্রশ্ন শোনা যায়—রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় ইংরেজি পড়েছিলেন কিনা। তিনি জন্মেছিলেন যে কালে, সেকালে দেশে চলছিল ইংরেজি-শিক্ষার প্রবল জোয়ার, আর যে পরিবারে তাঁর জন্ম সে পরিবার ছিল তৎকালীন শিক্ষাসংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে। দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ উভয়েই

ছিলেন ইংরেজি-বিদ্যায় অভিজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের দাদাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজিশিক্ষার কথা কারও অজানা নয়। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো শুধুই ইংরেজি নয়, ফরাসি সাহিত্যে ছিলেন কৃতবিদ্য। এই পরিবারে শুধু ছেলেদের নয়, মেয়ে-বউদেরও সযত্নে ইংরেজি শেখানো হত। এই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিশিক্ষার স্পর্শলেশ-মুক্ত ছিলেন, এমন কথা কি কেউ ভাবতে পারেন? তাঁর নিজের লেখা থেকেই জানা যায়, বাড়ির পাঠশালায় অল্পকাল পড়ার পরেই তাঁকে ইংরেজি-ইস্কুলে ভরতি করা হয়। কিন্তু তাঁর শিশুমনে ইংরেজিশিক্ষার ছাপ পড়বার আগে অতি অল্প বয়সেই তাঁকে ভরতি করা হয় 'নর্মাল স্কুল' নামক বাংলা-বিদ্যালয়ে। এই ইস্কুলে তাঁকে 'দীর্ঘকাল' বাংলা শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ। এইজন্য উত্তরকালে তিনি তাঁর 'সেজদাদার উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম' নিবেদন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য এই ('জীবনস্মৃতি', বাংলাশিক্ষার অবসান)—"ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল।...বাঙালির পক্ষে ইংরেজি-শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই।" কিন্তু নর্মাল স্কুলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করার, সুযোগ তিনি পান নি। কারণ তিনি যখন ইস্কুলে উচ্চতম ক্লাসের ('ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের') এক ক্লাস নীচে পড়ছিলেন, তখন তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ একদিন আকস্মিকভাবে তাঁর ও তাঁর দুই সহপাঠীর (সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ) বাংলা পড়া বন্ধ করে দিলেন। কারণ সত্যপ্রসাদ সৌজন্যরক্ষার আগ্রহে বুদ্ধির দোষে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে 'প্রাকৃত বাংলায়' কথা না বলে 'সাধু গৌড়ীয় ভাষায় বাক্যবিন্যাস' করেছিলেন। তাতেই দেবেন্দ্রনাথের মনে হল বাংলা-বিদ্যালয়ে পড়ার ফলে তাঁদের বাংলাভাষা তার বাংলাত্বকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বতঃই মনে হয়, এ ভাবে হঠাৎ তাঁদের বাংলাশিক্ষা বন্ধ না করলেই বোধ হয় ভালো হত। কারণ সত্যপ্রসাদ ও দেবেন্দ্রনাথ, দু-জনেরই ভুল ধারণার ফলে রবীন্দ্রনাথের বাংলাশিক্ষার পালা এমন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। তার ফলও যে ভালো হয় নি তা জানা যায় রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকেই। তাঁর বাংলাশিক্ষা যথারীতি সমাপ্ত করার সুযোগ পেলে বালক রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধি আরও পাকা হত কি হত না তা বলা যায় না; কিন্তু নর্মাল স্কুল ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ঐতিহাসিক গৌরব যে বাড়ত তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের বাংলাশিক্ষার পালা হঠাৎ শেষ হয়ে যাবার পরে তাঁকে (এবং তাঁর দুই সহপাঠীকে) বেঙ্গল একাডেমি নামের এক 'ফিরিঙ্গি স্কুলে' ভরতি করে দেওয়া হল। এ বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি এই ('শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ'—"ইংরেজি-বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুলমাস্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।" তা সত্ত্বেও তাঁর ইংরেজিশিক্ষা বাড়িতেই চলতে থাকে তাঁর গৃহশিক্ষক, পিতা ও দাদাদের সযত্ন চেষ্টায় এবং তাঁর নিজের আন্তরিক আগ্রহে। তাঁর এই ইংরেজিশিক্ষার বিবরণ টুকরো-টুকরো ভাবে ছড়িয়ে আছে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের নানা অধ্যায়ে। বর্তমান প্রসঙ্গে দুটি-মাত্র তথ্য ('নানা বিদ্যার আয়োজন') স্মরণীয়—"বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ...প্যারি সরকারের প্রথম-দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনোমতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্‌স্ কোর্‌স্ অফ রিডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল।" এ ভাবেই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি-শিক্ষা শুরু হয়েছিল গৃহশিক্ষক অঘোরবাবুর কাছে। তখন তাঁর বয়স ছিল এগারো বা বারো বছর। 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে নর্মাল স্কুলের শিক্ষা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—"শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজিবর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।" এই প্রবন্ধেই অন্যত্র বলা হয়েছে—"অন্ততঃ এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।" এই দুই উক্তি থেকে মনে হয়, নর্মাল স্কুলে বাংলা-শিক্ষার পালা শেষ হবার একবছর আগেই তাঁর ইংরেজি শেখা শুরু হয়েছিল গৃহশিক্ষক অঘোরবাবুর কাছে। আধুনিক কালের হিসাবে তখন তিনি ছিলেন ইস্কুলের অষ্টম মানের ছাত্র।

সবশেষে তাঁর আর-একটি উক্তি ('শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ') স্মরণ করছি—"ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভরতি হয়েছিলুম। তাই বুঝেছি—মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত ক'রে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।"

কেউ কেউ মনে করেন উৎকৃষ্ট ইংরেজি-শিক্ষার গুণেই তিনি সে ভাষা প্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু মনে করতেন, যথারীতি ইংরেজি-শেখার ভালো সুযোগ না পেয়েও তিনি যে দেশে-বিদেশে অনায়াসেই ইংরেজি ভাষা প্রয়োগ করে এসেছেন তার মূলে আছে ভালো

বাংলা-শেখার প্রবর্তনা। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথা এই—"ইস্কুল-পালানো অবকাশে যেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি। তার প্রধান কারণ—শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত।...আমার ইংরেজি-শিক্ষার সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি-জানা ভদ্রসমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে। নিশ্চিত জানি, তার কারণ—শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়।" তাঁর সুস্পষ্ট উক্তির পরে এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণের আর কোনো অবকাশ থাকতে পারে বলে মনে করি না।

৪

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণ 'শিক্ষা, সাহিত্য ও জন-জীবন,' 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে' এবং 'বাঙালি জাতি ও বাংলার জাতীয় সাহিত্য' নামে তিনটি নূতন প্রবন্ধ যোগ করা হল। এই তিন প্রবন্ধেরও প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষাযোগে জাতীয় জীবন-বিকাশ সাধনে মাতৃভাষার গুরুত্ব দেখানো। তবে এগুলিতে স্কুল-কলেজের চেয়ে জনশিক্ষার গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে কিছু বেশি। তাছাড়া শেষ প্রবন্ধটিতে আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্যকে ব্যাপকতর পটভূমিকায় স্থাপন করে বক্তব্য বিষয়টাকে ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছি। এই শেষ প্রবন্ধটির আর-এক বিশিষ্টতা এই যে, এটিতে আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনার কিছু বিশদ পরিচয় দিতে সচেষ্ট হয়েছি। আজকাল কেউ-কেউ বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরেজিশিক্ষার একজন বড় অনুকূল প্রবক্তা রূপে উপস্থাপন করেছেন। কেউ-কেউ আবার তাঁর চিন্তাভাবনাকে সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শে কলুষিত বলেও মনে করেন। এই দুই অভিমতই যে অন্তঃসারহীন, এই শেষ প্রবন্ধে তাও দেখানো হয়েছে তথ্যযুক্তি দিয়ে।

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত ও প্রকাশিত। এই কারণে এগুলিতে অনিবার্যরূপেই কিছু-কিছু পুনরুক্তি ঘটেছে। গ্রন্থে গ্রহণকালে এই

পুনরুক্তি-পরিহার করা সংগত মনে হয় নি। কারণ এই গ্রন্থের তো কোনো ধারাবাহিক সামগ্রিকতা নেই। প্রত্যেক রচনার স্বয়ংসম্পূর্ণতাই এই গ্রন্থের অভিপ্রেত বিশিষ্টতা। পুনরুক্তি বর্জন করতে গেলে এই সম্পূর্ণতা ব্যাহত হবে। তাছাড়া, কোনো-কোনো কথা বারবার শোনাবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই মনে করি। রবীন্দ্রনাথকেও অনেক কথা বারবার বলতে হয়েছিল নিজের চিন্তাভাবনা ও মর্মবেদনাকে স্বজাতির মর্মগত করার অভিপ্রায়ে। এই গ্রন্থ যদি পাঠকদের চিন্তাকে কিছুপরিমাণে উদ্রিক্ত করে ও কর্মের প্রণোদনা যোগায় তাহলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

এই নিবেদন শেষ করার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের দুটি উক্তি আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একটি উক্তি ('জাপান-যাত্রী' গ্রন্থ) সংকলিত হয়েছে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়। আর-একটি উক্তি এই—

> "অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়।···ইংরেজি ভাষা কেবল যে আমাদের জানতে হবে তা নয়, তাকে ব্যবহার করতে হবে। সেই ব্যবহার বিদেশী আদর্শে যতই নিখুঁত হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশীয়দের এবং কর্তাদের কাছে আমাদের সমাদর।"—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬)

দেশ যে স্বাধীন হয়েছে তা মনে প্রাণে অনুভব করতেই পারছি না আমরা। কারণ ভাষার স্বাধীনতা পাই নি এখনও। দেশের বুকে সে খোলা হাওয়া বয়ে যাবার কোনো আভাসও দেখা যাচ্ছে না।

এই গ্রন্থ-সম্পাদনার কাজে প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুগতা সেনের কাছে আর শেষ পর্যায়ে পেয়েছি অধ্যাপক (জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা) শাহাজান ঠাকুরের কাছে। শ্রেণীবদ্ধ নির্দেশিকা রচনার কাজে আমি বহুলাংশেই নির্ভর করেছি শ্রীমতী কাকবাকী দত্ত (পম্পা) ও শ্রীমতী বিপাশা দত্ত (মুক্তা), আমার এই দুই পরমাদৃতা নাতনীর প্রখর বিচারবুদ্ধির

উপরে। এই গ্রন্থের শেষাংশের প্রেসকপি তৈরি করে দিয়েছেন স্থানীয় রবীন্দ্রভবনের সুদক্ষ যন্ত্রলিপিকর শ্রীজানকীনাথ দত্ত। প্রুফ সংশোধনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অভিজ্ঞ কর্মী শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। গ্রন্থপ্রকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক শ্রীদিব্যেন্দু হোতার সাগ্রহ সহযোগিতা পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি। এদের সকলকেই পরম আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমার সস্নেহ আশীর্বাদ।

'রুচিরা', শান্তিনিকেতন
৭ অগস্ট ১৯৮২। ২২ শ্রাবণ ১৩৮২ প্রবোধচন্দ্র সেন

লেখকের বক্তব্য

(১৯৬১ সংস্করণ)

ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলা-দেশে যে অভ্যুদয় ঘটেছে তার মূলে আছে নবশিক্ষার উদ্‌বোধন ও বাংলা সাহিত্যের নব-উদ্যম। এই দুইএর সমন্বয়েই বাঙালিচিত্তের উজ্জীবন। কিন্তু এই সমন্বয় আজও পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। ফলে বাঙালিচিত্তের উজ্জীবনও অর্ধপথেই স্তব্ধ হয়ে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। যদি তাই হয় তবে তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। যে শিক্ষা ও সাহিত্য-সমন্বয়ের পরশপাথরের স্পর্শে আমাদের জীবনের একাংশ-মাত্র সোনা হয়ে উঠেছে, সেই পরশপাথরটিকে যদি আমরা অজ্ঞাতে বা অবহেলায় অস্বীকার করি, তবে অসমাপ্ত অভ্যুদয়ের দৃষ্টান্ত হিসাবেই বাঙালির নাম ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে থাকবে।

বাকি অর্ধ-ভগ্নপ্রাণ
আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।—

এই করুণ কাহিনীই কি আমাদের পক্ষে সত্য হয়ে থাকবে?

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনস্বী পুরুষই বাংলা-দেশে শিক্ষা ও সাহিত্যের সমন্বয় সাধনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক কালে তাঁদের মধ্যে অগ্র-স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ। বিংশ শতকে বাঙালিচিত্তের পরিপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই দুইজন। কিন্তু তাঁদের আরব্ধ ব্রতের সমাপ্তি সাধনের কোনো প্রয়াস বাংলাদেশে আজ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁদের আরব্ধ কর্মকে সমাপ্তিদান আমাদের অবশ্য-সম্পাদনীয় দায়িত্ব। তাই মনে করি আমাদের শিক্ষানায়কদের চিন্তা ও কর্মধারার কথা নূতন করে স্মরণ করবার দিন এসেছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার কিছু পরিচয় দিতে প্রয়াসী হয়েছি। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেবার যোগ্যতা আমার নেই। জাতীয় চিত্তোদ্‌বোধনের প্রেরণাস্থল হিসাবে শিক্ষার যে সার্থকতা, আমি প্রধানতঃ সে দিক্‌টিকেই আমার আলোচনার বিষয়রূপে গ্রহণ করেছি। তারও মূলে রয়েছে শিক্ষার সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের যোগের প্রশ্ন। শিক্ষার বাহন-সমস্যার কথা আমাদের চিন্তানায়কদের মনে দেখা দিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রেরও বহু পূর্বে

থেকে। তারপর অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে তাঁরা এই সমস্যাকে বারবার দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন ও তার সমাধানের উপায়ও নির্দেশ করেছেন। শিক্ষার বাহন-সমস্যাকে তাঁরা এত যে প্রাধান্য দিয়েছেন, তার কারণ আমাদের সব সমস্যার মূলে রয়েছে এই সমস্যা। আমাদের শিক্ষাসৌধ যতদিন না জাতীয় মাতৃভাষা ও সাহিত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন তা স্থায়িত্বও পাবে না, জাতীয় জীবনের অধিষ্ঠানরূপেও পরিগণিত হবে না।

রবীন্দ্রনাথ এই মূল-সমস্যাটির প্রতি বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তথাপি আজ পর্যন্তও যদি আমাদের শিক্ষানায়কদের কর্মধারা রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত না হয়ে থাকে, তবু বিচলিত হবার কারণ নেই। কারণ কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী। মনস্বীদের সত্যচিন্তা কখনও নিষ্ফল হয় না। কালক্রমে কোথাও না কোথাও সে চিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হবেই। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আশা ও উৎসাহের বাণী নতুন করে স্মরণ করি।—

> "আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেছে এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।…বাঙালির চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত। নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে যত সহজ হয়েছিল, এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার দীক্ষা জাপানের মতো আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই তার বেশি আমাদের পক্ষে দুর্লভ। য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত তাহলে, কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালি দিক্ থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত। আজ নানা দিক্ থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠছে, তবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালির ছেলে প্রতিদিন মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি করে মরছে। বস্তুত, ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলা-দেশে যে একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায় তার এক-মাত্র কারণ আমাদের প্রতিহত গতি।…
>
> একথা ভুললে চলবে না, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালির উপরেই পড়েছে।"—'জাপান-যাত্রী', পরিচ্ছেদ ১৫

আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য কি ও স্বাধীন ভারতে শিক্ষিত বাঙালির দায়িত্ব কি, তা

অকুণ্ঠকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীতে। আশা করব পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলা একদিন মাতৃভাষার যোগে মুক্তশিক্ষার পথে অগ্রসর হয়ে উক্ত সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের দায়িত্বভার পূর্ণ শক্তিতেই গ্রহণ করবে।

এই দিকে লক্ষ রেখেই এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি রচিত। শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। জাতীয় চিত্তের প্রাণশক্তি নির্ভর করে এই তিনের মুক্ত-প্রকাশের উপরে। এই ত্রিবিধ মুক্তির যোগে কিভাবে জাতীয় জীবন নবশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাসূত্র অবলম্বনে তাই হচ্ছে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান সময়ে শিক্ষার নানাবিধ সমস্যা, বিশেষতঃ তার বাহনসমস্যা, সর্বভারতীয় শিক্ষানায়কদের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে প্রবল ভাবেই। এ ক্ষেত্রে বাংলার বিশেষ কর্তব্য বা দায়িত্ব কি, আমাদের মনীষীরা কোন্ দিকে পথনির্দেশ করেছেন, এই পুস্তকে পরোক্ষভাবে তারও আভাস দিতে প্রয়াসী হয়েছি। এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয়গুলি কালোপযোগী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আলোচনা বিষয়োপযোগী হয়েছে কিনা তাঁর বিচারের ভার পাঠক-সমাজের উপরে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার আলোকে এইসব সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়কে যদি কিছুমাত্রও পরিস্ফুট করতে সমর্থ হয়ে থাকি এবং পাঠকসমাজ যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে দেশব্যাপী শ্রদ্ধাঞ্জলির একটি পর্ণমাত্র রূপে গ্রহণ করেন, তবেই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

শান্তিনিকেতন

৩০ চৈত্র ১৩২৮

প্রবোধচন্দ্র সেন

অধ্যায়ানুক্রম

প্রবন্ধ পরিচয়

কালানুক্রমিক

যেসব প্রবন্ধের নাম পরিবর্তিত হয়েছে সেগুলির পূর্বনাম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১। শিক্ষার লক্ষ্য ('এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো')।
দেশ, ১৯৫১ সেপ্টেম্বর। ১৩৫৮ শারদীয় সংখ্যা।

২। শিক্ষাসমস্যা। দেশ, ১৯৫১ নভেম্বর। ১৩৫৮ কার্তিক ১৬।

৩। বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ, ১৯৫২ সেপ্টেম্বর। ১৩৫৯ ভাদ্র ২৮, আশ্বিন ৪, ১১।

৪। সাহিত্যের মুক্তি। সভাপতির অভিভাষণ (১৯৫৩ মার্চ। ১৩৫৯ চৈত্র ৭), সাহিত্য-পরিষদ্‌, মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য-সম্মেলন—বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির। দেশ, ১৯৫৩ এপ্রিল। ১৩৫৯ চৈত্র ২৮।

৫। শিক্ষার মুক্তি। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৫৫ জানুআরি ২৬। ১৩৬২ মাঘ ১২।

৬। ভাষার মুক্তি। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৫৬ জানুআরি ২৩। ১৩৬২ মাঘ ১২।

৭। বিশ্বভারতীর শিক্ষানীতি ('বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী')। দেশ, ১৯৫৯ মে। ১৩৬৬ জ্যৈষ্ঠ ১। —এই প্রবন্ধে প্রকাশিত (পৃ. ৪৩-৪৪) মহাত্মা গান্ধীর মূল চিঠিখানি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

৮। শিক্ষা, সাহিত্য ও জনজীবন। ('বাংলা সাহিত্যে জনজীবন')। ভূমিকা (১৯৭১। ১৩৭৮ ভাদ্র ২৮), শ্রীমতী উমা সেন-প্রণীত 'প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ' গ্রন্থ। জিজ্ঞাসা, ১৯৭১ নভেম্বর। ১৩৭৮ অগ্রহায়ণ।

৯। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৮১ মার্চ ১১-১২। ১৩৮৭ ফাল্গুন ২৭-২৮।

১০। বাঙালি জাতি ও বাংলার জাতীয় সাহিত্য। সভাপতির অভিভাষণ (১৯৮১ ডিসেম্বর ২৫। ১৩৮৮ পৌষ ৯), নিখিল-ভারত-বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, ৫৪তম অধিবেশন, বর্ধমান। —উদীচী, ১৯৮২ জুলাই। ১৩৮৯ আষাঢ়।

এই গ্রন্থে গ্রহণকালে প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধই অল্পাধিক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হল। 'অনুষঙ্গ' বিভাগের তিনটি প্রসঙ্গ (সুহ্ম ও ব্রহ্ম, বঙ্গ, গৌড়) নূতন লেখা।

রবীন্দ্রসাহিত্যের একনিষ্ঠ গবেষক

শ্রীনেপাল মজুমদার

অনুজপ্রতিমেষু

স্মরণীয়

ছয় কোটি ষাট লক্ষ মানুষের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্যই নাই। কিন্তু বাঙালার ছয় কোটি ষাট লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য হয় না, তাহার কারণ এই যে—বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই।

ইংরাজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্ধিত হইতেছে না। —বঙ্কিমচন্দ্র

পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্‌যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু এডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্ততঃ ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।...দেশের খাল-বিল-নদী-নালায় আজ জল শুকিয়ে এল, তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা। —রবীন্দ্রনাথ

বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়

"বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই।...বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালক বিদ্যালয়ে হয়ে। তার বালকমূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টীকা।"

এই ছিল দেশের শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের শেষ কামনা (১৯৩৬)। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যন্ত সমস্ত বিভাগেই সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব বিষয়েই শিক্ষার একমাত্র বাহন হবে মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা, তাকেই তিনি বলেছেন 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়'। কামনা তিনি করেছেন সমস্ত হৃদয় দিয়েই, কিন্তু মনে মনে জানতেন, 'অদূর ভবিষ্যতে তাঁর একান্ত-আকাঙ্ক্ষিত এই বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁকে বলতে হয়েছে, "বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না।" কারণ অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে আমরা যতদিন বাধ্য থাকব, "ততদিন ইংরেজি ভাষায় পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোড়াই বহন করা অনিবার্য। কেননা, ভালো করে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না।" তবু তিনি বিশ্বাস করতেন, একদিন দেশে তাঁর অভীষ্ট ওই বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবেই। সেই দিনকে ত্বরান্বিত করবার অভিপ্রায়েই তিনি দেশের শিক্ষানায়ক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছেন, শিক্ষাকে মাতৃভাষার বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। তিনি যেসব আবেগভরা আবেদন জানিয়ে গেছেন, নানা উপলক্ষে সেগুলি বিশেষভাবে স্মরণ করবার সময় আজ এসেছে।—

"বাংলা যার ভাষা, সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি···মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালি চিত্তের শুষ্ক নদীর

রিক্তপথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।"

"এই কামনা করি, যখন ধূমমলিন নিশীথপ্রদীপের নির্বাপণের ক্ষণ এল, তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নবসূর্যোদয়ের প্রত্যূষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।"

"অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলা ভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন…পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক, বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্য-সম্পদ্ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।"

পরম দুঃখের বিষয় এই যে, অধীনতার ধূমমলিন নিশীথপ্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যাবার পরেও রবীন্দ্রনাথের এই উৎকণ্ঠিত বেদনাময় আবেদনগুলি আজ পর্যন্তও দেশের শিক্ষানায়কদের কাছে অনবহিতই রয়ে গেল; দেশের শিক্ষাস্রোতকে বাংলা ভাষার খাত দিয়ে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলবার জন্যে কোনো ভগীরথের আবির্ভাব ঘটল না। রবীন্দ্রনাথ জানতেন—বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যার বাহনরূপে স্বীকারের এই যে আদর্শ, তা কেজো লোকদের কাছে গ্রাহ্য হবে না, কবিকল্পনা বলেই উপেক্ষিত হবে। তথাপি তিনি বলেছেন, "তা হোক, আমি বলব, আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে।" আজ চৌত্রিশ বছর হল বিদেশী রাজশাসনের অবসান ঘটেছে, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রেই বিদেশী ভাষাশাসনের অবসান ঘটাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেননা, স্বদেশে স্বভাষাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে তার একান্ত অভাব। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির আয়োজনও দেখা যাচ্ছে না, সর্বত্রই ঊষরতার একাধিপত্য। কিন্তু তা বলে তো নিরস্ত হওয়া চলে না। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথকেও দেশের কাছে বহুবার আবেদন জানাতে হয়েছে শিক্ষাকে মাতৃভাষার স্বাভাবিক আশ্রয়ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। তাঁর অন্যতম শেষ আবেদন এই—

"শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ

কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলাম ; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজিশিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।"
—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর এই বহু-আবৃত্ত আবেদন 'ইংরেজিশিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে' শ্রাব্য বলে গণ্য হয় নি। তাই তাঁর আশাকে ভরসা করে শিক্ষার মূলনীতি সম্পর্কে তাঁরই উক্তির পুনরাবৃত্তি করবার ভার নিতে হল।

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ। অর্থাৎ মাতৃভাষার যোগে যে শিক্ষা, সে শিক্ষাই স্বাভাবিক এবং তাতেই শিক্ষার্থীর মন স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করে। অন্য ভাষার যোগে যে শিক্ষা, তা অস্বাভাবিক এবং তাতে শিক্ষার্থীর মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভের অন্তরায় ঘটে। এই সত্যের প্রমাণ আমাদের দেশে যত পাওয়া যাবে, তেমন বোধ করি কোথাও যাবে না। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যই উদ্ধৃত করি। তিনি বলেছেন—"শিক্ষার সাধনাকে পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন-হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয় বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আন্দাজ করতে পারিনে বলে তুলনা করতে পারিনে।" ইংরেজিশিক্ষার 'মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহর' এবং 'বিদেশী ভাষার চাপে বামন-হওয়া মন'ই আজও দেশের উপরে আধিপত্য করছে। তাই শুধু শিক্ষা কেন, অন্য কোনো ক্ষেত্রেই মোহমুক্ত পূর্ণাবয়ব মনের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটতে পারল না। সুখের বিষয়, দীর্ঘকালীন ইংরেজরাজত্বের মধ্যে অন্ততঃ একটি মন ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রে মোহগ্রস্ত এবং বিদেশী ভাষার চাপে বামন হয়ে থাকার চরম দুর্ভাগ্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে। সে মন রবীন্দ্রনাথের। সুতরাং মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে বাঙালীর মন কি হতে পারত, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কথাই উল্লেখ করা যায়। অতএব তিনি মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং সে শিক্ষার যা ফল হয়েছিল, তার আলোচনার সার্থকতা আছে। সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর বাল্যশিক্ষার কথা সানন্দে ও সগর্বে বিবৃত করে গেছেন।—

"ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত।

খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুই পাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে।… অবশেষে বহু কষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে, তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।”—‘জীবনস্মৃতি’, বাংলাশিক্ষার অবসান।

এই জীবনস্মৃতি গ্রন্থেই (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম ইংরেজিশিক্ষার অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেছেন। তাঁর ইংরেজির গৃহশিক্ষক ছিলেন অঘোরবাবু। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

“বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।… বেশ মনে আছে, ইংরেজি ভাষাটা যে নীরস নহে, আমাদের কাছে তাহাই প্রমাণ করিতে অঘোরবাবু একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার সরসতার উদাহরণ দিবার জন্য, গদ্য কি পদ্য তাহা বলিতে পারি না, খানিকটা ইংরেজি তিনি মুগ্ধভাবে আমাদের কাছে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের কাছে সে ভারি অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল। আমরা এতই হাসিতে লাগিলাম যে, সেদিন তাঁহাকে ভঙ্গ দিতে হইল।…প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনো মতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্‌স্ কোর্স অব রীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল।…বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না।…প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের দেউড়িতেই থাকে-থাকে সার-বাঁধা সিলেবল্‌-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাক্সেন্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙিন উঁচাইয়া শিশুপাল-বধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণদুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না।”—‘জীবনস্মৃতি’, নানা বিদ্যার আয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ইস্কুলেও কিছুকাল পড়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় কিছুতেই তাঁর মন বসেনি। ফলে 'ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল-মাস্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক'। তবু যে তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি, তাঁর মনোবিকাশের অন্তরায় ঘটেনি, তাঁর কারণ বালকবয়সে তিনি দীর্ঘকাল মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন; বিদেশী ভাষার চাপে তাঁর মন বামন হয়ে যায়নি। পরভাষার কঠিন বেষ্টনীর বাইরে মাতৃভাষার মুক্ত হাওয়ায় শিক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ দিলে বাঙালির মনের কতখানি বিকাশ ঘটতে পারে, তার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল রবীন্দ্রনাথ। তাই একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সারাজীবন মাতৃভাষাকে সর্বস্তরের শিক্ষার বাহন করবার ব্যর্থ আবেদন জানিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের জীবনে বাংলা শিক্ষার প্রভাব কতখানি, সে বিষয়ে তাঁর উক্তিই স্মরণীয়।—

"বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে-শিক্ষার আলোচনা বারবার দেশের সামনে এনেছি, তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনও যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভর্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে প্রসারিত,··· তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই-সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চপদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ ছাত্রবৃত্তির পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সদ্‌গতি ছিল নর্মাল স্কুল নামধারী মাথা-হেঁট-করা বিদ্যালয়ে।···আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি বিভাগে আমাকে ভরতি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত-বিজ্ঞান। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজিবর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।··· এর ফলে শিশুকালেই বাংলাভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক্, শিশু মনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয়নি।··· ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভরতি হয়েছিলুম।··· নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি, মাতৃভাষায় রচনার

অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।··· ইস্কুল-পালানে অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে পথে সংগ্রহ করেছি, সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলা ভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।··· আমার ইংরেজি শিক্ষায় সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি-জানা ভদ্রসমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে।··· তার কারণ শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে-খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর যাদুমন্ত্র দিয়েছেন।"—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

রবীন্দ্রনাথের নিজ শিক্ষা-অভিজ্ঞতার কথা একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্‌ধৃত করা গেল। কেননা, এই অভিজ্ঞতার মধ্যে যে শিক্ষণীয়তা আছে, সে কথা আজ আমাদের শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয় ও অনুসরণীয়।

যা হোক, রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্বন্ধে যে আদর্শের কথা বার-বার দেশের কাছে উপস্থাপিত করেছেন, এবার তাই একটু সংহত আকারে গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করব। তৎপূর্বে বলা প্রয়োজন যে, বাংলাসাহিত্যের নবযুগের যিনি প্রবর্তক সেই পাশ্চাত্যবিদ্যাভিমানী মধুসূদনও শেষ বয়সে বুঝতে পেরেছিলেন, শিক্ষায় মাতৃভাষাকে যথাযোগ্য স্থান না দেবার কুফল কতখানি। নিজের অল্পবয়সের শিক্ষায় মাতৃভাষাচর্চার অভাবের জন্য তাঁকে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছিল—

There is nothing like cultivating and enriching our mother tongue··· Our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it. Such of us, as owing to *early defective education* know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong.—বঙ্গলিপি গ্রন্থকারের।

শতাধিক বৎসর পূর্বে উচ্চারিত মধুসূদনের এই শেষ উক্তিটি আজও আমাদের বহু শিক্ষাভিমানী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে সমভাবেই প্রযোজ্য, আজও তাঁদের ইংরেজিশিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে এই উক্তিটি অশ্রাব্য বলেই গণ্য হবে। মধুসূদন তথা বঙ্কিমচন্দ্রকেও ঠেকেই শিখতে হয়েছিল যে, মাতৃভাষাই ভাবগ্রহণ

(অর্থাৎ শিক্ষা) এবং ভাবপ্রকাশের (অর্থাৎ সৃষ্টির) মুখ্যতম উপায়। তাঁদের এই ঠেকে-শেখার কথাও রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে তুলে ধরতে ভোলেন নি।—

“বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোশ-পরা অভিনয় দেখেছি, তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজিবিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাৎলাতে চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।”—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ঠেকে-শেখার বিড়ম্বনা তাঁদের আমলেই চুকিয়ে দিয়ে আমাদের পক্ষে কি দেখে-শেখার সময় এখনও এল না? মধুসূদন আক্ষেপ করে গেছেন নিজের ‘defective education’-এর জন্য, আর রবীন্দ্রনাথ আনন্দবোধ করে গেছেন নিজের সার্থক শিক্ষার জন্য। একজন তাঁর ব্যর্থতা এবং আর একজন তাঁর সার্থকতার দ্বারা আমাদের একই বিষয় উপলব্ধির নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেটি এই যে, মাতৃভাষাকে সর্বতোভাবেই শিক্ষার উপায় এবং আধার বলে স্বীকার করতে হবে।

২

১৮৮৩ সালে, কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠারও পূর্বে, যখন দেশে সবেমাত্র জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন যে, জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য প্রস্তুত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—

“বিদ্যাশিক্ষার প্রচার···যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় নিদেন গুটিকতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজি শিখিলে কিংবা ইংরাজিতে বক্তৃতা করিলে এইটি হয় না। ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলাসাহিত্য উন্নতিলাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা

কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।" —ভারতী, ১২৯০ কার্তিক, পৃ ২১৩

বাংলাভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার এবং বাংলা-সাহিত্যের যোগে সেই শিক্ষাকে দেশের সর্বত্র বিস্তার, এই ছিল শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সংকল্প ও সাধনা। ইংরেজি ভাষার যোগে যে নববিদ্যা দেশে প্রবেশ করেছে, তাকে মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করে 'বঙ্গসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ' ছিল তাঁর আর-এক লক্ষ্য। মনন-সাহিত্যের অভাবে এবং কাব্য নাটক ও উপন্যাস প্রভৃতি রস-সাহিত্যের অতিচর্চার প্রভাবে বাঙালির মন দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়েছে, তিনি বার-বার এ দুঃখ করে গেছেন। বাংলা-সাহিত্য তথা বাঙালিমনের একাঙ্গীনতা তাঁকে কতখানি পীড়া দিত, তার প্রমাণ রয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বত্র। বাংলাসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও সে সাহিত্যের যোগে দেশের সর্বস্তরে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার বিকিরণ, এই লক্ষ্যের দিকেই তিনি জীবনব্যাপী সাধনাকে পরিচালিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই আদর্শের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখতে পাই ১৮৮৩ সালেই যখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। এর দশ বছর পরে তিনি এই আদর্শের কথাই আরও বিশদভাবে এবং আরও জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেন তিনটি প্রবন্ধে। তিনটিই প্রকাশিত হয় সাধনা পত্রিকায়, 'শিক্ষার হেরফের' (১২৯৯ পৌষ) ও 'প্রসঙ্গকথা' (১২৯৯ চৈত্র এবং ১৩০০ আষাঢ়) নামে। প্রথম প্রবন্ধটিতে (১৮৯২) তিনি বলেন—"বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই।" কেননা, আমাদের শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হল ইংরেজি, এই বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করতে করতেই আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হয়ে যায়; যখন ওই বিদেশী ভাষা আয়ত্তে আসে, তখন আর যথার্থ শিক্ষালাভের সময় থাকে না। ফলে আমাদের ভাষা ভাব ও আচরণের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সমন্বয় থাকে না। আমাদের শিক্ষা ও জীবনযাপন পদ্ধতি পরস্পরকে খণ্ডন ও বিদ্রূপ করতে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন—

"শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।"—সাধনা, ১২৯৮ পৌষ, পৃ ১০৭

শিক্ষাকে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ভিত্তির উপরে স্থাপন করার কথা অপর দুটি প্রবন্ধে আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'শিক্ষার হেরফের'

প্রবন্ধ পড়ে তৎকালীন তিনজন মনস্বী রবীন্দ্রনাথের অভিমত সমর্থন করে তাঁকে তিনখানি পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ পত্র তিনখানি আংশিকভাবে উদ্ধৃত করে পরবর্তী প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশদতর আলোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন,—"প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বাণীও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সম্ভ্রান্ত' ব্যক্তিদের ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে শ্রাব্য বলে গণ্য হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য (১৮৯০-৯২) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, উক্ত প্রবন্ধের "প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সভ্য বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই।"—*Calcutta University Minutes for 1891-92, pp. 56-58.*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শুধু যে বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিরাশ করেছিলেন তা নয়, আনন্দমোহন বসুকেও হতাশ করেছিলেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ পড়ে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখন—

"আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত। .. বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা এবং নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্তন করিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পাবলিক ওপিনিয়ান অনেকটা পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি, কিন্তু যে পর্যন্ত এই পরিবর্তন সাধিত না হয়, কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি।"

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইংরেজি ভাষার প্রখ্যাত বাগ্মী আনন্দমোহনেরও শিক্ষারম্ভ হয়েছিল বঙ্গবিদ্যালয়ে। সেখানে শুধু বাংলাভাষায় শিক্ষালাভ করে ও কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বৃত্তিও পেয়েছিলেন। তাঁর ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয় তার পরে।

উল্লিখিত তিনখানি পত্র উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শিক্ষার কেল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন (১৮৯৩)।—

"স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, একথা কে না বোঝে?...দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই, একথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

"রাজা কত আসিতেছে, কত যাইতেছে; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল, আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে—কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে; যাহা কিছু বাংলায় থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায়, তবে পরশ্ব ওই বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্বুদের মতো প্রতীয়মান হইবে। ভালরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলাকে বুদ্বুদ্ বলিয়া বোঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোকপ্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্প স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোনো মূল নাই।"—সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র, পৃঃ ৪৪৩-৪৪।

অতঃপর ওই প্রবন্ধেই তিনি শিক্ষার ব্যবহারিক দিক্ নিয়েও সংক্ষেপে নিজের মত ব্যক্ত করেন।

"বাল্যকাল হইতেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক, কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিকরূপে অতি অল্পে অল্পে; তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষাশিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়।...শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় পাইতাম তবে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা যে কত সহজসাধ্য হইত, তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি এখানকার অপেক্ষা গভীরতর এবং ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা এখনকার অপেক্ষা অনায়াসে দুরূহতর করা যাইতে পারিত।"

"শিখিবার প্রণালীটি যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পরিপক্ক হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক পীড়ন, কঠিন চেষ্টা ও শরীরমনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কত অল্প সময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা

গ্রহণ করা যায়, তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।"—সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র, পৃঃ ৪৫২-৫৩

এই শেষ অনুচ্ছেদের কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতাজাত এবং উক্ত দৃষ্টান্ত তিনি নিজে। নিজের এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তিনি স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন তিন মাস পরে রচিত অপর একটি প্রবন্ধে।—

"মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কি নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা আজিও ভুলি নাই। কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ওই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই। অতি বাল্যকালেই ইংরেজির সহিত মিশাইয়া বাংলা তাহাদের তেমন সুচারুরূপে অভ্যস্ত হয় না এবং…ইংরেজিতেও শিশুবোধ্য বহি পড়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য, অতএব দায়ে পড়িয়া আমাদের ছেলেদের পড়াশুনা কেবলমাত্র কঠিন শুষ্ক অত্যাবশ্যক পাঠ্যপুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।" —সাধনা, ১৩০০ আষাঢ়, পৃ ১৯৬-৯৭

নিজের এই অভিজ্ঞতার কথা, অর্থাৎ বিদেশী ভাষার পীড়নহীন শুধু বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভের কথা এবং মাতৃভাষাকে সুচারুরূপে আয়ত্ত করার ফলে তাঁর বাল্যকালে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি খাদ্যাভাবে অপুষ্ট ও অপরিণত না থাকার কথা, পরবর্তী কালে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে (১৯১২) এবং 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে (১৯৩৭) আরও বিশদভাবেই বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। যা হোক, 'সাধনা' পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধে তিনি শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান ও ইংরেজি-প্রাধান্যের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়িত্বের সম্বন্ধে যা বলেন, তাও এ স্থলে উদ্ধৃতিযোগ্য।—

"কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির

জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেই জন্য পালি ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।…আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে মূল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।"—সাধনা, ১৩০০ আষাঢ়, পৃ ১৯৭

৩

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যর্থতার কারণ তার শিক্ষার অবলম্বন বিদেশী ইংরেজি ভাষা, মাতৃভাষার ধ্রুব আশ্রয়ভূমির উপরে তার প্রতিষ্ঠা হয়নি। এস্থলে বলা প্রয়োজন যে—ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষা, যাকে বলা হয় "ইংরেজি শিক্ষা," সে শিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্রও বিরুদ্ধতা ছিল না। বরং সেই ইংরেজি শিক্ষাকে দেশের অন্তরে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতেই তিনি আগ্রহী ছিলেন। "ইংরেজি শিক্ষার সুফলের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই যাহাতে সেই শিক্ষা মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়া গভীর ও স্থায়ীরূপে দেশের অন্তরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে", সে ইচ্ছা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন—"ইংরেজি শিক্ষা বাংলা ভাষার মধ্যে যে পরিমাণে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে সেই পরিমাণেই তাহার ফলবান্ হইবার সম্ভাবনা।" বস্তুতঃ ইংরেজি শিক্ষাকে মাতৃভাষার যোগে দেশের সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত করে দেওয়াই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। মাতৃভাষাই হচ্ছে জাতির রক্তস্রোত; শিক্ষাকে সেই স্রোতধারার সঙ্গে মিশ্রিত হবার অবকাশ না দিয়ে যদি ইংরেজি ভাষার কঠিন আবরণের মধ্যেই বন্ধ করে রাখা যায়, তবে সে শিক্ষায় জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, বঙ্কিমচন্দ্র-গুরুদাস-আনন্দমোহন-প্রমুখ আরও অনেকেই এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুতঃ ইংরেজি ভাষার দুর্ভেদ্য অন্তরায় আমাদের শিক্ষাকে কতখানি ব্যর্থ করে দেয়, তা উপলব্ধি না করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন, তেমনি কঠোরতা আর কখনও কারও ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। তাঁর মতে, উক্ত কর্তৃপক্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা 'অসংখ্য বালক-বলিদান-রূপ মহাপুণ্যে'র অধিকারী; বলা বাহুল্য, এই মহাপুণ্যকর্মের যূপকাষ্ঠ হচ্ছে ইংরেজী ভাষা।

এই সময়ে শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে দেশে যে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়, তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল 'সাধনা' পত্রিকা; রবীন্দ্ররচিত প্রবন্ধগুলির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া এসময়ে লাহোর শিক্ষাপ্রণালী (১৮৯০ / ১২৯৭ সাল)

এবং 'ইংরাজি বনাম বাংলা' (১৮৯০ / ১২৯৯ চৈত্র) নামে দুটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'শিক্ষাপ্রণালী' প্রবন্ধে সুবিখ্যাত ইংরেজি-সাহিত্য-রসিক লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করেন, আজও তার উপযোগিতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার স্থান সম্পর্কে তিনি বলেন—

"ভাষা শিক্ষা দিতে হইলে ভাষাটা ভাষাস্বরূপে শিক্ষা দেওয়াই ভাল। ভাষা শিক্ষা হইবার অগ্রে সেই ভাষার অন্য কঠিন বিষয় শিক্ষা দিলে, না হয় ভাষাশিক্ষা, না হয় বিষয়শিক্ষা। তা ছাড়া, প্রথমে কতকটা মানসিক অনুশীলন হইলে ভাষা শিক্ষা করাটাও সহজ হইয়া আসে। থার্ড ক্লাস পর্যন্ত সমস্ত বিষয় বাংলায় শিক্ষা দিয়া তৎপরে যদি দুই বৎসর ইংরাজিটা খালি ভাষাস্বরূপে শিখান হয়, তা হলে আমার বিশ্বাস যে, এখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে যতটা ইংরাজি শিক্ষা হয় তদপেক্ষা বেশি হইবারই সম্ভাবনা। যদি নিতান্ত মনে হয় যে, দুই বৎসরে অতটা ইংরাজি শিখান দুষ্কর, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণী হইতেই ইংরাজিটা খালি ভাষাস্বরূপে পড়ান যাইতে পারে। ইংরাজি ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দিবার কিম্বা পরীক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"—সাধনা, ১২৯৯ মাঘ, পৃ ১৯৬

লোকেন্দ্রনাথের এই অভিমত সম্পূর্ণ সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ সাধনাতেই (১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৪৫২-৫৩) লিখলেন—

"শিখিবার প্রণালীটি যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পরিপক্ক হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক পীড়ন, কঠিন চেষ্টা ও শরীরমনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কত অল্প সময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।"

অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল যে তিনি নিজেই সে কথা রবীন্দ্রনাথ পরে সাধনা পত্রিকাতেই (১৩০০ আষাঢ়) খুলে বলেছেন। তাঁর সে উক্তি পূর্বেই উদ্‌ধৃত হয়েছে। যা হোক, লোকেন্দ্রনাথের মন্তব্যের অনুমোদন করে তিনি যা বলেন (সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৪৫২-৫৩) তাও যথাস্থানে উদ্‌ধৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন্দ্রনাথের অনুমোদিত এই শিক্ষাপ্রণালী প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের ইস্কুলগুলিতে প্রবর্তিত হয়েছে। পরে দেখব রবীন্দ্রনাথ এই প্রণালীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তরেও প্রবর্তন করবার জন্যে বারবার ব্যাকুল আবেদন জানিয়ে গেছেন। কিন্তু ইস্কুলশিক্ষার স্তরেও এই দুইজন এমন আরও দু-একটি প্রণালীর কথা বলেছেন যার সত্যতা অস্বীকার করবার উপায় নেই অথচ

যা আজও আমাদের বিদ্যালয়ে প্রবর্তনযোগ্য বলে স্বীকৃত হল না। ইংরেজি শিক্ষায় কৃতবিদ্য লোকেন্দ্রনাথ লিখলেন—

"ভাষা শিখাইবার জন্য টেক্সট্‌বুক কেন? আর শিখাইবার জন্য হইলেও পরীক্ষার জন্য কেন? টেক্সট্‌বুকের পরীক্ষা করিলে ভাষাশিক্ষার দিকে মনোযোগ না হইয়া সেই টেক্সট্‌বুকখানি মুখস্থ করিবার দিকে মনোযোগ হয়। ভাষাশিক্ষা না হইয়া খালি প্রতিশব্দ ও "নোট" মুখস্থ হয়। ভাষা-জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইলে দেখা উচিত, ছাত্র সে ভাষায় কেমন লিখিতে পারে, বলিতে পারে ও বুঝিতে পারে। টেক্সট্‌বুক পরীক্ষায় ইহার কিছুই হয় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যদি বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী প্রচলিত করেন, আর সেই সঙ্গে যদি টেক্সট্‌বুক পরীক্ষা করিবার প্রণালী উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর দুইটি প্রধান দোষ দূর করা হয়।"—সাধনা, ১২৯৯ মাঘ, পৃ ১৯৭

এই দুইটি প্রধান দোষের একটি দীর্ঘকাল পরে আমাদের ইস্কুল থেকে দূর হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি দূর হওয়া দূরে থাকুক, প্রথম দোষটি অপসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি টেক্সট্‌বুকের প্রতাপ বহুল পরিমাণে বেড়ে গিয়ে প্রথম দোষ নিরসনের উপকারটুকুকেও অনেকাংশে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতীমাত্রই এ কথার সত্যতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করবেন।

আমাদের ইংরেজিশিক্ষার আর-এক প্রধান অন্তরায় এই যে, সে ভাষার ব্যাকরণটাও শিখতে হয় ইংরেজি ভাষাতেই। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।—

"ব্যাকরণশিক্ষা ভাষাশিক্ষার একটি প্রণালী। কিন্তু যে ভাষার কিছুই জানি না সেই ভাষার ব্যাকরণ হইতেই যদি প্রথম ব্যাকরণশিক্ষা হয়, তবে শিশুদের মস্তিষ্কের প্রতি কি অন্যায় উৎপীড়ন করা হয়।…ভাষা এবং ব্যাকরণ দুই যখন বিদেশী তখন কাহার সাহায্যে কাহাকে বুঝিবে? তখন সূত্রও অপরিচিত, উদাহরণও অপরিচিত। যে ভাষা সর্বাপেক্ষা পরিচিত সেই ভাষার সাহায্যে ব্যাকরণজ্ঞান লাভ করাই প্রশস্ত নিয়ম, অবশেষে একবার ব্যাকরণজ্ঞান জন্মিলে সেই ব্যাকরণের সাহায্যে অপরিচিত ভাষা শিক্ষা সহজ হইয়া আসে।"—সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৪৫২

এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বিদেশী ভাষাকে ছাত্রগণের কাছে

সুগম করবার উপায় হচ্ছে দুটি। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞানকে মাতৃভাষার ব্যাকরণের উপরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা, দ্বিতীয়তঃ বিদেশী ভাষার ব্যাকরণও শিখতে দেওয়া মাতৃভাষারই সাহায্যে। যার বাংলা ভাষার ব্যাকরণই ভালো করে আয়ত্ত হয়নি তাকে যদি ইংরেজি ব্যাকরণ ইংরেজিতেই শেখাবার চেষ্টা করা যায়, তা হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। একবার যদি একটি দীপ জ্বালানো যায়, তবে তারই শিখাস্পর্শে আরও বহু দীপ জ্বালানো সহজ হয়; প্রত্যেকটি দীপ জ্বালাতেই যদি চকমকি ঠুকতে হয় তা হলে যে অকারণে সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে, একথা বুঝতে কে না পারে? সব ভাষারই মূলভিত্তি এক। বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া লিঙ্গ বচন কর্তা কর্ম ইত্যাদি সব ভাষাতেই আছে। ভাষাজ্ঞানের এই মূলকথাগুলির সঙ্গে যদি মাতৃভাষার সাহায্যে অল্প বয়সেই ছাত্রদের ভালো করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে ইংরেজি ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলি শেখাতে আর কত সময় লাগে, বিশেষতঃ সেই ইংরেজি ব্যাকরণও যদি বাংলাতেই লিখিত হয়?

এক সময়ে আমাদের দেশে সংস্কৃতভাষাও সংস্কৃতে লিখিত ব্যাকরণের সাহায্যেই শেখানো হত। তাতে প্রথমশিক্ষার্থীর উপরে যে কঠিন পীড়ন হত তা উপলব্ধি করতে পেরেই 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখলেন উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। আজ শতাধিক বৎসর যাবৎ সেই উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদীই আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদের প্রধান অবলম্বন। তাতে যে আমাদের জাতীয় শক্তির কতখানি অপচয় নিবারিত হয়েছে, তা কি আমরা একবারও ভেবে দেখি? যদি বাংলা ভাষার যোগে সংস্কৃত শেখাবার ব্যবস্থা না হত, তা হলে আজ হয় ইস্কুল-কলেজে থেকে সংস্কৃত শেখা প্রায় উঠে যেত, না-হয় এক সংস্কৃত শিখতেই আমাদের অধিকাংশ সময় কেটে যেত। এই দ্বিতীয় কথাটি যে কত সত্য, তা আমাদের ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এক ইংরেজি শিখতেই ছাত্রদের এত সময় ও শক্তি ব্যয় হয় যে, বাকি বিষয়গুলির জন্য খুব কমই অবশিষ্ট থাকে। যদি ছাত্রজীবনের প্রথম কয়েক বৎসরেই মাতৃভাষার ব্যাকরণজ্ঞানকে পাকা করে নিয়ে তার পরে ইংরেজি ভাষা শেখানো আরম্ভ করা যায়, তাও উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদীর মতো বাংলায় লিখিত ইংরেজি ব্যাকরণের সাহায্যে, তা হলে আমাদের বর্তমান শিক্ষানায়কগণ সমগ্র জাতির আশীর্বাদভাজন ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী

রচনার পর একশো বছর অতীত হয়ে গেল, এখনও কি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করবার জন্য ও-রকম দুখানি ব্যাকরণ লেখার সময় এল না? আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষার্থীরা দীর্ঘকাল ধরে আর একজন 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা করে আছে। আমাদের শিক্ষাপরিষদগুলি যদি করুণাপরবশ হয়ে ব্যবস্থা দেন যে, ইংরেজি ব্যাকরণের শিক্ষা ও পরীক্ষা বাংলাতেই হবে, তা হলে অসংখ্য ছাত্র অনেক অল্প সময়েই এবং সুষ্ঠুতর রূপেই ইংরেজি শিখবে এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য অনেক বেশি অবসর পাবে। বস্তুতঃ অন্য সব দেশেই বিদেশী ভাষা শেখার এই ব্যবস্থা। কেবল আমাদের দেশই তার ব্যতিক্রম।

সংস্কৃত হোক, ইংরেজি হোক, অন্য ভাষা শেখার সোপান যে মাতৃভাষা, একথা আমাদের দেশের মনীষীরাও স্বীকার করেন এবং পথ দেখিয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগরের কথা তো এইমাত্র বলা হল। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ইংরাজিসোপান' 'ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা', 'সংস্কৃত-শিক্ষা' প্রভৃতি পুস্তক থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজি, বা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় মাতৃভাষাকে উপায়রূপে গ্রহণ করাই ছিল তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, ইস্কুলশিক্ষার স্তরে সংস্কৃতকেও সাহিত্যরূপে না শিখিয়ে (অর্থাৎ টেক্সট্‌বুকের উপর গুরুত্ব না দিয়ে) শুধু ভাষারূপে শেখালে অনেক সময়ও বাঁচে এবং ভাষাটাকেও অধিকতর ভালো করে শেখানো যায়। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হয়। কোনো সংস্কৃত পাঠ্যবই থাকবে না, তা নয়। তবে সে বইএর বিষয়বস্তুর উপরে গুরুত্ব না দিয়ে যদি তার ভাষাটার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিক্ষা দেওয়া ও পরীক্ষা নেওয়া হয়, তবেই সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে অপেক্ষাকৃত সহজে।

৪

এই তো গেল ইস্কুলশিক্ষার স্তরের কথা। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান কি হওয়া উচিত? শিক্ষার উচ্চসৌধকেও কি মাতৃভাষার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব? ১৯১৫ সালে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গেই এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, পশ্চিমের শিক্ষাটা

আমাদের পক্ষে কেবল ইস্কুলের জিনিস হয়েই আছে, জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারেনি ; সে শিক্ষায় অনেক ভালো জিনিস আছে, কিন্তু তা আমাদের চিন্তায় বা কাজে ফলে উঠতে পারছে না। তার কারণ 'আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই।' তিনি বললেন, শিক্ষার বিষয়কে আমরা অবশ্যই অন্য জায়গা থেকে নিতে পারি, কিন্তু তার ভাষা সুদ্ধ নিতে হলে সে হবে বিষম জুলুম। আমাদের দেশে তাই হয়েছে। তারই ফলে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আমাদের মধ্যে ব্যাপকও হতে পারল না, সফল হয়েও উঠতে পারল না। অতঃপর তাঁরই উক্তি উদ্‌ধৃতি করি।—

"বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি, তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি।··· দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয়, তখন এই পর্যন্ত বলি : আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলাভাষায় দেওয়া চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায়, তবে 'গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্'।

"আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে ? ভরসা করিয়া এটুকু কোনো দিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে ?··· আমরা ভরসা করিয়া এপর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"—শিক্ষার বাহন (১৯১৫)

বিদ্যাকে মাতৃভাষার ভিত্তির উপরে স্থাপন করলে সে বিদ্যা কত সহজে সার্থক ও সফল হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জাপানের কথা উল্লেখ করলেন।—

"পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে, জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে। অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকারপ্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ।"

জাপানি ভাষায় যা সম্ভব হয়েছে, বাংলা ভাষায় তা নিশ্চয়ই সম্ভব। কারণ বাংলা ভাষার শক্তি জাপানির চেয়ে বেশি। জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণের উৎসাহ

দিয়েই তিনি নিরস্ত হননি। উচ্চশিক্ষাকে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি আছে, তাও খণ্ডন করতে প্রয়াসী হলেন।—

"ওজর এই যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বই-কি। সেইজন্যই কঠোর সংকল্প চাই।"

জাপানি ভাষায় যদি উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, তবে বাংলাতেই হবে না কেন? আর-এক বিরুদ্ধ যুক্তি উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক তথা পরিভাষার অভাব। এই আপত্তির উত্তর বস্তুতঃ ১৮৯৩ সাল থেকেই দেওয়া হচ্ছে। তখনই এসম্বন্ধে লোকেন্দ্রনাথ পালিত লেখেন—

"যদি বাংলায় শিক্ষা দেওয়াই স্থির হয়, তবে অতি শীঘ্রই সকল বিষয়েই বাংলায় শিক্ষাপুস্তক বাহির হইবে। লিখিবার লোক যে নাই তা নয়। বরং এক আশ্চর্য দেখা যায় যে, বাঙালিতে বাঙালি ছেলেদের জন্য বাংলার ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু ইংরাজি ভাষায়। যদি বাংলা ভাষায় ইতিহাস পড়াইবার প্রণালী প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলা ভাষায় লিখিতেন না?"—সাধনা, ১২৯৯ মাঘ, পৃ ১৯৭

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে, সেকালে ইংরেজি ইস্কুলে নীচের ক্লাসে বাংলার ইতিহাস ও উপরের ক্লাসে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ানো হত—ইংরেজিতে। অনুরূপভাবে বঙ্গবিদ্যালয়গুলিতে এই দুই ইতিহাসই পড়ানো হত—বাংলায়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪ ডিসেম্বর) এবং বঙ্গবিদ্যালয়ের জন্যই রচিত হয়েছিল। এই বই সুদীর্ঘকাল বঙ্গবিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুস্তক রূপে স্বীকৃত ছিল।

যা হোক, লোকেন্দ্রনাথের বক্তব্যের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথও এসময়ে লিখলেন—

"সিণ্ডিকেট সভা যদি প্রসন্ন হন, যদি অনুমতি করেন, তবে দরিদ্র বাঙালি একাজে এখনি নিযুক্ত হয়। ম্যাকমিলন সাহেবকে অনেক কাল অন্ন যোগাইয়াছি, এখন ঘরের অন্ন ঘরের উপবাসী ছেলেদের মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উঠিলে দেখিয়াও চক্ষু সার্থক হইবে। ওরিজিন্যাল কেতাব না পাওয়া যায় ত তর্জমা করিতে দোষ নাই। জ্ঞানবিজ্ঞান যেখানকারই হউক, ভাষা মাতার হওয়া চাই।··· যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মত সহজে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, কেবল সংকীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অস্বাস্থ্য রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।"—সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৪৫১

অতঃপর ১৯১৫ সালে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে তাঁকে আবার এই আপত্তি খণ্ডন করতে হয়—

"আমি জানি, তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও, কিন্তু বাংলা ভাষায় উঁচু দরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?' নাই, সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে?···বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।··· দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?"

উচ্চশিক্ষাকেও মাতৃভাষার যোগেই বিতরণ করবার অত্যাবশ্যকতা কি, এ প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্টভাবেই লিখলেন—

"দেশের মনকে মানুষ করা কোনো মতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে। তার ফল হইয়াছে, উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা।·· আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি, তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না।"
—শিক্ষার বাহন (১৯১৫)

আমাদের উচ্চশিক্ষার বাহন বিদেশী ভাষা, কিন্তু আমাদের চিন্তার স্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা। শিক্ষার সঙ্গে মাতৃভাষার এই বিচ্ছেদের ফলে আমরা উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা করবার অবলম্বন থেকেই বঞ্চিত হয়েছি। ফলে উচ্চশিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনের পরিপোষণ হচ্ছে না। আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদের ভাষা ও আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছে না। ফলে আমাদের জাতীয় মন ও জাতীয় জীবন আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারছে না, আধুনিক শিক্ষার সমস্ত সুফল থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। এক কথায় আমাদের পরভাষাবাহিত উচ্চশিক্ষা দেশের অর্থ ও সামর্থ্যের অপচয়ের হেতুমাত্রই হয়ে রয়েছে, উচ্চশিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য তার দ্বারা সিদ্ধ হচ্ছে না। এই হচ্ছে সংক্ষেপে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধের মর্মকথা।

কিন্তু ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে, বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার একমাত্র বাহনরূপে স্বীকার করবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কেননা তখন পর্যন্ত ইস্কুলশিক্ষার বাহনরূপেও ইংরেজিরই একাধিপত্য। তথাপি তিনি যে বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে স্বীকারের প্রস্তাব করলেন, তাতে কম সাহসের প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু একান্ত ব্যর্থতার স্থলে আংশিক সার্থকতার আশায় তাঁকেও একটি রফানিষ্পত্তির প্রস্তাব করতে হল। এই রফার কথা পরে বলছি। তার আগে দেখা যাক তিনি এই রফার কথা বললেন কাদের হিতার্থে। বলা বাহুল্য, উচ্চশিক্ষাকে মাতৃভাষার সচল ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দিলে সে শিক্ষা সমস্ত দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চারিত হয়ে সমগ্র দেশেরই কল্যাণের হেতু হবে। তা ছাড়া এক শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিশেষভাবে উপকৃত হবে, তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি ওই প্রস্তাব করলেন। যেসব ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আগ্রহী অথচ ইংরেজী ভাষার দুরূহতা অতিক্রম করতে অসমর্থ, তারাই বিশেষভাবে তাঁর লক্ষ্যস্থল। তাই আশু মুখুজ্জে মশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাংলা শিক্ষার প্রবর্তন করেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সে প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেন তা এই—

"তিনি (আশু মুখুজ্জে মশায়) যেটুকু করিয়াছেন, তাহার ভিতরকার কথা এই—বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক, বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকস করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?…

ভালো মতো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?… মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে?"—শিক্ষার বাহন

পূর্বে যে রফানিষ্পত্তির কথা বলেছি, তা এই ইংরেজি ভাষায় অপটু। ভালো ছাত্রদের দিকে তাকিয়েই করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রফানিষ্পত্তির প্রস্তাবটি এই—

"প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত এক রকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায়, তা হইলে কি

নানা প্রকারে সুবিধা হয় না? একে তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।...

"ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি। সুতরাং আদরও বেশি।... তাই হোক বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন।"

বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ইংরেজির পাশে একটি বাংলা পথ খুলে দেওয়া হয়, তাহলে তার ফলাফল কি হতে পারে, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না। তিনি স্পষ্ট করেই বললেন—

"বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায়, তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।...

"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে, এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

"সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজারদরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রি লইতেই হয়, কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে, তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয়, যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রি লইতেছে, তারাও অবকাশমতো বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে, এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন, তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

"এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে···এবং কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্‌গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয় দান করিবে।"

এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ইংরেজি ও বাংলা দুই ধারা প্রবর্তিত হয়, তবে প্রথম ধারা থেকে যারা বেরিয়ে আসবে, তারা হবে সরকারী ডিগ্রিধারী, ব্যবসা ও চাকরির যোগ্য; যথার্থ শিক্ষার বিকাশ এধারায় হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় ধারা থেকে যেসব ছাত্র উত্তীর্ণ হবে, তারা সরকারী বা বেসরকারী চাকরির যোগ্য বলে গণ্য না হতে পারে, কিন্তু তারাই হবে যথার্থ শিক্ষার অধিকারী এবং এই ধারাতেই ঘটবে বাঙালির প্রতিভার বিকাশ। এভাবে দেশে শিক্ষা সার্থক ও সফল হয়ে উঠবে। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও অন্তরের কামনা। কিন্তু বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এই কামনাকে সার্থক করে তোলবার কোনো প্রয়াসই করেনি, তাঁর জীবিতকালে। আজ তাঁর তিরোধানের পরে এই স্বাধীন দেশেও কি বাঙালির শিক্ষাকে সার্থক করে তোলবার দিকে কোনো প্রয়াস দেখা দিয়েছে?

৫

রবীন্দ্রনাথ জানতেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়রূপ কলটাতে তাঁর এই আধাআধি রফার প্রস্তাবটাও গৃহীত হবার সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি তখনই (১৯১৫) সাহস করে সরকারি অর্ধাঙ্গ বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই উত্থাপন করলেন। বললেন—

"ওই কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আপিস আদালত··· প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া থাক্‌ না।··· গুরুর চারি দিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিক কালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দাতক্ষশিলা, ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল-চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই বিশ্ব-বিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোক সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক-না কেন?"

এই যে সাহস করে স্বভাবের নিয়মে ও ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুবর্তন করে জীবনের দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করে তোলবার কথা বলা হল, এইখানেই রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে 'বিশ্বভারতী' সৃষ্টির প্রথম বীজ উপ্ত হল। ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টি। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে স্বাধীন পূর্ণাঙ্গ বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সে আকাঙ্ক্ষাই কয়েক বছরের মধ্যে 'বিশ্বভারতী' রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে (১৯১৮)।

কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষাই যে সৃষ্টির মূলে, সে কথা উক্ত প্রবন্ধে এবং স্বাধীন বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। ওই উক্তির মধ্যে যে ভাবী সৃষ্টির পূর্বাভাস নিহিত ছিল, তখন তা কেউ ধরতে পারেন নি। আজ তা আমাদের কাছে অতি স্পষ্টভাবেই নিজের অর্থ প্রকাশ করছে। তাঁর সেই সৃষ্টিগত কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার কথা এখানে উদ্‌ধৃত করি।—

"সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—'আমরা চাই'। এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশে যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্রে মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

"আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।"—শিক্ষার বাহন, সবুজপত্র ১৩২২

মাতৃভাষার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ বাংলা-বিশ্ব-বিদ্যালয় চাই,—এই কল্পনার মন্ত্র আচার্য রবীন্দ্রনাথ, ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ, সাধক রবীন্দ্রনাথের চিত্তকুহর থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল ১৯১৫ সালেই। তার তিন বছর পরেই এই কল্পনা ও ইচ্ছা বিশ্বভারতীর মধ্যে মূর্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের মনে দেখা দেয় আরও কয়েক বছর আগেই। 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধেও (১৯১১) এই আকাঙ্ক্ষার আভাস পাই।—

"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিদ্যার উপযুক্ত স্থান নাই।...

এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভ আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনকারই কালের ধর্মবশত।···আমরা নিজের বাণীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে।

"সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি, তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্‌যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।

"অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে, সেই চেষ্টার মূলে এই আকাঙ্ক্ষা।···

"যাহার ইচ্ছার জোর আছে, সে অল্প একটু সূত্র পাইলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তোলে।···ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্বল ও সংকল্প যাহার অপরিস্ফুট তাহারই দুর্দশা।··· আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই।··· আমি দেখিতেছি, আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি—সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি।"—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবাসী ১৩১৮ অগ্রহায়ণ।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ক'রে তার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তন ক'রে, আমাদেরই বিদ্যা ও আমাদেরই বাণীকে সে শিক্ষার মন্দিরে উপযুক্ত স্থান দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের জাগ্রত চিত্তে যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, পরবর্তী কালে তাই বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠানে কর্মের রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। শিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের নিজের বিদ্যা ও নিজের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার যে আদর্শ, তারই মধ্যে শিক্ষায় মাতৃভাষাকে উপায় ও লক্ষ্যরূপে স্বীকারের কথা নিহিত রয়েছে।

অতঃপর স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনেও এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত অতি স্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে—

"It is Sir Rabindranath's strong conviction that, while *English should be skilfully and thorougly taught as a second language*, the chief medium of instruction in schools (and *even in colleges upto the stage of the university degree*) should be the mother tongue. He has four reasons for this belief; first, because it is through his mother tongue that every man

learns the deepest lessons of life; second, because some of those pupils who have a just claim to higher education cannot master the English language; third, because many of those who do acquire English fail to achieve true proficiency in it and yet, in the attempt to learn a language so difficult to a Bengali, spend too large a part of the energy which is indispensable to the growth to the power of independent thought and observation; fourth, because *a training conducted chiefly through the mother tongue would lighten the load of education for girls whose deeper culture is of high importance to India.* He holds that the essential things in the culture of the West should be conveyed to the whole Bengali people by means of a *widely diffused education*, but that this *can only be done through a wider use of the vernacular in schools.* For these reasons, in his own school at Bolpur he gives the central place to studies which can best be pursued in the mother tongue." বক্রলিপি গ্রন্থকারের। —স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদন (১৯১৯) ১ম খণ্ড, পৃ ২২৬-২৭

উদ্ধৃত অংশে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অভিমতে নূতনত্ব কিছুই নেই। 'শিক্ষার হেরফের' বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ এবং 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তাই এস্থলে অতি সংক্ষেপে ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিবেশিত হয়েছে। শুধু নারীশিক্ষার বিস্তার ও গভীরতার প্রয়োজনে মাতৃভাষাকে বাহনরূপে স্বীকারের কথাটা নূতন। আর মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাতৃভাষাকে শুধু ইস্কুল নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষারও আশ্রয় করে তোলাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধেই রয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৬

অতঃপর শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর নূতন কথা কিছুই বলেন নি। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে ওই একই কথা নূতন ভাবার,

নূতন ভঙ্গিতে বার-বার দেশের কাছে নিবেদন করে গিয়েছেন। এখানে তার থেকেই কিছু কিছু অংশ সংকলন করে দিলাম।—

"একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার··· তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্ব-সাধারণের মধ্যে।···এশিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এইজন্যেই সে সকল দেশে সে-ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্র জাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।···

"জাপানে বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না।···আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন-প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে, তখন অধিকাংশ ইংরেজিজানা বিদ্বান্ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।··· বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর (আশুতোষের) মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলা ভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠে নি, সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে, না হবার কারণ তার শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থা দৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা করে শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।···আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গ-বাণী-বীণাপাণির মন্দির-দ্বারে বরণ করে নেবার ভার আমার 'পরে।"—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রূপ, ১৯৩৩

এই প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে। ঐ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তাতেও তিনি বলেন—

"এমন মানুষ আজও দেশে আছে—যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলা ভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে।—একদিন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে

যখন আমার শক্তি ছিল, তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলা ভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজিভাষাবাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশপথে তার অনেকখানি মারা যায়।"—শিক্ষার বিকিরণ, ১৯৩৩

লক্ষ করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের মতে নিম্ন এবং উচ্চ সর্বপ্রকার শিক্ষারই বাহন হওয়া চাই মাতৃভাষা ; এমন-কি, ইংরেজি সাহিত্যকেও বসাতে হবে মাতৃভাষারই পুণ্যপীঠের উপরে। এটাই যে স্বাভাবিক এবং অন্য সব দেশেরই সর্বস্বীকৃত রীতি, সে কথাটাও আমরা একবার ভেবে দেখতে চাই না, এমনি অস্বাভাবিকতা পেয়ে বসেছে আমাদের মনোবৃত্তিকে।

অতঃপর ১৯৩৬ সালে 'শিক্ষাসপ্তাহ' উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' নামে যে ভাষণটি তিনি পাঠ করেন, তার মূলকথাই হল মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন বলে স্বীকারের জন্য আবেদন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে একটু একটু করে স্বীকার করা হচ্ছে ; কিন্তু তার মন্থরতা নৈরাশ্যকর। তাই রবীন্দ্রনাথকে বলতে হল—

"আমি যে আজ উদ্‌বেগ প্রকাশ করছি, তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনটা অত্যন্ত ভারী এবং বাংলা ভাষার পথ এখনো কাঁচা পথ। এই সমস্যা সমাধান দুরূহ বলে পাছে হতে-করতে এমন একটা অতি-অস্পষ্ট ভাবীকালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর, এই আমার ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি, পরিপূর্ণ সুযোগের জন্যে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা না করে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন করে চারাগাছ রোপণ করে সেই ভাবে।"—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬

অতঃপর তিনি এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ প্রকাশ করলেন, যার সর্বাবয়বেই থাকবে মাতৃভাষার কল্যাণস্পর্শের আশীর্বাদ। মাতৃভাষার বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর আকাঙ্ক্ষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়কেই তিনি নাম দিলেন 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়'। তাঁর মতে এই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই অচিরকালের মধ্যেই। হোক তা স্বল্পায়তন, কিন্তু চারাগাছের মতোই তার সজীব

ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া দরকার, যেন কালক্রমে সে তার পরিণত ও বিপুল মহিমার ছায়াতলে সমগ্র দেশকে আশ্রয় দিতে পারে। সেই ভাবী মহিমার প্রাথমিক সূচনা দেখে যাবার ব্যাকুলতা থেকেই তিনি বললেন—

"বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই।...বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই, সে দাঁড়াক বালক-বিদ্যালয় হয়ে। তার বালকমূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।" —শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন ভাবী কালে এই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র আদর্শ বলে স্বীকৃত হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজাসনের অসপত্ন অধিকার হবে তারই। কিন্তু 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না'—একথাও তিনি জানতেন। তাই তিনি 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি করে এই প্রবন্ধেও রফানিষ্পত্তির প্রস্তাব করে বললেন, ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন চলছে চলুক, তার পাশেই একটি সর্বাঙ্গীণ বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হওয়া চাই। হোক তা স্বল্পায়তন, হোক তার মর্যাদা গৌণ, কিন্তু তার আবির্ভাবকে বিলম্বিত করা চলবে না। মাতৃভাষাকে শিক্ষামন্দিরের প্রত্যেক কক্ষেই আসন দেওয়া চাই ; হোক তা নিম্নাসন, কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করে অকৃতার্থ করা চলবে না। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুল আবেদন বাংলাদেশের শিক্ষাধিনায়কদের কাছে।

অতঃপর ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আহূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন (ফেব্রুআরি ১৭), তাতেও তিনি মাতৃভাষাকে বিশ্ব-বিদ্যার মন্দিরে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার আবেদনই জানান। ১৮৮৩ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার স্রোতোধারাকে মাতৃভাষার স্বাভাবিক পথে বিশ্ববিদ্যার সংগমতীর্থে পরিচালিত করবার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তাঁর এই চিরবাঞ্ছিত বহুপুনরাবৃত্ত এবং নিত্য উপেক্ষিত আদর্শের কথা বোধ করি শেষবারের মতো দেশের কাছে উপস্থাপিত করলেন ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণ সভায়। সে সভায় তিনি বললেন—

"সকলের চেয়ে অনর্থকর রূপণতা বিদ্যাকে বিদেশীভাষার অন্তরালে দুরত্ব দান করা। পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।···বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব, তুরস্কে প্রাচ্যজাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয় নি কেবল মাত্র আমাদেরই দেশে।··· পরাসক্ত মনকে চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায় শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ ও প্রয়োগ করার চর্চা।··· দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্যে প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।···

"ইংরেজিশিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে; এই প্রদেশের শিক্ষা-নিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এজন্য অনেকদিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করছে।···

"আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য-বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না; বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গমঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তার পরে তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন, সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন।···বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তা লাভে গৌরবান্বিত হবে, সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি; তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আমার উপস্থিতি। এতে বোঝা গেল, বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতুপরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ার শীতে-আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লবের উৎসব।"

—ছাত্রসম্ভাষণ, ১৯৩৭

এই উক্তির পরে দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে। দেশের উপর থেকে পাশ্চাত্ত্য শাসনের অবসান হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য শীতের হাওয়া এখনও বইছে প্রবল বেগেই; নবঋতু-সমাগমে নবপুষ্পপল্লব-সম্ভাবনার অভাসমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই', রবীন্দ্রনাথের এই সুচিরপোষিত কামনা এখনও পর্যন্ত কবিদৃষ্ট স্বপ্নের বস্তু হয়েই রইল। রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্ন যে অসম্ভবের পায়ে মাথাকোটা মাত্র নয়, তার প্রমাণস্বরূপ তাঁরই একটি উক্তি উদ্‌ধৃত করছি—

"আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম, তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে, তার প্রথম ভাগে অনেককাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে, সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।"—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬

স্বাধীন দেশের অধিনায়কদের চিত্তকে রবীন্দ্রনাথের এই বেদনাতুর কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারবে কি না সন্দেহ। তবু যে বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচনা করলাম, তার মূলেও রয়েছে তাঁরই আর একটি সংশয়হীন উক্তির প্রেরণা। সে উক্তিটি এই—

"শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজন-স্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলাম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার লোক বারে বারে পাওয়া যাবে।" —শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

৭

খাদ্য যতক্ষণ আমাদের রক্তপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত না হয়, ততক্ষণ তার দ্বারা জীবনশক্তির পোষণ হয় না, বরং সেই অজীর্ণ খাদ্য দেহকে ব্যাধিগ্রস্ত করে বিনাশের দিকেই এগিয়ে দেয়। শিক্ষাও তেমনি মাতৃভাষার যোগে আমাদের স্বাভাবিক মননধারার সঙ্গে যুক্ত না হলে তার দ্বারা চিত্তের পুষ্টি তো হয়ই না, বরং সেই অস্বাঙ্গীকৃত শিক্ষা আমাদের মনের বহুবিধ বিকৃতিরই উৎস হয়ে ওঠে। শিক্ষার এই অস্বাভাবিক অবস্থা আমাদের দেশে আবহমানকাল চলে আসছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সংস্কৃত ও ফারসির চাপে বাঙালি মনের স্বাভাবিক উৎকর্ষ ব্যাহত হয়েছে, আধুনিক কালে হয়েছে ইংরেজির চাপে। ফলে আমাদের চিত্তমুক্তির অবকাশ কখনও ঘটেনি। শিক্ষাকে পরভাষার পীড়ন থেকে মুক্ত করে মাতৃভাষার যোগে আমাদের চিত্তবিকাশের অন্তরায় ঘোচাবার প্রয়োজনীয়তা কার মনে প্রথম দেখা দেয় জানি না। যতদূর জানি, তাতে মনে হয়,

মাতৃভাষার যোগে শিক্ষামুক্তির বাণী প্রথম উচ্চারণ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৮৮০ সালেই তিনি 'কালেজী-শিক্ষা' নামে এক প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষাকে বিদেশী ভাষার বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অতি স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি আজও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। তার থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করি।—

"আমরা কালেজে যে শিক্ষা পাই, সে-শিক্ষা কোন কাজেরই নয়।...যাহা একটু কালেজে শিখি, তাহার শিখিবার উপায়ও ভাল নহে।...যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজ হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন, অতি দূরবর্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চার ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট-দশ বৎসর লাগে।...বাংলা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম।...ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজিতে অঙ্ক করিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? **বাংলা দিয়া ইংরেজি শিখ না কেন?** ইংরেজি দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন?

"আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে, আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজিমুখে শিখিতে হয়।

"যেরূপ চলিতেছে, ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরেজি শিক্ষা অল্প হয়, আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না। **শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান।**"—বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ ভাদ্র।

পরভাষাবাহিত শিক্ষার ব্যর্থতা সম্পর্কে হরপ্রসাদের এই মন্তব্যই বোধ করি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য উক্তি (১৮৮০)। আর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য পাই সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন, মেঘনাদ সাহা-প্রমুখ দশজন দেশী ও বিদেশী মনস্বিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদনে (১৯৪৯)। তাঁদের অভিমতের সঙ্গে হরপ্রসাদের মন্তব্যের সাদৃশ্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যোগ্য।—

English cannot continue to occupy the place of state language as in the past, *Use of English as such divides the people into two nations,* the few who govern and the many

who are governed, the one unable to talk the language of the other, and mutually uncomprehending. This is a negation of democracy.

It is educationally unsound to make a foreign tongue the means of acquiring knowledge Dr. Hans, Lecturer in Comparative Education in the London University, points out in his recent book the serious drawbacks in adjusting a foreign language as a medium of instruction, He says,—

"Before entering school the pupils have acquired a proficiency in the mother tongue, have built up a vocabulary covering most of the objects of sense impressions and their daily activities. At school they have to superimpose on this basis a language of ideas and abstract relations, expressed entirely in a foreign medium. Their minds become split into two watertight compartments, one for ordinary things and actions expressed in their mother tongue, and another for things connected with school subjects and the world of ideas expressed in a foreign language. As a result they are unable to speak of their home affairs in the school language and about learned subjects in their mother tongue."

And not only the individual but the *nation develops a split consciousness, the "Babu Mind."* This is what happened in India under British rule. We have paid a heavy price for learning in the past. Instead of laying stress upon thinking and reasoning we emphasised memorising, in place of acquiring knowledge of things and realities, we acquired a sort of mastery over words. It affected originality of thought and development of literature in the mother tongue. *We have impoverished ourselves without being able to enrich the language we so assiduously studied.* It is phenomenon to

find the speaker of one tongue contributing to great literature in a different language. *The paucity of great literature which is the inevitable consequence of devotion by the educated to a language other than their own is a double loss—intellectual and social*, for great literature is a powerful factor in fostering culture, refinement and true fellowship.

Whatever the advantages of English and the immediate risks in a change over to the new, the balance of advantage on a long view of the matter lies in the change. (বক্রলিপি গ্রন্থাকারের)। —রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রতিবেদন, পৃ ৩১৬-১৭

অনেকটা অংশ উদ্ধৃত করা গেল। কারণ এই অংশটুকুর মধ্যেই আমাদের শিক্ষার বাহন সমস্যার কথা অতি সংক্ষেপে অথচ সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এমন অল্প-পরিসরের মধ্যে এই সমস্যার এত পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ কোথাও দেখি নি। অতঃপর এই কমিশনের সুপারিশগুলিও এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।—

We recommend :

3. That for the medium of instruction for higher education English be replaced as early as practicable by an Indian language which cannot be Sanskrit on account of vital difficulties.

4. That (i) pupils at the Higher Secondary and University stages be made conversant with three languages, the regional language, the federal language and English (the last one in order *to acquire the ability to read books in English*) and, (ii) *Higher education be imparted through the instrumentality of the regional* language with the option to use the medium of instruction either for some subjects or for all subjects.—রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রতিবেদন, পৃ ৩২৬

বলা প্রয়োজন যে, ফেডারেল ভাষা বলতে এখানে হিন্দিকেই বুঝিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন, মেঘনাদ সাহা-প্রমুখ মনস্বীদের সুচিন্তিত

অভিমত এই যে, মাতৃভাষাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষারও বাহন বলে স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়। ইংরেজিকে যে তার বর্তমান একেশ্বরত্বের অধিকার থেকে নামিয়ে এনে তাকে তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এ বিষয়েও তাঁদের অভিমত সংশয়াতীত। নতুবা আমাদের শিক্ষা কখনও স্বাভাবিক গতি পেতে পারবে না। আর শিক্ষা যদি দেশের চিত্তে স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হতে না পারে, তবে আমাদের কল্যাণের আশাও সুদূরপরাহত।

উচ্চাঙ্গের শিক্ষার বাহন-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে—"ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।" অর্থাৎ, ভাষার উন্নতিই হচ্ছে জাতীয় উন্নতির প্রধান মাপকাঠি, আর জাতীয় উন্নতি সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে মাতৃভাষার উন্নতিসাধন। শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে মাতৃভাষাকে নির্বাসিত করলে উন্নতিলাভের প্রধান অবলম্বনকেই জেনেশুনে বিনষ্ট করা হয়। অতঃপর স্বামীজির উক্তি উদ্‌ধৃত করি।—

"আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য-রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় শিক্ষা দিয়াছেন।"—'ভাববার কথা', বাঙ্গালা ভাষা (১৯০০ ফেব্রুআরি ২০)

'দেবভাষা' সংস্কৃত ভারতীয় বিদ্যার বাহন হবার ফলে দেশের কতখানি ক্ষতি হয়েছে তা উদ্‌ধৃত উক্তিতেই প্রকাশ। এ ক্ষতি থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য বুদ্ধ-প্রমুখ লোকহিতার্থীরা লোকভাষাকেই আশ্রয় করেছেন। ভারতে এবং বহির্ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারের একটা বড়ো কারণ সর্বত্রই লোকভাষার আশ্রয় গ্রহণ। বৌদ্ধধর্ম যে-দেশে গেছে সে-দেশের ভাষাকেই আশ্রয় করেছে, প্রত্যেক দেশই নিজ ভাষার যোগেই উদ্‌বুদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছে, কোনো পর-ভাষার পীড়নে পিষ্ট ও আড়ষ্ট হয় নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'সর্বলোকহিত'-ব্রতী সম্রাট্ অশোকের আমলকেই সবচেয়ে গৌরবের যুগ বলে স্বীকার করা হয়। এই গৌরবেরও অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, তিনি ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই বাণী প্রচার করেছিলেন স্থানীয় লোকভাষাতেই, কোনো দেবভাষা বা ধর্মভাষার আশ্রয় তিনি নেন নি। 'নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎ পা' (সর্বলোকের হিত সাধন অপেক্ষা মহত্তর কর্ম নাই)—এই ছিল যাঁর মহৎ বাণী, তিনি যে প্রদেশে প্রদেশে

লোকভাষাকেই বাণী ও বিদ্যার বাহন বলে স্বীকার করে নেবেন তা বিচিত্র নয়। চৈতন্যদেবও যে সংস্কৃত ছেড়ে বাংলা ভাষাকেই ধর্মপ্রচারের বাহন করেছিলেন, তার ফলেই মধ্যযুগে বৈষ্ণব ভাবকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্য এমন অভূতপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছিল। ইউরোপেও মার্টিন লুথার প্রমুখ ধর্মসংস্কারকদের প্রভাব যে প্রত্যেক দেশের জাতীয় সাহিত্যের মূলে প্রেরণা জুগিয়েছিল সে কথা কে না জানে। ভারতবর্ষের মধ্যযুগে কবীর নানক এবং আধুনিক কালে রামমোহন-প্রমুখ ধর্ম-প্রবক্তাদের আবির্ভাবের ফলও হয়েছে একই, প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাই পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়েছে সতেজে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা স্মরণীয়। ইউরোপের ইতিহাসে দেখি ইতালীয় ভাষার উদ্‌বোধনের মূলে রয়েছে যে-সব প্রভাব, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের সংস্পর্শ। তেমনি ফরাসি সাহিত্যও এক সময়ে জর্মান ও রুশ সাহিত্যকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে পুনরুজ্জীবন লাভের পথে। আমাদের দেশে সে কাজ করেছে ইংরেজি সাহিত্য। ইউরোপে গ্রীক-লাটিন বা ফরাসি সাহিত্য কোনো জাতীয় ভাষাকেই দাবিয়ে রাখতে পারে নি। যতদিন দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে ততদিনই ক্ষতি হয়েছে। এদেশে সংস্কৃত এবং ইংরেজিরও সেই ভূমিকা। যতদিন এদের একাধিপত্য চলেছে ও চলবে ততদিনই জাতীয় উন্নতির অন্তরায় ঘটেছে ও ঘটবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যে জীবনে প্রাণের শিক্ষা জ্বালিয়ে দেওয়াতেই এই দুইভাষার সার্থকতা, জাতীয় জীবনে গৃহদাহ ঘটানোতে নয়।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। লোকভাষাই হচ্ছে সমস্ত উচ্চাঙ্গ বিদ্যার স্বাভাবিক আধার বা বাহন এবং তাই হওয়া উচিত, এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ অভিমত।—

"যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর। ··· ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশ জনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচ জনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি···তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না।···যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্তকথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।" —'ভাববার কথা', বাঙালা ভাষা

স্বামীজী অবশ্য কথাগুলি বলেছিলেন সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষার প্রসঙ্গে। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত তথা ইংরেজি বনাম বাংলা (অবশ্য চলিত) ভাষা প্রসঙ্গেও কথাগুলি সমভাবে প্রযোজ্য। যে স্বাভাবিক ও জ্যান্ত ভাষায় আমরা নিত্য কথা বলি, চিন্তা করি, সে ভাষাই দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত উচ্চাঙ্গের বিদ্যার আদর্শ বাহন, কোনো মৃত বা কৃত্রিম ভাষা নয়। অর্থাৎ সংস্কৃত বা ইংরেজি নয়, আমাদের মাতৃভাষাই সমস্ত উচ্চাঙ্গ ও বিদ্যার স্বাভাবিক বাহন ও আধার।

১৯০০ সালে স্বামীজী যে কথাগুলি বলেছিলেন, বিদ্যাকে জীবন্ত ও জাতিকে বলিষ্ঠ করে তোলবার যে পথ নির্দেশ করেছিলেন, আজ ষাট বৎসরের অধিক কাল পরেও তা স্মরণীয়তা হারায় নি। আমাদের শিক্ষা ও বিদ্যা স্বাভাবিক বাহন পায় নি। আমরা যে ভাষায় কথা কই, বিচার-বির্তক করি বা চিন্তা করি, সে ভাষায় লিখি না। আর যে ভাষায় লিখি সে ভাষায় ভাবি না। তাই আমাদের শিক্ষার হেরফের ঘোচে না। আমাদের চিন্তা ও প্রকাশের এই যে দ্বৈতরূপ, তাকেই আচার্য রাধাকৃষ্ণন বলেছেন 'split consciousness'। তাই আমাদের জাতীয় চিত্ত আজ চিন্তায় ও প্রকাশে দ্বিধা বিভক্ত, জাতীয় জীবন আজ শিক্ষিতে অশিক্ষিতে দ্বিধা বিভক্ত। এরকম দ্বিধাগ্রস্ত জাতি যে কখনও ঐক্যের বলে বলীয়ান্ হয়ে সার্থকতার তীরে উত্তীর্ণ হতে পারে না, তাও যে বলে দেবার অপেক্ষা রাখে এটাই আমাদের চরম দুর্ভাগ্য।

১৮৮০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত হরপ্রসাদ, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমোহন, গুরুদাস, রবীন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, আশুতোষ, রাধাকৃষ্ণন, মেঘনাদ-প্রমুখ মনীষীরা শিক্ষাকে মাতৃভাষার স্বাধিকারের উপরে স্থায়িত্বদানের জন্য যে আবেদন করে এসেছেন, বাংলা দেশে বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার যে আদর্শ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সম্মুখে স্থাপন করেছেন, আমাদের বর্তমান শিক্ষাধিনায়ক-দের দৃষ্টি সেদিকে কবে আকৃষ্ট হবে জানি না। কিন্তু একথা সত্য যে—

"আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়; লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্ত-বিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল, সেইটেই রয়েছে সবচেয়ে পর হয়ে⋯এর ব্যর্থতা আমাদের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করেছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে।⋯

এসিয়ার নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যে-সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদানপ্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে, তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে—এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্রদেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানে নি।"—রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতীর শিক্ষানীতি

নানাকারণে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে জনমত আজ জাগরূক হয়ে উঠেছে কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত। আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে প্রচুর পরিমাণেই। কিন্তু বিশ্বভারতীর পক্ষে সহায়ক ও সাংগঠনিক আলোচনা বা সমালোচনা খুবই কম হয়েছে।

বিশ্বভারতী অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নকল হবে না, তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় থাকা চাই, শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করাই বিশ্বভারতীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে আচার্য জওহরলাল থেকে সাধারণ সমালোচক পর্যন্ত সকলেই একমত। বিশ্বভারতী-আইনে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্বভারতী ও তার বিশিষ্টতাকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীকে, আর মহাত্মা গান্ধী সে ভার অর্পণ করেছিলেন স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, একথা সর্বজনবিদিত। সুতরাং যে শিক্ষানীতিকে রবীন্দ্রনাথ প্রবল আবেগের সঙ্গে দেশের শিক্ষানায়কদের কাছে বারংবার উপস্থাপিত করেছেন এবং যে নীতি মহাত্মা গান্ধীরও আন্তরিক সমর্থন লাভ করেছে, তা যে বিশ্বভারতীর অন্যতম মূলনীতি বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং সেই নীতি রক্ষার দ্বারাই যে বিশ্বভারতীর বিশিষ্টতা রক্ষিত হবে, তাতে সন্দেহ করা চলে না। এমন একটি নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। সে নীতিটি হচ্ছে বিদ্যা বিস্তরণের সর্বস্তরেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতিদানের নীতি।

একথা আজ কে না জানে যে, রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ধরে

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার জন্য দেশের কাছে বারবার আবেদন করে গেছেন। পূর্ববর্তী 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়' নামক প্রবন্ধটিতে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবু বক্তব্যবিষয়কে পরিস্ফুট করবার জন্য কালানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্‌ধৃত করা প্রয়োজন।

১৮৮৩ সালে এক প্রবন্ধে (ভারতী, ১২৯০ কার্তিক) তিনি লিখেছিলেন—

"বঙ্গ-বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।"

১৮৯২ সালে 'শিক্ষার হেরফের' নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন—

"আমাদের ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। ...শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ মিলন কে সাধন করতে পারে?—বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।—বঙ্গদেশের পরমদুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্তিনী হইয়া এমন-সকল ভালো ভালো ছেলের সমাদর করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলা ভাষার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমন-কি, বাংলায় চিঠিও লেখে না।—আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না। আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে; যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকটসংসর্গ আমরা লাভ করি না— তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ় সম্বন্ধ রূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা [শিক্ষিত লোকেরা] দূরে পড়িয়া গেছেন।"

অর্থাৎ মাতৃভাষার যোগে বিদ্যালাভ করেন না বলে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিদ্যাটাও যথার্থরূপে আয়ত্ত হয় না এবং মাতৃভাষায় সে বিদ্যাকে প্রকাশ করবার সামর্থ্যও লাভ করেন না। যে বিদ্যা মাতৃভাষায় প্রকাশ লাভ করে না সে বিদ্যা তো বন্ধ্যা।

অতঃপর 'শিক্ষার বাহন' (১৯১৫) নামক প্রবন্ধটির কথা সকলেরই মনে পড়বে। আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে ওই প্রবন্ধে তিনি বলেন—

"আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই।" এই প্রসঙ্গেই অতঃপর বলেন—"আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"

ওই প্রবন্ধেরই অন্যত্র আছে—"ইংরেজি আমাদের শেখা চাই-ই।··· কেবল ইংরেজি কেন, ফরাসি জর্মন শিখিলে আরো ভালো। সেইসঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্ মুখে বলা যায়?"

যে সময়ে এ প্রবন্ধটি লেখা হয় তখন শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে তার একমাত্র বাহন বলে গ্রহণ করবার লেশমাত্র সম্ভাবনাও ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতির অনুসরণ করে আপসরফার পরামর্শ দিলেন—বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশাপাশি দুই ব্যবস্থা চলুক; একদিকে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলুক ইংরেজিতে, অপরদিকে সে কাজ চলুক বাংলায়।

বলা বাহুল্য, এই আপসরফার পরামর্শও তখন গৃহীত হয় নি, আজও এই স্বাধীনতার যুগেও গৃহীত হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কারণ পরাধীনতার স্থূল রূপটাই অপসৃত হয়েছে, কিন্তু তার অদৃশ্য মায়াজালটা আমাদের হৃদয়-মনকে এখনও মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। ইংরেজের শাসন গিয়েছে, ইংরেজির শাসন যায় নি। এই শাসনের অধিকার আমাদের দেহের উপরে নয়, তার অধিকার আমাদের অন্তরে। তার সম্বন্ধে বলা যায়—"নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।" রক্তকরবীর জালের মতো এই মোহজালও অদৃশ্য বলেই দুশ্ছেদ্য।

এইজন্য ১৯৩৩ সালে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েই তাঁকে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছিল—

"রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগে নি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলা ভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে।"

এই আক্ষেপ প্রকাশের পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে,

রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজলাভের পরেও চৌত্রিশ বৎসর পার হয়ে গেল, তথাপি এখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ এল না, এমন-কি সে স্বরাজ পাবার উৎসাহও আমাদের জাগে নি, আর শিক্ষাকে মাতৃভাষার আসনে বসালে তার মূল্যহানি ঘটবে বলে যারা মনে করে এমন মানুষের অভাবও ঘটে নি।

যা হোক, রবীন্দ্রনাথ এই আক্ষেপোক্তি শেষ করেন বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হৃদয়ের আর্ত আবেদন জানিয়ে।

অতঃপর 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে (১৯৩৬) তিনি এই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নিজের শিক্ষার প্রসঙ্গে বলেন—

"বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারংবার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।··· আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ—যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধুভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।··· এর ফলে শিশুকালেই বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক্, শিশু-মনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয় নি।

···ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহস-পূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।··· তার প্রধান কারণ,··· শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়।"

বিশ্বভারতীয় শিক্ষানীতির একদিকের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে এই উক্তি থেকেই। কেননা, রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের প্রেরণাই ছিল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে।

'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর হৃদয়ের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষায় ও একটি বাক্যে।—"বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব শিশুমূর্তি দেখতে চাই।"

এর পরের বৎসর (১৯৩৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদবী-সম্মান-বিতরণ' সভাতেও তিনি তাঁর 'ছাত্রসম্ভাষণে' এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেন।

'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে', 'তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে, হয়তো দুয়ার টলবে না, তা বলে ভাবনা করা চলবে না'—এই যাঁর অন্তরের বাণী, তিনি যে মাতৃভূমির কাছে মাতৃভাষার জন্য বার-বার আবেদন জানিয়েও নিরস্ত হবেন না তা বিচিত্র নয়। তাই তিনি শেষবারের মতো বললেন, "ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষা-নিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে ; এজন্য অনেকদিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।" অবশেষে, "বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তালাভে গৌরবান্বিত হবে"—এই আশা নিয়েই তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই আশা আজও পূর্ণ হয় নি। কিন্তু 'তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে, হয়তো রে ফল ফলবে না, তা বলে ভাবনা করা চলবে না'। তাই তিনি সুদূর অনাগতকালের প্রতি লক্ষ রেখে আমাদের জন্য এই বাণী রেখে গিয়েছেন।—

"সেদিন যা ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।"—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

বলা বাহুল্য, তাঁর এই শেষ উক্তিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথমেই কামনা প্রকাশ করেছিলেন, 'বঙ্গবিদ্যালয়ে' দেশ ছেয়ে গিয়ে বাংলা ভাষার যোগে সমস্ত আধুনিক শিক্ষা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ুক, আর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন, একটি 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুমূর্তি দেখে যেতে চাই।' তাঁর জীবিতকালে এই দুই কামনার কোনোটিই পূর্ণ হয় নি। তাঁর তিরোধানের পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, তাঁর জন্মশতবার্ষিক উৎসবও দীর্ঘকাল পূর্বেই সুসম্পন্ন ; কিন্তু তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো লক্ষণ আজও বাংলার শিক্ষাদিগন্তে আভাসেও ফুটে ওঠে নি। তিনি বারবার চার বার বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে শিক্ষাকে মাতৃভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে বেদনার্ত আবেদন জানিয়েছেন, তাও আজ পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্যই রয়ে গেল। তিনি যখন এই পৌনঃপুনিক আবেদন জানাচ্ছিলেন তখনও তাঁর বিশ্বভারতী

বিধানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ গ্রহণ করে নি। তাঁর তিরোধানের দশ বৎসর পরে বিশ্বভারতী যখন বিধানসম্মত স্বীকৃতি লাভ করল, তখন আশা হয়েছিল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানই অবশেষে বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুমূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে। তাই যখন বিশ্বভারতীতেও রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার লেশমাত্র আভাসও কোথাও দেখা গেল না, 'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়'।

আমাকে বারবারই শুনতে হয়েছে, বিশ্বভারতী তো শুধু বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি সব দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ই তো আন্তর্জাতিক, অথচ সে সব দেশে সেখানকার স্থানীয় ভাষাই তো সমস্ত শিক্ষার বাহন। ভারতবর্ষের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় নয়? তাই বলে কি সে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কখনও আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার বাহন বলে গণ্য হতে পারবে না? এসব তর্কযুক্তির কথা পুনরুত্থাপন করতে চাই নে। শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিশ্বভারতীর পরিদর্শক, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং রাজেন্দ্রপ্রসাদও এখানে সমাবর্তন উৎসবের ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলায়—ইংরেজিতে নয়, হিন্দিতেও নয়। আমাদের আচার্যও কি বাংলায় ভাষণ দিতে পারেন না বলে দুঃখ করেন নি?* আর বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনও ইংরেজির ন্যায় বাংলাতেও প্রকাশের কথা সংসদকে অনুমোদন করিয়ে নেন নি? সব চেয়ে বড় কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্যই তো বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিধানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবার পূর্বেও দীর্ঘকাল (১৯২১-৫১) এই প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক বলেই স্বীকৃত ছিল। তথাপি রবীন্দ্রনাথ এখানকার সভাসমিতিতে বাংলাতেই ভাষণ দিতেন এবং আচার্যরূপে নির্দেশাদিও দিতেন বাংলাতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও জানি 'শান্তি-নিকেতন-সমিতি' তথা 'রবীন্দ্রভবন সমিতি'-র প্রস্তাব গ্রহণ, প্রতিবেদন প্রভৃতি কার্যকলাপ বাংলাতেই নির্বাহিত হত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যার শিক্ষাপীঠ বলে স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বভারতী অ-ভারতীয় ভাষার অঞ্চল গ্রহণ

* আচার্যের ভাষণ বাংলায় দিতে পারেন নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন সরোজিনী নাইডু এবং পণ্ডিত জওহরলাল। আর বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও সুধীরঞ্জন।

করল। স্বরাজ-সরকারের স্বীকৃতি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বভারতীর এই ভাবান্তর দেখে কারও যে হাসি পেল না, তা দেখেই কাঁদতে ইচ্ছা করে। অথচ এর হাস্যকরতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন বহুকাল পূর্বেই।—

"শিক্ষা সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়ি-পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, [ইংরেজি ভাষার] খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।"—শিক্ষার বিকিরণ (১৯৩৩)

২

রবীন্দ্রনাথের এ সব উক্তি চিরকালই আমার মনকে গভীরভাবে ও নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে। শুধু তাই নয়, সক্রিয়তার দিকেও প্রেরণা দিয়েছে। তার একটু আভাস দিয়েছি পূর্বেই। ১৯৪২ সালে এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থায় বাংলাভাষাকে যতটা সম্ভব স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন করেছিলাম। অতঃপর ১৯৪৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন শেষবার এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁকে সোদপুরের ঠিকানায় চারটি প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছিলাম। চারিটি প্রশ্নই ছিল বিশ্বভারতীতে ভাষা প্রয়োগের দিক্ নিয়ে। পত্র লেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে উত্তরটা পেয়েছিলাম, সেটি এখানে অবিকল উদ্ধৃত করে দিলাম—

খাদী প্রতিষ্ঠান, সোদপুর,
পোস্টমার্ক : ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫

ভাই প্রবোধচন্দ্র সেন,

আপকা পত্র মিলা। ইসী বারেমেঁ মৈঁনে রথীবাবুকো লিখা হৈ। বিশ্বভারতীকে সব নিবাসীয়োঁকো বংগলা ঔর হিন্দুস্তানী জাননা হী চাহিয়ে। অংগ্রেজীকী সবকো আবশ্যকতা নহীঁ হোনী চাহিয়ে। বিদেশী জো আবে উনকো লিয়ে প্রথম হিন্দুস্তানী সীখনেকো প্রবন্ধ করনা চাহিয়ে। বংগাল ছোড়কর জো অন্য প্রান্তসে আতে হৈঁ উনকো বংগলা সীখনেকো অনিবার্য হোনা চাহিয়ে—জৈসে বংগলীয়োঁকো হিন্দুস্তানী সীখনেকো হোনা চাহিয়ে। তব হী বিশ্বভারতী অপনে নামকে ঔর গুরুদেবকে নামকে যোগ্য বন সকতী হৈ। মেরী চলে তো বহাঁকে

সব কারবারোঁকো হিন্দুস্তানী মেঁ রখুঁ আজ বহ সম্ভব ন হো তো বংগলা মেঁ রখুঁ —অংগ্রেজী মেঁ হরগীজ নহী।

চৌথা প্রশ্নকে বারেমেঁ মৈঁ সম্পূর্ণ নাহিতী ন হোনেকে কারণ কুছ অভিপ্রায় দেনা নহীঁ চাহতা হুঁ।

—বাপুকে আশীর্বাদ

এর বাংলা অনুবাদ এই—

ভাই প্রবোধচন্দ্র সেন,

আপনার পত্র পেয়েছি। এ বিষয়ে আমি রথীবাবুকে লিখেছি। বিশ্বভারতীর সব নিবাসীরই বাংলা ও হিন্দুস্থানী জানা চাই। ইংরেজি সকলের পক্ষে আবশ্যিক হওয়ার দরকার নেই। বিদেশী যাঁরা আসবেন তাঁরা প্রথমে হিন্দুস্থানী শিখবেন। বাংলার বাইরের অন্য প্রদেশ থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের পক্ষে বাংলা শেখা অনিবার্য হওয়া চাই, যেমন বাঙালির পক্ষে হিন্দুস্থানী শেখা চাই। তবেই বিশ্বভারতী নিজের নাম তথা গুরুদেবের নামের যোগ্য হতে পারে। আমার মত যদি চলত তবে ওখানকার সব কাজই হিন্দুস্থানীতে চালাতাম, এখনই তা সম্ভব না হলে বাংলায় চালাতাম—ইংরেজিতে কথনোই নয়।

চতুর্থ প্রশ্নের বিষয় আমি সম্পূর্ণ অবগত নই বলে ও-বিষয়ে কোনো অভিমত দিতে চাই না।

স্বক্ষর: 'বাপুকে আশীর্বাদ'

রথীবাবুকে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তা বিশ্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে, ভাষা বিষয়ে নয়। আমার চতুর্থ প্রশ্ন কি ছিল তা এখন মনে নেই।

মহাত্মাজীর পত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর মতে—১. বিশ্বভারতীর শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থায় ইংরেজির যে প্রাধান্য এখন বিদ্যমান তার কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নেই, ২. অবাঙালি-বাঙালি নির্বিশেষে এখানকার সকলেরই বাংলা ও হিন্দুস্থানী জানা চাই, এবং ৩. এখানকার কাজকর্ম সমস্তই হিন্দুস্থানীতে, এখনই তা সম্ভব না হলে বাংলায়, চালানো উচিত।

এখানে শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও একথা নিঃসন্দেহেই বোঝা যায় যে, তাঁর মতে এখানে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত হয় বাংলা, না হয় হিন্দুস্থানী, ইংরেজি যে নয় সে বিষয়ে তিনি

সংশয়ের কোনো অবকাশই রাখেন নি। তা ছাড়া, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় গুরুদেবের যে অভিপ্রায় নিহিত ছিল তাকেই যে এখানে প্রাধান্য দিতে হবে তারও স্পষ্ট আভাস রয়েছে ওই পত্রেই। আর শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে গুরুদেবের অভিপ্রায় কি ছিল, সে বিষয়ে এখন আর কারও সন্দেহ নেই।

৩

হিন্দুস্থানী সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় তাঁর অভিমত আমাদের জানিয়ে গেছেন। এ স্থলে তাঁর সেই অভিমত স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

১৯২৩ সালের মার্চ মাসে গান্ধীজি-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের অল্প-কাল পরে যখন হিন্দি ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা বলে গণ্য করবার দাবি প্রায় সর্বজনস্বীকৃত, সে সময়েই রবীন্দ্রনাথ কাশীতে উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে হিন্দিভাষার পক্ষে উক্ত দাবি সম্পর্কে যা বলেন তা এই—

"এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালি যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে।...

"য়ুরোপে এক সময়ে লাটিন ভাষা জ্ঞানচর্চার একমাত্র সাধারণ ভাষা ছিল। যতদিন তা ছিল ততদিন য়ুরোপের ঐক্য ছিল বাহ্যিক আর অগভীর। কিন্তু আজকের দিনে য়ুরোপ নানা বিদ্যাধারার সম্মিলনের দ্বারা যে মহত্ত্ব লাভ করেছে সেটি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো মহাদেশে ঘটে নি। এই ভিন্ন-ভিন্ন-দেশীয় বিদ্যার নিরন্তর সচল সম্মিলন কেবলমাত্র য়ুরোপের নানা দেশের নানা ভাষার যোগেই ঘটেছে, এক ভাষার দ্বারা কখনও ঘটতে পারত না। আজকের দিনে য়ুরোপে রাষ্ট্রীয় অসাম্যের অন্ত নেই, কিন্তু তার বিদ্যার সাম্য আজও প্রবল। এই জ্ঞান-সম্মিলনের উজ্জ্বলতায় দিক্‌বিদিক্‌ অভিভূত হয়ে গেছে। সেই মহাদেশে দেয়ালি-উৎসবের যে বিরাট্‌ আয়োজন হয়েছে তা সমাধা করতে সেখানকার প্রত্যেকটি দেশ তার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে এনেছে। যেখানে যথার্থ মিলন সেখানেই যথার্থ শক্তি। আজকের দিনে য়ুরোপের যথার্থ শক্তি তার জ্ঞান-সমবায়ে।

"আমাদের দেশেও এই কথাটি মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরেজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না, হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব

হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই যথার্থ মিলন হতে পারে। কিন্তু যদি বাহ্য বন্ধনপাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় পরম শত্রুতা।...

"এমন বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষাবৈচিত্র্যের উপর স্টীম-রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজপথের পথ সমভূমি করতে চায়।...বাইরের যে এক তা হচ্ছে প্রলয়, তাই একাকারত্ব। আর অন্তরের যে এক তা হল সৃষ্টি, তাই ঐক্য। একটা হল পঞ্চত্ব, আর একটা হল পঞ্চায়েত।"—সভাপতির অভিভাষণ, 'সাহিত্যের পথে' (১৩২৯)

এই অভিভাষণের পনেরো বছর পরে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসেও রবীন্দ্রনাথ আর একবার এই সতর্কবাণী পুনরুচ্চারণ করেন।—

"হিন্দুস্থানীকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্য একভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

"রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারী প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারি তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

"এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে, এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ্ নিয়তই অদল-বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয় চিত্ত জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

"তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির একভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে, সেদিন য়ুরোপের বড়োদিন। আমাদের দেশেও সেই বড়োদিনের অপেক্ষা

করব—সব ভাষা একাকার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা। —'বাংলাভাষা পরিচয়' (১৯৩৮), ৮ম পরিচ্ছেদ

অনুরূপ কথা তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে শিক্ষাব্রতীদের উদ্দেশ্যেও উচ্চারণ করেছিলেন।—

"একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তনহীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে যুক্ত হল। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সেই ভাষাস্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত য়ুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায়সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিত্তপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। য়ুরোপে এই দেশীয় ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে-সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল য়ুরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে।··· বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না, সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এসিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিলে, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এইজন্যই সে-সকল দেশে সে ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্র জাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।" —বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (১৯৩৩)

বিদেশী বা স্বদেশী, ইংরেজি বা হিন্দি, কোনো এক ভাষার যোগে ভারতবর্ষে, শিক্ষা, চিন্তা ও বিদ্যার ঐক্য বিধানের কল্পনা অবাস্তব, কেননা তা মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, ইতিহাস-বিরুদ্ধ; ভারতবর্ষের সবগুলি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাকে প্রদীপ্ত করে তুলে তাদের সমবায়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেয়ালি-উৎসবের ব্যবস্থা করলে তবেই ভারতীয় চিত্তের ঐক্য জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট অভিমত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাকে একভাষার একতাপত্র আধিপত্যের আওতায় আচ্ছন্ন করে নয়, প্রত্যেকটি প্রাদেশিক

এ যারই স্বতন্ত্র ও অপ্রতিহত প্রকাশের ও সমবায়ের দ্বারাই ভারতীয় ঐক্যের বিধান করতে হবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এককালে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর কে. এল. শ্রীমালীও রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের সমীচীনতা সর্বতোভাবেই উপলব্ধি করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর অন্তরের নিঃসংশয় অনুমোদনের কথাও অকুণ্ঠিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘকাল পূর্বে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন-বিভাগের বাৎসরিক উৎসব (১৯৬১ ফেব্রুআরি ৬) উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে বলেন—

The multiplicity of languages need nor frighten us. The Constitution recognises the right of the people speaking the same language to organise themselves as groups and units and preserve their culture and language··· Tagore was fully aware of the difficulty inherent in the situation when he said,—"We must bravely accept the inconvenient fact of the diversity of our languages and at the same time know that a foreign language like foreign soil may be good for pot culture but not for cultivation which is widely and permanently necessary for the maintenance of life."

Tagore aimed at a *real unity in the country through harmonisation of various linguistic and cultural groups* and not at dead uniformity which only leads to lifelessness. The Indian civilisation will get richer and its intellectual unity will be based on firmer grounds if the different linguistic groups are allowed to have free expression and to make their unique contribution to the common culture. The ties of friendship thus established will be stronger than any unity imposed from outside by artificial methods.

নাম করে না বললেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সমগ্র দেশের উপরে হিন্দি বা ইংরেজি চাপিয়ে দিয়ে ঐক্যবিধানের যে প্রয়াস তা তাঁর মতে কৃত্রিম ও অকাম্য। অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী।

ভারতীয় ঐক্যবিধান ও হিন্দিপ্রবর্তন-প্রসঙ্গে মনস্বী শিক্ষা-নায়ক দেশ-

হিতব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ না করা অনুচিত হবে। এ বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ অভিমত এই।—

"সকলকে এক অদ্বিতীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যে একতা-বন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া করিতে হইবে। তাহাতে ঠিক ভাষাগত একত্ব সংঘটিত হইবে না বটে, কিন্তু ভাবগত একত্ব সাধিত হইবে। ক্রমে সমগ্র ভারতে একই ভাবের বন্যা বহিবে।...Unification of language না হউক, unification of thought and culture নিশ্চয়ই জন্মিবে।

"কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক।...তাঁহাদের মতে অন্ততঃ হিন্দি ভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

"আমি কিন্তু এ মতের সমর্থক করিতে পারি না। যে কারণে ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্য কোন একটা নির্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সর্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজি ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে, সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে।...

"সুতরাং আমার মতে, যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত তথায় তাহা সেইরূপেই থাকুক, সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্ধিত হউক, শ্রীসম্পন্ন হউক।...তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া অন্য প্রদেশবাসীদিগকেও সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হউক।...এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পরে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা এবং ক্রমে মনের একতা জন্মিবে। নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও এক ভাবে ভাবিত হইয়া ভারত একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে।"—'জাতীয় সাহিত্য', ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

ভারতীয় সংস্কৃতিগত এই ঐক্যসাধনার কথা আশুতোষ ব্যক্ত করেন ১৯১৯ সালে হাওড়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির ভাষণ দান উপলক্ষে। ওই ভাষণেই তিনি বলেন—"ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদি করিতেই হয়,

তবে তাঁহা যতদূর সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই করিতে হইবে।" বস্তুতঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আশ্রয় করে তিনি তাঁর এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার সাধনাতেও ব্রতী হয়েছিলেন। অকালতিরোধানের ফলে তাঁর সে ব্রত আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ, এই দুই মনস্বী চিন্তানায়কের ভারতধ্যান ও ভাষাসমস্যার সমাধান সম্পূর্ণরূপেই এক। 'জাতীয় সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব' উপলব্ধি করে এবং উক্ত 'ভারতের চিত্তমুক্তি' সাধনব্রতে তাঁর কর্মকীর্তির কথা স্মরণ করে আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। দীর্ঘকাল পর স্বাধীন ভারতের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমালীর ভাষণেও আশুতোষ-রবীন্দ্র-স্বীকৃত ভারতীয় ঐক্যসাধনার আদর্শগত উক্ত বাণীই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু হিন্দি-আধিপত্যের দ্বারা ভারতবর্ষকে একাকারত্ব দানের ভ্রান্ত পথ অদূর ভবিষ্যতে পরিত্যক্ত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সংস্কৃতি-সমবায়ের দ্বারা ভারতীয় চিত্তের ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সত্য-আদর্শ অনুসৃত হবে আর বিশ্বভারতী জাতীয় চিত্তসমবায়ের সাধনায় রবীন্দ্রপ্রদর্শিত পথে অগ্রণীত্ব লাভের সুযোগ পাবে; এমন আশা অথনও করা যায় না।

কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীতে, প্রধানতঃ বাংলাভাষারই সাধনা করতে হবে দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করে তোলবার জন্য, এই ছিল তাঁর অন্তরের অভিপ্রায়। হিন্দি বা হিন্দুস্থানী যখন ভারতবর্ষের সরকারী ভাষা বলে কার্যতঃ স্বীকৃত হবে বিশ্বভারতীর দেউড়িতে, অন্দরে নয়; ঘরের মধ্যে জ্বলবে বাংলাভাষার প্রদীপ, সরকারী দীপের তেল জোগাবার খাতিরে ঘরের দীপে তেলের কমতি ঘটানো চলবে না। অর্থাৎ এখানকার শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থা চলবে বাংলাভাষারই যোগে, সরকারি ভাষা হিসাবে হিন্দি শেখবায় ব্যবস্থাও রাখতে হবে। কিন্তু হিন্দির চাপে বাংলার সংকোচন ঘটানো চলবে না।

৪

আবার মূলপ্রসঙ্গে অর্থাৎ শিক্ষার বাহন-প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমরা দেখেছি ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন বলে স্বীকার করবার জন্যে দেশের কাছে বার বার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি যে একক ছিলেন তা নয়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমোহন বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠও বারবার ধ্বনিত হয়েছে অব্যর্থ ও কঠিন ভাষায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হৌসের মহতী সভা ইংরেজির যূপকাষ্ঠে 'অসংখ্য বালকবলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে' চরম সদ্‌গতির অধিকারী হয়েছে, এমন কঠোর উক্তি করতেও বঙ্কিমচন্দ্র কুণ্ঠিত হন নি।* এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি, এখানে পুনরুক্তি করব না।

মধুসূদনকে বঙ্কিমচন্দ্র অভিহিত করেছিলেন 'ডাহা ইংরেজ' বলে। এই 'ডাহা ইংরেজ'কেও একদিন (১৮৬৫ জানুআরি ২৬) আক্ষেপ করে বলতে হয়েছিল—

After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue··· If there be any one among us anxious to leave a name behind him, let him devote himself to his mother tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilised quarters of the globe, but *when we speak to the world, let us speak in our own language*···I should scorn the pretensions of that man to be called educated who is not the master of his own language···

Our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up, Such of us as owing to *early defective education*, know little of it and learnt to despise it, are miserably wrong.—'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ২৩, পৃ. ৭৫-৭৬

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় মধুসূদনও আমাদের শিক্ষার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। এখানে শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত না হলেও মাতৃভাষার চর্চাই যে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং মাতৃভাষার যোগেই বিদ্যার প্রকাশ যে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রধান কর্তব্য,

*দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬-১৭

এ বিষয়ে মধুসূদনের মনে লেশমাত্র সন্দেহও ছিল না। তাঁর ১৮৬৫ সালের উক্তিকে যে ১৯৮১ সালেও পুনরাবৃত্তি করতে হল সেটাই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করবার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে যাঁরা স্পষ্ট ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে, যতদূর জানি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামই সর্বাগ্রগণ্য। রবীন্দ্রনাথের কয়েক বৎসর পূর্বেই, ১৮৮০ সালে, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'কালেজী শিক্ষা' নামে এক প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, আজও তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। তাঁর উক্তি এই।—

"যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইতে অনেকটা সহজ হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন, অতি দূরবর্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট-দশ বৎসর লাগে। ভাষাশিক্ষাটি অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পর পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় ব্যয় ও এত পরিশ্রম, তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি। বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরাজীতে অঙ্ক কষিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরাজী শিখ না কেন? ইংরাজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে, আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরাজী-মুখে শিখিতে হয়।

"যেরূপ চলিতেছে, ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরাজী শিক্ষা অল্প হয়, আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না, শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্রম করিয়া অল্প জ্ঞান হয়।"—বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ সাল

এর টীকা বা ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন। এত অল্প পরিসরে ও এমন সরল ভাষায় আমাদের শিক্ষাসমস্যাকে এমন সম্পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহ্য রূপে আর কেউ প্রকাশ করেছেন কিনা জানি না। এই উক্তি প্রকাশের পরও একশো বৎসর হয়ে গেল, কিন্তু আজও আমাদের চৈতন্য হল না, এটাই বিস্ময়ের বিষয়।

ইংরেজি ভাষার আলেয়ার পেছনে এক সময়ে মধুসূদন ছুটেছিলেন প্রাণমন নিয়ে। কিন্তু তাঁকেও একদিন নিবৃত্ত হয়ে বলতে হয়েছিল—

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা করি'
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

অবরণ্যে বরণ করার অনুতাপে অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে বলতে হয়েছিল—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।" আমরা আজও পরদেশে পরধনলোভে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করেই চলেছি। কিন্তু আশার ছলনে ভুলি কি ফল লাভ করলাম, সেকথা ভাববার অবকাশ কি আমাদের কখনও হবে না?

কিন্তু স্বাধীন ভারতের পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালীও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর দ্বিধাহীন চিত্তের বলিষ্ঠ অভিমত এই।—

It is great irony of fate that after independence when we have full freedom to develop our languages,…we are clamouring for the retention of English not only as an alternative official language but also as a medium of instruction in our universities. Gandhi, Tagore and Radhakrishnan, and all our great thinkers who have thought seriously about the problems of Indian education have explained in unequivocal terms that *a foreign language cannot be the true medium of education*…

He (Tagore) had the courage of his conviction and took steps to make the mother tongue the medium of instruction *in his institution.* It was his firm belief that unless *the mother tongue or the regional language* became the *medium of education and culture* the creative urges and thoughts of our people could not find full and free expression.

—শ্রীনিকেতন-ভাষণ (৬ ফেব্রুআরি ১৯৬১) (বক্তলিপি লেখকের)

এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের, বিশেষতঃ শেষ বাক্যটির, সার্থকতা সংশয়াতীত এবং বহুমুখী। যাঁরা ইংরেজিকে সরাসরি ভাষা অথবা শিক্ষার বাহনরূপে রাখার কিংবা নিজ সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী, এই অভিমত

তাঁদের সকলেরই বিশেষভাবে চিন্তনীয়। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বভারতীর শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে এই উদ্ধৃতিটিতে। তৃতীয়তঃ, বিশ্বভারতীর যেসব ছাত্রের মাতৃভাষা বাংলা নয় তাঁদেরও শিক্ষার বাহন যে বাংলাই হওয়া উচিত তারও নির্দেশ রয়েছে *the mother tongue or the regional language* এই উক্তিটির মধ্যে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যখন এখানে বহু অবাঙালি ও অভারতীয়ের সমাবেশ ঘটেছিল তখনও তিনি তাঁর সরকারি নির্দেশ ও ভাষণ প্রভৃতি দিতেন বাংলাতেই, সরকারি প্রস্তাব ও প্রতিবেদনাদির বাহনও ছিল মুখ্যতঃ বাংলা। চতুর্থতঃ, শুধু শিক্ষা নয়, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বাহনও হওয়া চাই মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

শিক্ষামন্ত্রীর উক্ত অভিমতের তাৎপর্যবিশ্লেষণে আর অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে ইস্কুলের শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমতের আর-একটু পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। উচ্চশিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা; কিন্তু ইংরেজির সহায়তা ছাড়া, (অন্ততঃ বর্তমান কালে) যে উচ্চশিক্ষাই হতে পারে না সে বিষয়ে দুই মত নাই। সুতরাং উচ্চশিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজিশিক্ষার ভিত্তিপাত করতে হবে ইস্কুলেই। এইজন্যই উচ্চশিক্ষালিপ্সুদের ঝোঁক ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করার দিকে এবং তাদের ভিড় বিলিতি ধাঁচের ইস্কুলের প্রাঙ্গণে। কিন্তু তাতে তাদের শিক্ষা হয় বিকৃত এবং চিত্তের বিকাশ থাকে অসম্পূর্ণ। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা অথচ অযথা সময় ও শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে ভালো করে ইংরেজি শেখা চাই, নতুবা উচ্চশিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিঃসংশয় অভিমত। আর, মাতৃভাষায় যথোচিত অধিকার লাভই সহজে ও অল্প সময়ে ইংরেজি শেখার প্রকৃষ্টতম উপায়, সে বিষয়েও তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবু এ স্থলে আরও দু-একটি উক্তির উল্লেখ অনুচিত হবে না। কাশী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে (১৯২৩) তিনি বলেন—

"মাতৃভাষায় আমাদের আপন ব্যবহারের অতীত আর-একটি বড়ো সার্থকতা আছে। আমার ভাষা যখন আমার নিজের মনোভাবের প্রকৃষ্ট বাহন হয় তখনই অন্য ভাষার মর্মগত ভাবের সঙ্গে আমার সহজ ও সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে।...আমার বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীর ছাত্র এসেছে, তার মধ্যে

ইংরেজি-শেখা বাঙালি ছেলেও কখনও কখনও আমরা পেয়েছি—আমি দেখেছি তাদেরই ইংরেজি শেখানো সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। যে বাঙালির ছেলে বাংলা জানে না তাকে ইংরেজি শেখাই কি অবলম্বন করে।··· নিজের ভাষা থেকে দাম দিয়ে দিয়ে তার প্রতিদানে অন্যভাষাকে আয়ত্ত করাই সহজ।"
—'সাহিত্যের' পথে' (১৩২৯) সভাপতির অভিভাষণ

এই মত প্রকাশের পরের বছর (১৯২৪) তিনি তাঁর দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের (১৯১২-৩২) শিক্ষা সম্বন্ধে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে যা লেখেন, বর্তমান প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। মনে রাখা উচিত তখন নীতীন্দ্রনাথের বয়স বারো বছর। তাঁর উক্তি এই—

"নীতু ভালো আছে তো? ওর পড়াশুনো কেমন চলচে? দীর্ঘকাল বাংলা শেখা বন্ধ হয়ে থাকলে ওর পক্ষে ভালো হবে না। এই কাঁচা বয়সেই ভাষাটা জীবনের সঙ্গে গভীর করে মেলে, আর ভাষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের যথার্থ প্রাণ প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়। আমি প্রায় ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি না শিখে বাংলা শিখেছিলুম। তাতেই আমার মনের ভূমিকা পাকা করে তৈরী হয়েছিল, সেই ভূমিকার উপর অতি সহজেই প্রায় বিনা চেষ্টায় ইংরেজির পত্তন হতে পারল।"—দেশ, ১৩৬২ পৌষ ৮, পৃ ৫৬২

মাতৃভাষায় শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত না করে ইংরেজি শেখানো রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না। আর মাতৃভাষার যোগে মনের ভূমিকা পাকা করে তৈরি হলে সে ভূমিকার উপরে ইংরেজির পত্তন করা সহজ হয়, নতুবা ইংরেজি শেখানোও দুঃসাধ্য হয়—এই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত।* এই কথা আজ আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণ করবার দিন এসেছে।

৫

শিক্ষার ফল সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তারও বাহন হওয়া চাই মাতৃভাষা, অন্ততঃ পক্ষে আঞ্চলিক ভাষা, রবীন্দ্রচিন্তার এই দিকটাও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমালীর ভাষণে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। অধিকতর বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে শিক্ষানায়ক আশুতোষের দু-একটি উক্তি উদ্ধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।—

* দীর্ঘকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে (১৮৯২)। 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে (১৮৯৫) এই মতের স্পষ্টতর প্রকাশ দেখা যায়। দ্রষ্টব্য 'সাহিত্য'।

"কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা-কিছু উত্তম, যাহা-কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতে লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া দেশের ধন বিদেশে বিলাইয়া দিব না,··· এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ সংস্কারে চিত্ত বলীয়ান্ করিয়া তপস্বীর ন্যায় একাগ্র হৃদয়ে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে হইবে।" – 'জাতীয় সাহিত্য', বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৩১৬)

"পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের যাহা-কিছু উত্তম, যাহা উদার এবং নির্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।···

ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রহণযোগ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি তবেই ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীতভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এদেশবাসীরা ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তম ফলে বঞ্চিত থাকিবে না।··· প্রাচীন জাপান এই উপায়বলেই অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে।"— 'জাতীয় সাহিত্য', জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি (১৯১৬)

যে সময়ে আশুতোষ এসব উক্তি করেন, প্রায় সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ, এই দুই শিক্ষাব্রতী চিন্তানায়কের কণ্ঠ থেকে প্রায় একই সময়ে অবিকল এক বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। আর মন্তব্য অনাবশ্যক। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাঁদের এই উদাত্ত আহ্বানবাণী ধ্বনিত হবার পরে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলেও আমরা তাঁদের প্রদর্শিত পথে অতি অল্পই অগ্রসর হতে পেরেছি। কিন্তু আজ আমরা স্বাধীন, আমাদের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত, এবং সে পথে আর কোনো বাধাই নাই একমাত্র আমাদের অন্তরের সুচিরপোষিত সংস্কার ছাড়া।

শিক্ষার লক্ষ্য

মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্বে দেশের অবস্থা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তেই বলতে হয়েছিল— "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পেছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে?" এই উক্তির ছয় বৎসর পরেই ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা ইংরেজকে ভারতসাম্রাজ্য ছেড়ে যেতে হয়েছে। তার ফলে স্বাধীন ভারত উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে ওই লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। এই আবর্জনার স্বরূপ কি, তাও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ফুটে উঠেছে সবচেয়ে স্পষ্টরূপে।— "সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ।" অন্ন বস্ত্র শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব এবং তারও উপরে, নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, স্বাধীনতার বিনিময়ে এই আমরা পেয়েছি ইংরেজের থেকে। স্বাধীন ভারতের সামনে রয়েছে এই পঞ্চবিধ সমস্যার গুরুতর প্রশ্ন। এই সমস্যার সমাধান করতে না পারলে আমাদের স্বাধীনতাই নিরর্থক হয়ে যাবে।

এই সমস্যার কঠিন রূপ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে দীর্ঘকাল ধরেই পীড়িত করছিল। তাঁরই উক্তি উদ্ধৃত করি।—

"নিভৃত সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল, তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক, তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটে নি।"— 'কালান্তর', সভ্যতার সঙ্কট।

নিভৃত সাহিত্যের পরিবেশ থেকেই তিনি একদা শুনতে পেলেন—

কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারামাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া; বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।

তিনি দেখতে পেলেন—

বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।

ব্যথিত কবিপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল এর প্রতিবিধান করতে।—

কবি, তবে উঠে এসো, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।

প্রাণের বিনিময়ে তিনি যে প্রতিবিধান করতে বদ্ধপরিকর হলেন তার স্বরূপ কি? অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, স্বাস্থ্যহীনকে স্বাস্থ্য বিতরণে তিনি ব্রতী হন নি। তিনি সংকল্প করলেন—

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

সমস্ত দেশের হয়ে তিনি ভগবানের কাছে যে প্রার্থনা করেছেন, তাতেও ওই একই কথা ধ্বনিত হয়েছে।—

দৈন্য জীর্ণ বক্ষ তার মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস-রুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ ভার হান' অশনিপাতে।
ছায়াভয়-চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।

অতি পরিচিত কবিতা ও গানের এই নিত্য-আবৃত্ত অংশগুলি উদ্ধারের উদ্দেশ্য এই যে, নিত্য-আবৃত্ত বলেই অতি-অভ্যাসের ফলে এগুলির যথার্থ তাৎপর্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ করলেই

বোঝা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের সমস্ত দুঃখ লাঞ্ছনার মূলে রয়েছে দেশজোড়া অজ্ঞানতার অবসাদ এবং তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় জ্ঞানের জাগরণ। 'যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে'—এই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-অবিশ্বাস ও পুঞ্জিত অবসাদ দুর হয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হবে আশা এবং কণ্ঠে ধ্বনিত হবে ভাষা। এক আশা ও এক ভাষার শক্তি নিয়ে 'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়ালেই' সমস্ত ভয়ের অবসান ঘটবে। কেননা সে ভয় বাস্তব নয়, সে 'ছায়াভয়' মাত্র। 'যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।' এক কথায় তাঁর মতে আমাদের সমস্ত সমস্যা ও দুঃখদুর্গতির মূলে রয়েছে দেশব্যাপী অজ্ঞতা এবং তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় জ্ঞানের বিস্তার।

ছন্দোবদ্ধ কবিতায় দেশের মূল সমস্যা ও তার সমাধানের আভাস পেলাম। নানা সময়ে তাঁর অজস্র গদ্য রচনাতেও ঠিক ওই কথাই প্রকাশ পেয়েছে নানা আকারে। তার দু-একটি উক্তি উদ্ধার করছি।—

আমাদের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা—যে বুদ্ধির রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে, সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা। বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা।···সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে বসে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার ভয়ংকর ফাঁকটাকে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ করেছে।···বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকেমানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। জীবনযাত্রায় পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের অভ্যাস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাঁদে ঢেঁকিলীলার অবসান হবে না। সুতরাং পরপদপীড়নের তালে তালে মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্তন হবে—এইমাত্র প্রভেদ।"—'কালান্তর', সমস্যা

অর্থাৎ, 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি' গীতার এই অমোঘ বাণীকেই রবীন্দ্রনাথ বারংবার আমাদের শুনিয়ে গেছেন। এই যে দেশজোড়া অবুদ্ধিজাত অকল্যাণ, তার প্রতিবিধান কি? এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করা যাক।—

আমি যেটাকে সমস্যা বলে নির্ণয় করেছি, সে আপন সমাধানের ইঙ্গিত

আপনিই প্রকাশ করেছে। অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন—শুধু বিচ্ছিন্ন—নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ; অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারি নে বলেই জীবন-যাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত। অবুদ্ধির প্রভাবে সুবুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা, তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

বোঝা যাচ্ছে—যে-শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে, আমাদের মনকে অবুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে, সেই শিক্ষার দ্বারাই আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্গতির অবসান ঘটতে পারে—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মত। আমরা রবীন্দ্রনাথকে সাধারণতঃ কবি অর্থাৎ সৌন্দর্য ও আনন্দের উপাসক ব'লেই জানি। এই জানা অসম্পূর্ণ জানা। তাঁকে সমগ্রভাবে জানতে গেলে দেখা যাবে, তিনি একদিকে যেমন সৌন্দর্যের পূজারী, অপর দিকে তেমনি বুদ্ধি-মহিমার পতাকাধারী। আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে কি বলেছেন, তাই স্মরণ করি।—

"আমার মনে যে সবীজ সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত করে। তাই বিজ্ঞানকে আমরা কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।...তাই ধী ও আনন্দ, এই দুই শক্তিকে সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করতে চিরদিন চেষ্টা করেছি।"—'আত্মপরিচয়', ষষ্ঠ প্রবন্ধ (১৩৪৭ বৈশাখ ১)

এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রূপ। তিনি যেমন আমাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দ সঞ্চারের সাধনা করে গেছেন, তেমনি আমাদের অবুদ্ধি-আচ্ছন্ন জাতীয় জীবনে বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠার সাধনাও করেছেন সমভাবেই। তাঁর জীবনসমগ্রতার আদর্শে ধীশক্তি আনন্দশক্তির তুলনায় গৌণ ছিল না। সক্রিয় বুদ্ধি চালনার প্রত্যক্ষ ফল দুটি, বিচারশক্তির উন্মেষ এবং বিচারলব্ধ জ্ঞান। আমাদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে শাস্ত্রের বিধান ও ধর্মের অনুশাসন। ধর্ম ও শাস্ত্রের শাসন, এক কথায় আপ্তবাক্য জাতিগতভাবেই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পিষ্ট ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে। এই সজীব জড়ত্বের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ছিল সবচেয়ে প্রবল। তাঁর প্রতিবাদ এই—

"যদি বল, এ-সব কথা স্বাধীন বিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে—বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে, তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে—ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন।...

"বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সংকীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে বহু যুগ ধরে বহু কোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে, সেই দেশজোড়া মানুষপেষা জাঁতাকল কি কল হিসাবে কারোর চেয়ে খাটো? বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা করে এত বড়ো সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে আর কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে বলে আমি তো জানি নে।...

"বুদ্ধির জায়গায় বিধি এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবান্‌কে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং ভগবানের অবমাননা করে বলেই দুঃখ পায়, সে কথা মনের জড়ত্ববশতই বোঝে।'—'কালান্তর', সমস্যা

যুক্তিবিরুদ্ধ নির্বিচার আচার-পরায়ণতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই যে প্রতিবাদ, তার মূলে নিহিত ছিল তাঁর আবাল্য শিক্ষার মধ্যে এবং উনবিংশ শতকের কালধর্মের মধ্যেই। এই কালধর্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন—

"সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন।... এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্‌। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।... আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে, কী লোক-ব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম।"—'কালান্তর', সভ্যতার সঙ্কট

এই যে প্রচলিত সংস্কার, নিরর্থক প্রথা ও নির্বিচার আচার-পরায়ণতার

দাসত্ব, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আচারের স্থলে বিচার, প্রথার স্থলে স্বাধীন চিন্তা ও সংস্কারের স্থলে বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনের শিক্ষার মূল কথা। দেশের যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি সাধনা করে গিয়েছেন তারও মূল লক্ষ্য ছিল আমাদের জাতীয় চিত্তে মনু-স্বীকৃত আচার-পরায়ণতার স্থলে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। তাঁর গদ্য পদ্য অজস্র রচনাতেই আচারনিষ্ঠার পরিবর্তে বিচারনিষ্ঠাকে জাগ্রত ও উদ্যত করে তোলবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে।—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি···
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

এই ছিল ভগবানের কাছে তাঁর অন্তরের প্রার্থনা।

ঋগ্‌বেদের যুগে ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ ঘটেছিল, তার তৎকালীন আশ্রয়স্থল ছিল বহুখ্যাত সরস্বতী নদীর তীরভূমি। সে যুগে এই নদীর জলরাশি ছিল বিপুল ও গভীর, উক্ত নদীর নামেই তার সে পরিচয় সুস্পষ্ট।

এই সরস্বতী তখনকার দিনে হিমালয় থেকে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে (অর্থাৎ আরব সাগরে) তার অগাধ জলরাশি ঢেলে দিত। পরবর্তী কালে রাজপুতনার মরুবালুরাশি অগ্রসর হয়ে সরস্বতীর স্রোতঃপথকে গ্রাস করে ফেলেছিল। যে স্থানে সরস্বতীর জলরাশি মরুভূমিতে বিলীন হয়ে গেল, মনুসংহিতার কালে তা 'বিনশন' নামে পরিচিত হত। তবু মনুর যুগে সরস্বতীর জল সমুদ্রের দিকে অর্ধপথ অগ্রসর হয়ে তারপরে মরুবালুতে বিনাশ-প্রাপ্ত হত। আরও পরবর্তী কালে সে জলধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে বর্তমান সময়ে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে সরস্বতী ছিল ভারতীয় বিদ্যার প্রতীক, যার জন্য তার অপর নাম হয়েছে 'ভারতী', মরুভূমির উষরতার মধ্যে তার এই যে বিনাশপ্রাপ্তি, এ যেন একটি ভৌগোলিক ঘটনা মাত্র নয়, এ যেন বস্তুতঃই ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে মনুকথিত আচারের মরুভূমিতে ভারতীয় স্বাধীন চিন্তাস্রোতের বিনাশপ্রাপ্তির প্রতীক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক যুগে যে স্বাধীন চিন্তা সত্যোপলব্ধির মহাসমুদ্রের দিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়েছিল, পরবর্তী কালে শাস্ত্রীয় বিধিবিধান ও

আচারনিষ্ঠার অসার্থকতার মধ্যে তার গভীর স্রোত একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেল। ভারতবর্ষের জ্ঞান-সরস্বতীকে আজ যেন এক দেশব্যাপী 'বিনশন' গ্রাস সম্পূর্ণরূপেই গ্রাস করে ফেলেছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন—

যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।

ভারতীয় চিত্তস্রোতের যে ধারা বুদ্ধিহীন বিচারহীন যুক্তিবিরুদ্ধ সংস্কার প্রথা ও আচারের মরুপথে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে, তিনি বিশ্বাস করেন তা একান্তভাবেই নিঃশেষ হয়ে যায় নি, তার পুনরুদ্ধারের আশা একান্তই অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের চিত্তসরস্বতীকে শাস্ত্রবিধান, ধর্মানুশাসন তথা লোকাচারের মরুময় বিনশন-গ্রাস থেকে উদ্ধার করে তাকে আপন পথে প্রবল বেগে প্রবাহিত করা এখনও সম্ভব বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। আমাদের চিত্তভারতীর এই পুনরুদ্ধারকেই তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার লক্ষ্য করে গিয়েছেন। সে সাধনারই কেন্দ্র হচ্ছে বিশ্বভারতী।

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনো মতে;
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ-'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায়-চরণ না সরে॥

—'চৈতালি', দুই উপমা

তাই তো তিনি তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতার অচলায়তনকে ভেঙে ফেলার এবং আচারপ্রথা-সংস্কারের কলে-চলা দাসের দেশে স্বাধীন জীবনের গতিসঞ্চারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতা মানে শাস্ত্র, আর শাস্ত্র হচ্ছে ধর্মের বাহন— যে ধর্ম মানুষকে বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা দান করে সে ধর্ম নয়, যে ধর্ম দেশাচার ও লোকাচারের অসংখ্য বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ ক'রে মানুষকে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় জড়ত্ব দান করে সেই ধর্মের বাহন। তাই গতিশীল

নিত্য-সক্রিয় সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের সাধক রবীন্দ্রনাথ উক্ত শাস্ত্র ও ধর্মের সম্বন্ধে এমন কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন। যে ধর্ম-শাস্ত্র স্বাধীন বিচারবুদ্ধির বিরোধী, সে শাস্ত্রকে তিনি অস্বীকার করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। যে ধর্ম মানুষের মনকে সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখে, সে ধর্মকেও তিনি বারংবারই কঠিনভাবে আঘাত করেছেন। কেননা, তাঁর মতে এই আচারগত ধর্মের বাইরে আমাদের জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। "এই কারণে এরা ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই জন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের নিত্য সত্যের চেয়ে বাহ্য বিধান, কৃত্রিম প্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।" যে ধর্ম মানুষকে সত্য ও কল্যাণের ভূমিতে একত্র মিলায়, সে ধর্ম আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে না। যে শাস্ত্রীয় ধর্মের আমরা বশীভূত, সে সংকীর্ণ ধর্ম একদিকে আমাদের মধ্যে সংখ্যাতীত খণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে, অপর দিকে সত্য ও কল্যাণ থেকে আমাদের পৃথক করে রাখছে। অথচ এই সংকীর্ণ শাস্ত্রীয় ধর্মের মোহ অতি প্রবল, সে মোহের জাল ছিন্ন করা অতি দুঃসাধ্য। এই ধর্মের মোহকে রবীন্দ্রনাথ বার-বার অতি কঠিন ধিক্‌কার দিয়ে গেছেন। তাঁর কণ্ঠে অতি তীব্রভাবেই ধ্বনিত হয়েছে—

> ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
> অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
> নাস্তিক সে-ও পায় বিধাতার বর,
> ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
> শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
> শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।
>
> অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
> বর্বরতার বিকার-বিড়ম্বনা,
> ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা,
> আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।
> প্রলয়ের ওই শুনি শৃঙ্গধ্বনি,
> মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী।

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে,
ভাঙো ভাঙো আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

—ধর্মমোহ, 'পরিশেষ'

ভারতবর্ষের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, এই ধর্মই যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে মানুষে মানুষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদ ঘটিয়েছে—শুধু ভেদ নয়, বিরোধও ঘটিয়েছে। এই ধর্মই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে, আমাদের বিচারশক্তিকে নিস্তেজ করে দিয়ে সমগ্র দেশকে নিরন্তর অকল্যাণের পথে টেনে নিয়েছে। এই ধর্মের অভিশাপ থেকে আজও আমাদের মুক্তি ঘটেনি। এই ধর্মই আজ চিরন্তন ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে দুই বিরুদ্ধ রাষ্ট্রের পারস্পরিক হানাহানির গ্লানির মধ্যে অবতীর্ণ করেছে। এই ধর্মবেশী অবুদ্ধি আজ আমাদের রাষ্ট্রীয় মুক্তিকেও নিরর্থক করে দিয়েছে। আচারধর্মগত অবুদ্ধির ছিদ্রপথে অজস্র অকল্যাণ প্রবেশ করে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমিকেই জীর্ণ করে ফেলছে। আচারধর্মের প্রভাবে আমাদের মনের চলৎশক্তিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, স্বাধীন বিচারবুদ্ধির সামর্থ্য ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ফলে আচারের অজস্র বিভিন্নতা আমাদের সমাজদেহে অসংখ্য ফাটল সৃষ্টি করেছে, আর বিচারবুদ্ধি-নিরপেক্ষ শাস্ত্রগত ধর্ম যুগ যুগ ধরে তার ফাটলে ফাটলে শিকড় চালিয়ে দিয়ে সমাজবন্ধনকে শিথিল করে এনেছে। এই শিথিলগ্রন্থি সমাজদেহ নিয়ে আমাদের পক্ষে ঝড়ঝঞ্ঝার আঘাত সহ্য করা কঠিন হয়েছে। তাই রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা পেয়েও আমরা তাকে যথোচিত বা ইচ্ছামতো পরিমাণে কাজে লাগাতে পারছি নে। বরং যখনই কোনো বিপদের সম্মুখীন হই, তখনই ওই সামাজিক দুর্বলতাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো সমস্যা, সব চেয়ে বড়ো অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জাতীয় নেতারা বহুকাল ধরে বহুভাবে দেশের মধ্যে সজীবতা ও সক্রিয়তা সঞ্চার করে তাকে স্বাধীনতালাভের উপযোগী করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু আমাদের সব সমস্যার মূলে রয়েছে যে অবুদ্ধি, শাস্ত্র ও ধর্মগত বিধিনিষেধ এবং আচার-প্রথাকে নির্বিচারে মেনে নেবার যে মজ্জাগত

প্রবণতা— যে প্রবণতা পরবশ্যতা স্বীকারেরই নামান্তর— সেই মূলগত দুর্বলতা অপসারণে কেউ প্রয়াসী হন নি। এক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সারাজীবন ধরে আমাদের সমস্ত দুঃখদুর্গতির মূল কারণের প্রতি দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন এবং সে সাধনাতেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূলে রয়েছে আমাদের মজ্জাগত ভেদ বুদ্ধি ও সামাজিক অনৈক্য, আর তারও হেতু হচ্ছে শাস্ত্রগত আচারধর্ম পালনের আবহমানকালীন অন্ধ অভ্যাস। তিনি বুঝেছিলেন এর একমাত্র প্রতিকার নির্মোহ নির্মল বুদ্ধির জাগরণ এবং সে জাগরণ যথার্থ শিক্ষাসাপেক্ষ। তাই দেশের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার প্রসারকেই তিনি জীবনের সাধনা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সে সাধনারই কেন্দ্র শান্তিনিকেতন।

১৮৮৩ সালে, কংগ্রেসের জন্মেরও পূর্বে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও তার ব্যর্থতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিস্তারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর তৎকালীন মন্তব্য আজও স্মরণীয়। আজও তার উপযোগিতা অব্যাহত আছে।—

"যদি আমরা সমস্ত জাতি এই স্বায়ত্তশাসনপ্রণালীর জন্য আগে হইতে প্রস্তুত হইতে পারিতাম, তবে এ অধিকার আমরা অসংকোচে গ্রহণ করিতাম ও গভর্নমেণ্টকে অবিচারে দিতে হইত। এইরূপে প্রস্তুত হইবার উপায় কি? তাহার এক উত্তর আছে, বিদ্যাশিক্ষার প্রচার। আজ যে ভাবগুলি কেবল গুটি দুই-তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয়, তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায় নিদেন গুটিকতক করিয়া শিক্ষিত লোকে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজী লিখিলে কিংবা ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলে এটি হয় না। ইংরাজীতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ কর, বাঙ্গালাসাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজীতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দুটি-চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কি কথা কহিতেছ? সমস্ত জাতিকে একবার দাবী করতে শিক্ষাও। কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে, **Political Agitation**-এর দ্বারা হইবে না।"—ভারতী ১২৯০ কার্তিক, পৃঃ ২৯৬।

১৮৮৩ সালে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সেই অভিমতই পোষণ করেছিলেন। আমাদের শিক্ষার অযথার্থতা, অগভীরতা ও অব্যাপ্তি অপনয়নের সাধনাই তিনি করে গিয়েছেন সারাজীবন।

শিক্ষার দুই দিক্। এক দিক্ বিনাশ ও সংস্কারের, আর-এক দিক্ সৃষ্টির। এক দিকে অবুদ্ধিজাত সংস্কার ও অন্ধ আচারের 'অচলায়তন' বা 'ধর্মকারা'র অপসারণ, অপর দিকে সৃষ্টিপরায়ণ, বুদ্ধিজাত জ্ঞানদীপ্তির প্রসারণ। তাই তো রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের তীব্র বেদনায় প্রার্থনা করেছেন—

হে ধর্মরাজ,
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

এ প্রার্থনায় সর্বান্তঃকরণে যোগ দেবার সময় বয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষাসমস্যা

১

স্বাধীন ভারতের সামনে অনেক সমস্যা। অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, জীবনধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য এই চারটি বস্তুর অভাব আজ সমস্ত জাতিকেই জীর্ণ করে ফেলছে। তার উপরেও উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের আত্মবিচ্ছেদ; সে বিচ্ছেদ যেমন সম্প্রদায়ে, সম্প্রদায়ে, তেমনি প্রদেশে প্রদেশে। সব সমস্যারই সমাধান চাই, নতুবা জাতিগতভাবে আমরা বাঁচব না। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, অন্নবস্ত্রের সমস্যা আপাতিক, তার প্রত্যক্ষ কারণ ও প্রতিকারের উপায় সুদূরপ্রসারী নয়; কিন্তু শিক্ষার সমস্যা গভীরতর এবং চিরন্তন। বস্তুতঃ শিক্ষাসমস্যার প্রতিকার না হলে অন্য কোনো সমস্যারই স্থায়ী বা যথার্থ প্রতিকার সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষাদৈন্য যথার্থভাবে ঘুচলে অন্য সব অভাবেরই অবসান ঘটবে। কেননা অন্ন-বস্ত্র ও স্বাস্থ্য সমস্যার মূলেও অশিক্ষারই প্রভাব, আর আত্মবিচ্ছেদ-সমস্যা তো অশিক্ষা এবং কুশিক্ষারই প্রত্যক্ষ পরিণতি।

বর্তমানে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাই গুরুতর রূপ ধরেছে এবং তার আশু প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসই প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সব দৈন্যের মূলে যে শিক্ষাদৈন্য, তার প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়াস তেমন প্রবল নয়। অথচ শিক্ষার মান অন্ততঃ বাংলাদেশে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছে। তথ্যতালিকা দিয়ে একথার সত্যতা প্রমাণ করবার প্রয়োজন দেখি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলের কথা স্মরণ করলেই এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না। অবশ্য আমাদের শিক্ষাসমস্যার প্রতিকারের কোনো চেষ্টাই হচ্ছে না এ কথা বলছি না। রাধাকৃষ্ণন কমিশন সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে সন্ধান নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশে দেখি মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলির সুষ্ঠুতর পরিচালনার জন্য এগুলিকে বিশ্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে স্বতন্ত্র শিক্ষা সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে। এই সংঘের কার্যাবলীর কথা মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং প্রণালীর পরিবর্তনসাধন সম্পর্কেও কিছু কিছু সক্রিয়তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ইদানীং রবীন্দ্রকল্পিত শিক্ষায়তন বিশ্বভারতীও কেন্দ্রীয় সরকার-স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে

পরিণত হল। তথাপি এ কথা মানতে হবে যে, এসব প্রয়াসের কোনোটাই এখনও সফলতা লাভ করে নি, আশু ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের এই চৌত্রিশ বৎসরের ইতিহাসকে বোধকরি কিছুতেই উৎসাহজনক বলে স্বীকার করা যায় না। রাশিয়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার কতখানি উন্নতি হয়েছিল, তার সাক্ষ্য আছে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পুস্তকে।

আজ আমাদের দেশে সর্বমান্য শিক্ষানায়কের একান্ত অভাব। রবীন্দ্রনাথ বা আশুতোষের ন্যায় শিক্ষানায়ক বিদ্যমান থাকলে আজ আমাদের এত দুর্ভাবনার কারণ থাকত না। তা হলেও আমাদের নিরাশ বা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলেও তো চলবে না। এই অবস্থায় সকলের সমবেত প্রয়াস অত্যাবশ্যক। শিক্ষাব্রতীরা এবং যাঁরা শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করে থাকেন, তাঁরা সকলেই যদি শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হন তা হলে এই সমস্যার মীমাংসা সহজতর ও সুষ্ঠুতর হতে পারে। বহু আলোচনা ও বিচারবিশ্লেষণের ফলে আমাদের চিন্তা সুস্পষ্ট রূপ নিতে পারবে এবং শিক্ষার বাঞ্ছিত আদর্শ ও প্রণালী ক্রমশঃ আমাদের অধিগত হবে। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষাসমস্যার দু-একটি দিক্ নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

একটু তলিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, আমাদের শিক্ষাসমস্যা মূলতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ আমাদের শিক্ষার অবাস্তবতা বা অপূর্ণতা, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা-বিস্তারের অভাব। যে শিক্ষানীতি এতদিন যাবৎ আমাদের দেশে অনুসৃত হয়ে আসছে, তার লক্ষ্যগত সংকীর্ণতায় ফলেই এই দ্বিবিধ ত্রুটির উদ্ভব হয়েছে। প্রত্যেক সভ্যদেশেই শিক্ষানীতির লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে শিক্ষার্থীকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার উপযোগী করে গড়ে তোলা। ফলে সেসব দেশে শিক্ষার অবাস্তবতা বা অব্যাপ্তি ঘটতেই পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে বিদেশী রাজ্যচালকদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য স্বভাবতঃই ছিল স্বতন্ত্র ও ভিন্নমুখী। তাদের শাসন বা শোষণযন্ত্রটিকে তাদেরই স্বার্থের অনুকূলে সচল রাখার উপযোগী রাজভৃত্য গড়ে তোলাই ছিল তাদের শিক্ষানীতির প্রথম লক্ষ্য, দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিকে স্বদেশের যথার্থ কল্যাণের প্রতি আচ্ছন্ন করে রাখা, আর তৃতীয় লক্ষ্য ছিল দেশব্যাপী অগণিত জনসাধারণকে নীরন্ধ্র অশিক্ষার মধ্যে অবারিতভাবে শাসিত ও শোষিত হবার উপযোগী রাখা। আজ বিদেশী শাসনের অবসান ঘটেছে। সুতরাং স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতির

লক্ষ্যগত সম্পূর্ণ পরিবর্তন চাই। নতুবা আমাদের শিক্ষার অবাস্তবতা ও অব্যাপ্তি দূর হবে না।

শিক্ষাগত অব্যাপ্তির প্রতিকার বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। শিক্ষার অবাস্তবতা সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই অবাস্তবতারও দুই রূপ। একরূপ তার বিষয়গত, আর-এক রূপ তার প্রণালীগত। বিষয়গত অবাস্তবতার কথাই প্রথমে উত্থাপন করা যাক।

বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করলে প্রথমেই চোখে পড়ে সাহিত্যের অতিপ্রাধান্য, তা-ও আবার ইংরেজি সাহিত্যের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষার পাঠ্য-বিষয়গুলির মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের অতিপ্রভুত্ব এখনও অত্যন্ত অনাবশ্যকভাবে উদ্ধত হয়ে রয়েছে। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি বহু বিষয়ের মধ্যে যে-কোনো দুটি বিষয় তুমি তোমার শিক্ষণীয় বিষয় বলে বেছে নিতে পারো, এ বিষয়ে তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য (কেবল ভাষা নয়) তোমাকে পড়তেই হবে; ওটা অবশ্যশিক্ষণীয়, কেননা ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞান না থাকলে অর্থাৎ শেক্সপীয়রের দু'খানি নাটক, শেলি-কীটস্‌-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখ কবিদের কতকগুলি কবিতা আর দু-একখানি ইংরেজি উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই না পড়লে তুমি শিক্ষিত (অর্থাৎ বি.এ.) বলে গণ্য হতে পার না। শিক্ষিত বলে গণ্য হবার পক্ষে ইংরেজি সাহিত্য-জ্ঞানের প্রয়োজনই যে সর্বাধিক, তার আর-এক প্রমাণ এই যে, শিক্ষিত-মর্যাদাপ্রার্থীদের অধিকাংশেরই অপঘাত ঘটে ওই ইংরেজি সাহিত্যের পরীক্ষাতেই। আজকাল আবার ইংরেজি সাহিত্যের প্রাংশুলভ্য মর্যাদার প্রতি ক্ষুদে বাংলা ভাষা প্রায় সকলের অলক্ষ্যেই লোভে উদ্‌বাহু হয়ে উঠেছে। এটা যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ বামনের এই উদ্‌বাহু প্রচেষ্টার উপহাস্যতাটুকু উপভোগ্য করবার মতো লোকের অভাব ঘটেছে আমাদের বিশ্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে। বি. এ. পরীক্ষার্থীদের অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়রূপে বাংলাকে মেনে নেবার মূলে ছিল বাঙালির পক্ষে বাংলা ভাষা-রচনায় অধিকার থাকার আবশ্যিকতা স্বীকার। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে উচ্চাঙ্গ চিন্তা প্রকাশের উপযোগী ভাষা রচনায় দক্ষতা শেখাবার এই যে মহৎ-অভীষ্ট, তা কখন উবে গেছে আর তার স্থান দখল করে নিয়েছে সুখকর সাহিত্যচর্চা। অলক্ষিসর সাহিত্যের মহিমাই এখন ভাষায় বৃহৎ পরিসরকেও অবজ্ঞেয় করে তুলেছে। সারা বৎসর ধরে

কলেজগুলিতে শুধু ওই সাহিত্য অংশেরই পঠন-পাঠন হয়। আর ভাষাচর্চার সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক ঘটে শুধু পরীক্ষাগৃহে। ভাষা যাদের অচর্চিত তাদের হাতে সাহিত্য বিচারের কি পরিণতি ঘটে, সে সংবাদ রাখেন শুধু পরীক্ষকরা। ওইটুকু পরিসরের মধ্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই সমাবেশ ঘটে। প্রমীলার শৌর্য, কপালকুণ্ডলার অভিনবত্ব, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, শরৎচন্দ্রের সমাজদৃষ্টি এই সমস্তের বিচার-বিশ্লেষণেই যেন বাংলাভাষা চর্চার একমাত্র সার্থকতা। কেননা, সাহিত্যজ্ঞান না হলে যে শিক্ষামর্যাদারই অধিকার হয় না। সাহিত্য-প্রধান ইংরেজি অবশ্যশিক্ষণীয়। আর ইংরেজির বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে বাংলাভাষাও কৌলীন্যের লোভে ওই পথেই পরীক্ষাতীর্থের দিকে যাত্রা করেছে। আরও দেখা গেল, স্কুলে-কলেজে ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষার একই আদর্শ, একই প্রণালী। যেন স্কুলের শিক্ষা ও কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায়ে কোনো পার্থক্য নেই। আর ভাষারচনায় অনভ্যাস ও অক্ষমতার ফলে বাংলা পরীক্ষায় অকৃত-কার্যদের যতই সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে, ততই বাংলাশিক্ষার মহিমা উচ্চতর কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে। আবার ওই একই কারণে সাম্প্রতিককালে কলেজ-পর্যায়ে বাংলাশিক্ষার আবশ্যিকতাই হয়েছে অস্বীকৃত। অবশেষে এভাবেই আশুতোষের জীবন-সাধনা তাঁর উত্তরাধিকারীর হাতে এই চরম পরিণতি লাভ করল।

স্কুল ও কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি সাহিত্যের অতি-প্রাধান্যের ফলাফল একটু বিচার করা যাক। একে তো বহু ছাত্রই স্বভাবতঃই ভাষা-শিক্ষায়, বিশেষতঃ বিদেশী ভাষাশিক্ষায় অপটু, তার উপরে দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই সহজাত সাহিত্যরসবোধের অধিকারী নয়। এই অবস্থার সহজাত প্রবৃত্তি-নির্বিশেষে সকলকেই যদি সাহিত্য শিক্ষায় (এবং তাও বিদেশী ভাষায়) বাধ্য করা হয়, তা হলে ফল যা হতে পারে, তাই হচ্ছে। শনি এবং কলি, এক-সঙ্গে উভয়েরই দৃষ্টি এসে পড়েছে আমাদের ছাত্রসমাজ তথা দেশের ভাগ্যের উপরে। একে ইংরেজি তায় সাহিত্য, এই দুয়ে মিলে যে কাণ্ডটা ঘটিয়ে তুলেছে, তাতে এসে আবার যোগ দিয়েছে অবশ্যশিক্ষণীয় বাংলা সাহিত্যের অংশটুকু। এইভাবে আমাদের সমস্ত ছাত্রসমাজকে অর্থাৎ সমস্ত জাতিটাকেই সাহিত্যের লোহার ছাঁচে ফেলে একাকৃতি করে গড়ে তোলবার চেষ্টা চলেছে প্রায় একশো বছর ধরে। তাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের আকৃতি আজ একেবারেই অপরিজ্ঞাত

রয়েছে। তার উপরেও দুঃখের কথা, এই অপুষ্টি বিষয়ে আমাদের চেতনা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধার করে বলি—

"চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ওই দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না।"

সাহিত্যপ্রধান শিক্ষায় আমাদের কল্পনাবৃত্তির অত্যধিক চর্চা হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিরবৃত্তিটা চর্চার অভাবে তুলনায় একান্তই অপরিণত হয়ে যায়। আবার রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধার করি—

"আমরা যতই বি-এ, এম-এ পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না।··· আমাদের মতামত, কথাবার্তা এবং আচার অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।"—শিক্ষার হেরফের

রসপ্রধান সাহিত্যের প্রাধান্য আমাদের জাতীয় চিত্তবৃত্তির দুর্বলতাকে কিভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্টতর উক্তিও আছে। রবীন্দ্রনাথ রসপ্রধান সাহিত্যের প্রতি বিমুখ ছিলেন, আশা করি একথা কেউ বলবেন না। সুতরাং সাহিত্যপ্রধান একাঙ্গীন শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। তিনি বলেন—

"গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ আবশ্যক। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।"—ভূমিকা, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ২

অশিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত মনের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, বি. এ., এম. এ. পাস-করা মনের সম্পর্কে তা অপ্রযোজ্য নয়। এর প্রতিকারের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার অচিরাৎ প্রবর্তনের কথা বলেছেন তাতে সাহিত্যচর্চাকে ঐকান্তিক প্রাধান্য না দিয়ে বিজ্ঞানচর্চারও যথাযোগ্য স্থান থাকা চাই। নতুবা আমাদের বুদ্ধি নির্মল ও সতর্ক হবার অবকাশ পাবে না। বিজ্ঞানচর্চা বলতে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র রসায়নাদি জড়বিজ্ঞানের কথাই বোঝাচ্ছেন না; ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজ-বিজ্ঞানও তাঁর অভিপ্রেত। প্রমথ চৌধুরী প্রণীত

"প্রাচীন হিন্দুস্থান' নামক যে বইখানির ভূমিকায় তিনি ওই অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেখানি হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

বিজ্ঞানচর্চাহীন ইংরেজী-সাহিত্যপ্রধান এই যে আমাদের শিক্ষা, "তার ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না।" শিক্ষার এই ত্রুটি আমাদের সাহিত্যকেও আক্রমণ করেছে। সর্বাঙ্গপুষ্ট জাতীয় মনেরই সৃষ্টি সাহিত্য। সে মন যদি দুর্বল হয়, তার চিন্তাশক্তি যদি ক্ষীণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি অপরিণত হয়, তবে সে দুর্বলতা সাহিত্যেও প্রতিফলিত হতে বাধ্য। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তি যদি বলিষ্ঠ না হয় তাহলে সাহিত্য-রসবোধও পূর্ণবিকশিত হতে পারে না। কারণ মানুষের রসবোধ ও কল্পনাবৃত্তি একান্তভাবে বুদ্ধি বা চিন্তা-নিরপেক্ষ নয়। আমাদের মননশক্তির দুর্বলতার ফলে আমাদের সাহিত্যেও যে জীবনীশক্তির অভাব ঘটছে, এ বিষয়ে বোধ করি রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণ দেওয়া যাক—

"আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই।··· আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যে সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না।
—শিক্ষার বাহন

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—"আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই, সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে।" অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাটাই ত্রুটিময়। যে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থাতেই গলদ, সে দেশের সাহিত্যও যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হতে পারে না এ কথা বলাই বাহুল্য। বাংলা সাহিত্যের একাঙ্গীনতা তার অপুষ্টি ও দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথকে কতখানি পীড়া দিত, তার প্রমাণ পাই তাঁর এই উক্তিগুলিতে—

"এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বর্তমান যুগের অন্নে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে একালের ছোঁওয়া, কিন্তু খাদ্য তো ওপার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদ্‌ঘাটন করছে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়।··· তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে, যেদিকে চলেছে মনের পরিবেশন,

যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল। গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন।··· আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্যে যখন কোন অসংযম, কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্‌ণ বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোঁড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের সেই অবস্থা।"—শিক্ষার বিকিরণ

বাংলা সাহিত্যে এই যে মননচর্চার একান্ত অভাব ও রসচর্চার অতিপ্রাধান্য, তাতে আমাদের সাহিত্যেরও স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। পরিণত বুদ্ধিবৃত্তির অভাবে সংযমের রাশ ঢিলে হয়ে গেছে এবং ফলে আমাদের দুর্বল কল্পনাশক্তি অতি সহজেই নানা রকম বিকৃতি ও রুগ্‌ণ বিলাসিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। বস্তুতঃ জাতীয় চিত্ত যদি জ্ঞানসমৃদ্ধ না হয়, তা হলে তার সাহিত্যও কখনও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা পেতে পারে না। বাংলা সাহিত্যের এই যে অপরিপুষ্টি ও রুগ্‌ণ বিলাসপ্রবণতা, তার জন্য দায়ী কে? তার প্রতিকারের উপায় কি? রবীন্দ্রনাথ বললেন—

"এজন্য অন্ততঃ বাঙালি সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে একে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী করলে একে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়।"

শেষ পর্যন্ত এর প্রতিকারের যে পন্থা তিনি নির্ণয় করেছেন, তা হচ্ছে শিক্ষাসংস্কার। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে বার-বার আবেদন জানিয়েছেন শিক্ষাকে দেশের উপযোগী ও সর্বাঙ্গীণ করে তোলবার জন্যে।

বর্তমানে স্বাধীন ভারতে শিক্ষাসংস্কারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সাহিত্যিক রসচর্চার অতিপ্রাধান্য হ্রাস করে মননসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে আনুপাতিক গুরুত্ব দান করা। জীবনসংগ্রামের উপযোগী শিক্ষাপ্রার্থী প্রত্যেক ছাত্রকে শেক্‌স্পীয়রের নাটক প্রভৃতি রসপ্রধান সাহিত্য আয়ত্ত করতে বাধ্য করা যে কত বড়ো অত্যাচার এবং তাতে জাতীয় শক্তির যে কতখানি অপচয় ঘটে, দীর্ঘকালীন অন্ধ অভ্যাসের ফলে তা অনুমান করবার শক্তি পর্যন্ত আমরা হারিয়েছি। এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে, যাদের সহজাত সাহিত্যপ্রবণতা নেই, তাদের জীবন যে কিভাবে নিষ্ফল হতে বাধ্য হয়

তার হিসাব রাখে কে? তার উপরে যারা বিদেশী তারা আয়ত্ত করতে স্বভাবতঃই অনিপুণ তারা বিনা দোষে জীবনব্যাপী ব্যর্থতার শাস্তি পেতে থাকে। তাতে যে সমস্ত জাতিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে কথাটা ভেবে দেখবার সময় কি এখনও এল না?

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ছাত্রদের এর অবশ্যশিক্ষণীয়তার দুশ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাতে যে শুধু ছাত্রদেরই কল্যাণ তা নয়, তাতে সাহিত্যচর্চার পথও প্রশস্ততর হবে। যেখানে নিপুণ, অনিপুণ ও মাঝারি সবরকম ছাত্রেরই একত্র সমাবেশ এবং যেখানে সকলের পক্ষেই সাহিত্যপরীক্ষায় পাসমার্কা পাওয়া অত্যাবশ্যক, সেখানে স্বভাবতঃই সাহিত্যচর্চার মানকে নামিয়ে আনতে হয়। তাতে আলোচিত সাহিত্যের প্রতিও যথোচিত সুবিচার করা হয় না এবং সাহিত্যনিপুণ ছাত্রদের মেধাও পূর্ণবিকাশের অবকাশ পায় না।

অতএব আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি বা বাংলা সাহিত্যকে অবশ্যস্বীকার্য বিষয় বলে গণ্য না করে ঐচ্ছিক বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত করা চাই। এটাই হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষাসংস্কারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অবশ্য বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ছাত্রদের অধিকার পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন আরও কিছুদিন দেশে প্রবল থাকবে, একথা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

২

আমাদের শিক্ষার বিষয়গত ত্রুটির মধ্যে একটি হচ্ছে সাহিত্যের বিশেষতঃ ইংরেজি সাহিত্যের অতিপ্রাধান্য। আর-একটি হচ্ছে মননসাপেক্ষ বিষয়গুলির অবাস্তবতা ও অসার্থকতা। গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি যেসব বিষয় সর্বজনীন, যেসব বিষয়ের দেশকালসাপেক্ষতা নেই, সেসব বিষয় সম্বন্ধে অভিযোগের খুব বেশি কারণ নেই। কিন্তু ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি যেসব সমাজবিদ্যা দেশ কাল ও জাতির সম্পর্কে বিশেষ রূপ ধারণ করে সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হবার সময় এসেছে। মনে রাখতে হবে জড়বিদ্যাই হোক আর সমাজবিদ্যাই হোক, বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই তার একমাত্র সার্থকতা নয়, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন-সমস্যার সমাধানে সেসব বিদ্যার প্রযোজ্যতাও কম কাম্য নয়। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় আমরা

যেসব বিদ্যা অর্জন করি, আমাদের জীবননিয়ন্ত্রণের কাজে সেগুলির কতখানি সহায়তা করে? আমাদের জীবন ও শিক্ষার মধ্যে যে কতখানি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বিরাজ করছে, সে বিষয়ে সচেতনতার লেশমাত্রও কোথাও দেখি না। অথচ এই ব্যবধান ঘোচাবার অত্যাবশ্যকতার প্রতি শিক্ষানায়কদের দৃষ্টি সবলে আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ ১৮৯২ সালেই। তাঁর তৎকালীন অভিমত আজও উদ্ধৃতিযোগ্য—

"আমরা যেভাবে জীবন-নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; যে-সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না।...আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই।...আমাদের জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে। এইজন্য দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্য দিকে চির-কুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন; এক দিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্য দিকে অধীনতার শতসহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি-মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন।...তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনও সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।...যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে।...এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতিমুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির জীবনযাত্রা দুই-ই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।...

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—শিক্ষার হেরফের

যে প্রবন্ধে এই অভিমত প্রকাশিত হয়, সেটি তৎকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসুর ন্যায় মনীষীদেরও আন্তরিক অনুমোদন লাভ করে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

"প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।" —রচনাবলী (বিশ্বভারতী) ১২শ খণ্ড, পৃ ১৬

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনস্বীদের প্রয়াস সত্ত্বেও তৎকালে আমাদের শিক্ষা ও জীবনের অসামঞ্জস্য ঘোচাবার কথায় কেউ কান দেন নি। কেননা সেনেট সভার সব সদস্যই ছিলেন বিশেষ সম্ভ্রান্ত, শিক্ষা-বিষয়ে ভ্রান্তি ছাড়া তাঁদের কাছে কিছুই আশা করা চলত না। সে ভ্রান্তি কি আজও ঘুচেছে? নতুবা ১৯৩৩ সালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আসন থেকে রবীন্দ্রনাথকে অতি বেদনার সঙ্গেই একথা বলতে হল কেন?—

"আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চার দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোটবই-এর শাসন, আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে নেই সাহস, আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না।"—শিক্ষার বিকিরণ

যে শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রতিবাদ করেন ১৮৯২ সালে, যা নিয়ে ১৯৩৩ সালেও তাঁকে দুঃখ করতে হয়েছে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির এত বৎসর পরে আজও তার প্রতিকারের যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমাদের শিক্ষা ও জীবন, বিদ্যা ও দেশের মধ্যে এই যে বিচ্ছেদ বা বিরুদ্ধতা, তার অবসান না হওয়া পর্যন্ত আমানের জীবনও সার্থকতার সন্ধান পাবে না, দেশেরও কল্যাণ হবে না। যে জ্ঞান জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চার করে না, তারই পোষণ ও বিস্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আয়োজন দেশের অর্থ ও সামর্থ্যের অপচয়মাত্র। আমাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের ধারা এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের ধারা যে দুটি পৃথক্ খাতে বয়ে চলেছে, দেশের মধ্যে বিদ্যা ও জীবনের মিলনতীর্থ গড়ে তুলছে না তা আমাদের নিত্যপ্রত্যক্ষ বলেই বোধ করি আমাদের মনোযোগ

আকর্ষণ করতে পারছে না। কাজেই বাধ্য হয়ে এই নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। আমাদের ইস্কুলের পাঠক্রমে বেচুআনাল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার ব্যবস্থা আছে, আমাদের প্রত্যেকের দেহস্থিত প্যানক্রিয়েটিক গ্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে কোনো কথাই জানবার দরকার হয় না; গালফ স্ট্রীম কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যায় এবং তার ফলাফল জানা অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হয় কিন্তু আমাদের দেহের রক্তধারা কিভাবে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে জীবনক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে তা জানা আবশ্যিক বলে স্বীকৃত নয়। ভূগোল বিদ্যার প্রয়োজন নেই এ কথা কেউ বলবে না, কিন্তু প্রাথমিক দেহবিদ্যার প্রয়োজন যে তার চেয়ে কম নয় একথাও স্বীকার করা চাই। ভূগোলের মোটামুটি জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার ভিত্তিই গঠিত হয় না; প্রাথমিক দেহবিদ্যার অভাবে ঠিকমতো অর্থাৎ শিক্ষিত লোকের মতো জীবনধারণই যে অসম্ভব হয়। আমাদের কোটি কোটি লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী ও দেশব্যাপী অজস্র রোগের প্রকাশের কথা ভাবলে মনে হয় যে, শুধু প্রাণী হিসাবে আমাদের মাত্র বেঁচে থাকার মূলেও অশিক্ষা অহরহ কি মারাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেরও প্রাত্যহিক দেহযাত্রানির্বাহের মধ্যে কত অজ্ঞতা ও কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তা উপলব্ধি করবার মতো শিক্ষাও এদেশে নেই। দেশব্যাপী অস্বাস্থ্য ও মহামারী নিবারণের জন্য গবেষণাগার ও ভেষজদ্রব্য নির্মাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও কোনো ফল হবে না, যদি বিদ্যালয়ের নিম্নস্তর থেকে শিক্ষার যোগে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা না হয়। কেননা, যে দুর্বলতার সুযোগে রোগ আমাদের প্রাণমূলে আক্রমণ চালাচ্ছে সে দুর্বলতা ততটা দেহগত নয় যতটা মনোগত; সে দুর্বলতা আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের অশিক্ষা। পশ্চিমের কাছ থেকে আমাদের আর কিছু শিক্ষণীয় না থাকলেও একটি তত্ত্ব শিখতেই হবে, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য। যে তত্ত্বটি এই—**Knowledge is power,** জ্ঞানই শক্তি। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করে একটি দৃষ্টান্ত দেই।—

"যে দেশে বসন্তরোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা জেনেছে এবং সে কারণটি বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেছে সে দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ করে দৌড় মেরেছে। আর যে দেশের মানুষ মা শীতলাকে বসন্তের কারণ বলে চোখ বুজে ঠিক করে বসে থাকে, সে দেশে মা শীতলা থেকে যান, বসন্তও যাবার নাম করে না।"—'কালান্তর', সমাধান

বস্তুতঃ দেশ থেকে অস্বাস্থ্য ও রোগের প্রকোপ দূর করবার সংগ্রামে দুর্গ স্থাপন করতে হবে বিদ্যাগৃহে, ডাক্তারখানায় নয়; সে সংগ্রামের অগ্রগামী সেনা হবেন শিক্ষকরা, চিকিৎসক থাকবেন তাঁদের পিছনে।

শিক্ষার সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদ আমাদের পক্ষে কতখানি মারাত্মক হয়ে উঠেছে তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। শুধু দেহগত জীবনে নয়, এই বিচ্ছেদ আমাদের মনোজীবনকেও জীর্ণ করছে; আমাদের সমাজ এবং সংস্কৃতিও পঙ্গুতায় আক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের দেশের বি.এ, এম.এ. পাস-করা একজন সাধারণ শিক্ষিত লোকের মনের কথাই ধরা যাক। দেখব সে মনের কাছে বিদেশ অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য জগৎই জ্ঞানের আলোকে অল্পাধিক উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে; এশিয়া কিংবা ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলা দেশ, একেবারেই অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে মনের কাছে ইংরেজি সাহিত্য, এমনকি ফরাসি বা জার্মান সাহিত্যের কথা সুপরিচিত, কিন্তু গুজরাটি, মারাঠি বা তামিল সাহিত্য একেবারেই অপরিচিত। সে মনের কাছে সিংহল কেরল বা উৎকল ইউরোপের ইতালি স্পেন বা আয়ারল্যাণ্ডের চেয়েও দূরবর্তী। ইতালীয় রেনেসাঁস বা জার্মান রিফরমেশানের ভাবধারা অনেকাংশেই আমাদের মনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, কিন্তু রামানন্দ কবীর নানক প্রভৃতির ধর্ম-আন্দোলন বা তৎকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি আমাদের মনে প্রবেশাধিকার পায় না। গ্রীস-রোমের ইতিহাস অনেকটাই আমাদেব অধিগত, কিন্তু ইরাণ-আরব বা চীন-জাপানের কোনো ইতিহাস আছে বলেই আমদের বোধ নেই। আলফ্রেড দি গ্রেট্ বা শার্লেমাঁকে আমরা আত্মীয় বলেই বোধ করি, কিন্তু লক্ষ্মণসেন বা হোসেন শাহ আমাদের একান্তই পর। আমাদের কাছে হানিবাল বা জুলিঅস সীজরের বীরত্ব খুবই বিস্ময়কর, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত বা পুষ্যমিত্রের মর্যাদা ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে— ইউরোপেকে আমরা যতটা জানি, এশিয়াকে তার সিকিভাগও জানি না। ভারতবর্ষকে মোটামুটিভাবে যদিও বা কিছুটা জানি, বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাও বলা যায় না। ইতিহাসে এম.এ. পাস-করা শিক্ষিত (?) মনের কাছেও বাংলা-দেশের ইতিহাস একেবারেই অন্ধকারময়। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পাঠক্রমের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান নেই। বস্তুতঃ আমরা যতই ঘরের কাছে আসি ততই আমাদের অজ্ঞতা গাঢ়তর হয়। আমাদের বিপরীতগামী শিক্ষা "দূরকে করিল নিকট, বন্ধু, পরকে করিল ভাই"। সে শিক্ষায় তাই বন্ধুকে করা হয় দূর এবং ভাইকে করা হয় পর। তার ফলেই হয় আত্মগ্লানি ও আত্মবিচ্ছেদ।

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

বৈষ্ণব পদকর্তার এই বাণী আমাদের আধুনিক শিক্ষায় এমন মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে উঠেছে যে, এর প্রতিকার না হলে আমাদের আর নিষ্কৃতি নেই। দূরকে নিকট এবং পরকে ভাই করতে দোষ নেই, বরং সেটাই যথার্থ শিক্ষার একটা মূল লক্ষ্য। কিন্তু ঘরকে বাহির ও আপনাকে পর করার মারাত্মক শিক্ষার অচিরাৎ অবসান চাই, নতুবা সর্বনাশ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় নিকট ও দূর, আপন ও পর উভয়ের যথাযোগ্য স্থান অবশ্যই থাকা চাই। কিন্তু শিক্ষার স্বাভাবিক গতি নিকট থেকে দূরের দিকে, আপন থেকে পরের দিকে। এই গতি যদি বিপরীতমুখী হয় তবে যে শিক্ষা লাভ হয়, তার বিষক্রিয়ার ফলেই তো আজ সমস্ত দেশ জর্জরিত। কিভাবে আমাদের শিক্ষার স্বাভাবিক গতি পুনঃপ্রবর্তিত করা যায়, সে কথা রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তযোগে অতি স্পষ্টভাষায় আমাদের কাছে পুনঃ পুনঃ উপস্থাপিত করেছেন। সে কথা আজ শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করবার সময় এসেছে।—

"জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে-ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে-বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। ...আমরা নৃতত্ত্ব বা **ethnology**-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম-কৈবর্ত, পোদ-বাগদি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না।

"বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম। ইহার ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির প্রতি যদি ছাত্রেরা লক্ষ্য রাখে, তবে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে

ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিক্‌কে নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে।...

"এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থা-বৈচিত্র্য আছে, এমন বোধহয় আর-কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূর-দেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িবামাত্র কখনো হইতেই পারে না।"—স্বাধীন শিক্ষা, 'পাঠপ্রচয়,, চতুর্থ ভাগ

শিক্ষার গতি কোন্ দিকে এবং শিক্ষণীয় বিষয় কি হওয়া উচিত, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সুস্পষ্ট। প্রথমে বাংলাদেশ, তার পরে ভারতবর্ষ এবং আরও পরে দূর দেশের দিকে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকবে এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এই শিক্ষাক্রমের এক উদ্দেশ্য ছাত্রদের জ্ঞানবৃত্তিকে শক্তিসঞ্চয়ের স্বাভাবিক পথে চালনা করা, আর-এক উদ্দেশ্য শিক্ষার সঙ্গে দেশের যোগ স্থাপন করা। তাতে ব্যক্তি ও দেশ উভয়েরই কল্যাণ। ছাত্রদের কি কল্যাণ, সে সম্পর্কে উক্ত 'স্বাধীন শিক্ষা' প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় ভাষায় বলেছেন—

"এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।"

আমাদের শিক্ষাকে নিষ্ফলতা থেকে রক্ষা করবার কোনো চেষ্টাই হল না, রবীন্দ্রনাথের এ ক্ষোভ তাঁর মৃত্যুকালেও ঘোচে নি। তাঁকে দেখে যেতে হয়েছে আমাদের ছাত্রদের উপরে গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড এমন-কি পৃথিবীর ইতিহাস অধিগত করবার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, অথচ আমাদের নিকটতম বাংলা-দেশকেই একেবারে উচ্চতম শিক্ষাপরিধিরও বাইরে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এভাবে কি ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটে? না, দেশের সঙ্গে বিদ্যার মিলন ঘটে? রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বলেছেন—"কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে, তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে" (ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, 'শিক্ষা')। সে দেশ যে মুখ্যতঃ বাংলাদেশ এবং শিক্ষার সঙ্গে স্বাভাবিক যোগের

অভাবে দেশেরও হীনতা ঘটেছে, সে কথাও তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

"বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোক-বিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই আমাদের বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই-সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইবার কারণ নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।… সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি, তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।"—স্বাধীন শিক্ষা।*

আমাদের জ্ঞানের কাছে আমাদের স্বদেশের এই ক্ষুদ্রতা ও দীনতা ঘোচাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, একথা আমাদের শিক্ষা-নায়কদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি। স্বদেশ বলতে উদ্ধৃত অংশে মুখ্যতঃ বাংলাদেশকেই বোঝাচ্ছে কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত একটি অংশ এবং অন্যান্য রচনা থেকে বোঝা যায়, শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতবর্ষও রবীন্দ্রকল্পিত শিক্ষাবিধিতে স্বদেশপদবাচ্য। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। হেমলতা দেবী প্রণীত শিশুপাঠ্য 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, ইস্কুলের পাঠক্রম নির্ণয় উপলক্ষে শিক্ষা-নায়কের পক্ষে আজ তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।—

"আমাদের মতে ইতিহাসের নামাবলী ও ঘটনাবলী মুখস্থ করাইবার পূর্বে আর্য ভারতবর্ষ, মুসলমান ভারতবর্ষ ও ইংরেজ ভারতবর্ষের একটি পুঞ্জীভূত সরস সম্পূর্ণ চিত্র ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দেয়া উচিত। তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবর্ষ জিনিসটা কি। এমন-কি, আমরা বলি ভারতবর্ষের ভূগোল ইতিহাস এবং সমস্ত বিবরণ জড়াইয়া শুদ্ধমাত্র "ভারতবর্ষ" নাম দিয়া একখানি বই প্রথমে ছেলেদের পড়িতে দেওয়া উচিত। পরে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস পৃথকভাবে তন্ন তন্ন রূপে শিক্ষা দিবার সময় আসিবে। আমরা বোধ করি ইংরাজিতে এরূপ গ্রন্থের বিস্তৃত আদর্শ

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ সালে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এটি পরে 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে এটি 'সংকলন' গ্রন্থে স্থান পায়। আরও পরে এটি আবার নূতন রূপে ও 'স্বাধীন শিক্ষা নামে 'পাঠপ্রচয়' গ্রন্থে গৃহীত হয়। তাতেই এটির গুরুত্ব বোঝা যায়। এটির উপযোগিতা আজও সমভাবে বিদ্যমান।

স্যার উইলিয়ম হণ্টারের ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার। এই সুসম্পূর্ণ সুন্দর পুস্তকটিকে যদি কোনো শিক্ষিত মহিলা শিশুদের অথবা তাহাদের পিতামাতাদের উপযোগী করিয়া বাঙ্গালায় রচনা করেন তবে বিস্তর উপকার হয়।"—ভারতী, ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৮৬-৮৭

ভূগোল, ইতিহাস ও অন্যান্য বিবরণসহ একখানি ভারত-পরিচয় গ্রন্থ প্রথমে পড়তে দিয়ে পরে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিশদভাবে পড়াবার সমীচীনতা সহজেই বোঝা যায়। বাংলাদেশ সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য। ভূগোল, ইতিহাস ও অন্যান্য বিবরণসহ একখানি সরল স্বল্পায়তন অথচ সম্পূর্ণ পুস্তক প্রথমে শিখিয়ে নিয়ে পরে বাংলার ইতিহাস প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

চিত্তের উন্মেষ সাধনের দিক্ থেকেই হোক, দেশের সঙ্গে যোগ স্থাপনের দিক্ থেকেই হোক, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে স্বদেশের ইতিহাসের একটি বড় স্থান ছিল। কেননা ইতিহাসের মধ্যেই স্বদেশের প্রাণস্বরূপ বিশিষ্ট প্রতিভার এবং তার কালক্রমাগত বিকাশধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। তাই তিনি বলেছেন—

"বিদেশী শিক্ষাধিকারের হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা স্বদেশীয় ভাবে, স্বদেশী প্রণালীতে, স্বদেশের সহিত হৃদয়মনের যোগ রক্ষা করিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে একান্ত প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে।...এই স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত নিষ্ঠাবান্ গুরু এবং তাহার অধ্যাপনার প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস।" —ভারতবর্ষের ইতিহাস, রবীন্দ্র-রচনাবলী (প. ব. স.) ১২শ খণ্ড, পৃ ১০৩৩

স্বদেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলতে রবীন্দ্রনাথ সেই ইতিহাসের কথাই বলতে চেয়েছেন যা স্বদেশের প্রাণসত্তা ও তার বিশিষ্টতার আবহমানকালীন ক্রমোন্মেষের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়। বাংলাদেশই বল, ভারতবর্ষই বল, আমাদের স্বদেশের তেমন সম্পূর্ণ ইতিহাসের অভাব তাঁর মনকে খুবই পীড়া দিত। তাই তিনি গভীর ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন—

"যে-সকল দেশ ভাগ্যবান্, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। বাল্যকালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়

সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।"—পূর্বোক্ত, পৃ ১০২৮

এসব কারণে এক সময়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ইতিহাস শেখাবার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে এই কথাটুকুও বিশেষভাবে

।ম ।

রবীন্দ্রনাথের অভিমতের যদি কোনো মূল্য আজও থাকে, তবে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাকে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস-জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। যত সত্বর তেমন ইতিহাস পুস্তকের রচনা ও পঠন-পাঠন শুরু হয় ততই কল্যাণ।

বলা বাহুল্য, শুধু ইতিহাস নয়, স্বদেশের ভাষা সাহিত্য ভূগোল নৃতত্ত্ব সমাজ-বিন্যাস ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সাগ্রহ পরিচয় স্থাপনের উপরেই আমাদের স্বাধীন শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্বদেশকে জ্ঞান ও হৃদয়ের দ্বারা ঘনিষ্ঠ উপলব্ধির আয়োজন করে তবে আমাদের বিদ্যাকে বিশ্বমানবের বৃহৎ ক্ষেত্রের দিকে প্রসারিত করতে হবে। যে শিক্ষার্থীর হৃদয়মনে নিত্য-প্রত্যক্ষ স্বদেশের উপলব্ধিই হয় নি, তার কাছে বিশ্বোপলব্ধির প্রত্যাশা করাও অন্যায়।

শিক্ষার মুক্তি

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের নাম 'স্বাধীন শিক্ষা'। এটি হচ্ছে মূলতঃ ১৯০৫ সালে স্বাদেশিক উদ্দীপনার যুগে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'। এই সম্ভাষণে তিনি ছাত্রদের আহ্বান করেন বিদেশী চালিত কলেজী শিক্ষার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে বিস্তীর্ণ-দেশের মহত্ত্বকে উপলব্ধি করতে, শিক্ষাকে স্বাধীন চিন্তার উদার ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে। কেননা তিনি জানতেন শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের অমোঘ অস্ত্র। শিক্ষা যখন প্রতিকূল শাসন-শক্তির হাতে থাকে, তখন তাই হয় পীড়ন ও পরাধীনতার সহায়ক।

স্নতরাং দেশকে প্রতিকূল সরকারের হাত থেকে মুক্ত করতে সর্বাগ্রে চাই স্বাধীন শিক্ষা। নিপীড়িত:অসহায় জাতির পক্ষে পীড়ক ও শোষক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে বিদ্যালয়গুলিই হয় দুর্গ এবং স্বাধীন শিক্ষাই হয় তার অস্ত্র। প্রতিকূল শাসনশক্তির হাতে এই বিদ্যালয়গুলিই হয়ে ওঠে 'গোলামখানা'। তাই স্বদেশ-পাঠকদের প্রধান ব্রত হল ওই গোলামখানাগুলিকে মুক্তিদুর্গে পরিণত করা কিংবা স্বাধীনভাবে মুক্তিদুর্গের প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতকে তারই অন্যতম প্রথম নিদর্শন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় এবং স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে জেলায় জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাংলাদেশে এই স্বাধীন-শিক্ষা সাধনার ইতিহাস দীর্ঘকালব্যাপী। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই তার প্রথম স্নচনা।

তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ভারতবর্ষে নব্য শিক্ষার প্রেরণাই জয়ী হয়েছে। আমাদের অধীনতা-নিরসনের মূলে রয়েছে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীর স্বদেশ-সাধন। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, রাজনারায়ণ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, স্নরেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রস্নন্দর, বিনয় সরকার, গুরুদাস, আশুতোষ প্রভৃতি নাম স্মরণ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। বাংলার বাইরেও মদনমোহন, গোখলে, শ্রীনিবাস প্রমুখ বহু মনস্বীর নাম স্মরণীয়। বস্তুতঃ ভারতীয় মুক্তির মূলে রয়েছে স্বদেশব্রতীর শিক্ষাসাধনা ও শিক্ষাব্রতীর স্বদেশসাধনা।

বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংগ্রাম চলেছে শতাধিক বৎসর। এই মুক্তিসংগ্রামের স্নত্রপাত্র হয় পলাশির যুদ্ধের ষাট বৎসর পর ১৮১৭ সালে

কলকাতায় হিন্দুকলেজ বা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। এই সময় থেকে শিক্ষাকে আশ্রয় করে দেশের চিত্তমুক্তির যে সূচনা হল, তার সাধনা চলল দীর্ঘকাল ধরে। এই অতিদীর্ঘতার অন্যতম প্রধান কারণ বৈদেশিক রাজশক্তি তথা ধর্মযাজক শক্তির প্রতিকূলতা। বৈদেশিক শক্তির এ-কথা ভালোই জানা ছিল যে, দেশের অশিক্ষা তথা বিকৃত শিক্ষার উপরেই তার প্রভুত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে; প্রকৃত শিক্ষা ও জনজাগরণের সমক্ষে টিকে থাকাবার সাধ্য তার নেই। তাই পলাশির যুদ্ধের পরে প্রায় আশি বৎসর ইংরেজ সরকার এদেশের শিক্ষার দায়িত্ব-গ্রহণে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। অতঃপর তারা যখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করল, তখন তারা নিত্য সযত্ন থাকল যাতে জনসাধারণের মধ্যে সত্যশিক্ষা ব্যাপ্ত হয়ে না পড়ে এবং সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা যাতে দেশের চিত্তকে সরকারের অনুকূল করে তোলে। অপর দিকে দেশের নায়কেরা যত্নপর হলেন মিশনারী-প্রভাব ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে দেশের শিক্ষাকে চিত্তমুক্তির উপযোগী করে তুলতে ও জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার দান করতে। দুই বিরোধী পক্ষের এই টানাটানির ফলেই আমাদের শিক্ষাসংগ্রাম এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছে এবং ইংরেজি রাজত্বের অবসানকালেও আমাদের শিক্ষা আমাদের চিত্তে সত্যরূপে ব্যাপ্তি লাভ করতে পারে নি।

বৈদেশিক রাজশক্তির শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য ছিল দুই দিকে। প্রথমতঃ শিক্ষাকে স্বদেশবিমুখ তথা অবাস্তব করে রাখা, যাতে শিক্ষার ফলে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আত্মস্বরূপ ও আত্মশক্তির উপলব্ধি না ঘটতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাকে ইংরেজি ভাষায় গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা, যাতে বিদেশী ভাষার মধ্যস্থতার ফলে দেশের চিত্তকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করতে না পারে ও স্ব-ভাষার বাহকতার ফলে অবাধ ব্যাপকতা লাভ করতে না পারে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের এই দুটি লক্ষ্য বা কুফলকে ব্যর্থ করে শিক্ষাকে যাতে ব্যাপকভাবে দেশের আত্মোপলব্ধির কাজে লাগানো যায়, সে চেষ্টায় ব্রতী হলেন দেশের শিক্ষানায়কেরা।

এই শিক্ষাসংগ্রামের প্রথম মহানায়ক হলেন রামমোহন রায়। ১৮১৭ সালে হিন্দু-কলেজ বা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বিশ্ববিদ্যার দ্বারা উন্মুক্ত হল। কিন্তু সে শিক্ষার বাহন ইংরেজি এবং তার বিষয়বস্তু অভারতীয়। ফলে সে শিক্ষার ব্যাপক হবার কিংবা আত্মোপলব্ধির সহায়ক হবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই রামমোহন রায় ১৮২২ সালে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে

ইংরেজি-বাংলা দুই-ই বিশেষ যত্ন-সহকারে শেখানো হত। বোধ করি বাংলা ভাষাকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহচর্যদানের এই প্রথম প্রয়াস। শুধু স্বভাষা নয়, স্বদেশ এবং স্বধর্মের সংস্কার ও উন্নতিসাধন ছিল রামমোহন রায়ের এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন (১৮২৭-৩০) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর জীবনে এই স্কুলের শিক্ষা ব্যর্থ হয় নি। ১৮৩২ সালে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' নামে একটি সভা স্থাপন করে এবং দেবেন্দ্রনাথ এর সম্পাদক হন। এই সভার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার চর্চা এবং বাংলা ভাষাতেই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা। এমন-কি, বাংলা ভাষা ভিন্ন এ সভাতে কোনো কথোপকথনও হতে পারত না। এর থেকেই রামমোহনের শিক্ষার স্বরূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। ১৮৩৮ সালে রামমোহনের অনুবর্তী তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ তৎকালীন নব্য-শিক্ষিতরা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ এ সভারও সভ্য ছিলেন। এ সভাতে ইংরেজি-বাংলা দুই ভাষাতেই বিবিধ জ্ঞানের আলোচনা হত। এই সভার সদস্যদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের কতখানি উন্নতি সাধিত হয়েছে তা আজ আর অবিদিত নাই। পরের বৎসর দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামে আর-একটি সভা স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল উদারতর ও গভীরতর—জাতীয় ভাষার যোগে জাতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষসাধন। এই সভার উদ্যোগে ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হল সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের উপরে। এই পত্রিকার যোগে বাংলার জ্ঞান ও চিন্তা দীর্ঘকাল নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল মাতৃভাষায়। তাতে যেসব বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল, তাঁর মধ্যে রাজশক্তিনিরপেক্ষ স্বাধীন শিক্ষা অন্যতম। এই স্বাধীন শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪০ সালেই 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৫ সালে ইংরেজ সরকার স্থির করেন একমাত্র ইংরেজি শিক্ষিতরাই রাজকার্যের যোগ্য বলে গণ্য হবে। জাতীয় সংস্কৃতির এই সংকটকালেই 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং হিন্দু কলেজের 'আদর্শ বাংলা পাঠশালা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপিত হয়। পত্রিকা-সম্পাদক অক্ষয়কুমার হলেন পাঠশালার অন্যতম মুখ্য শিক্ষক। মাতৃভাষার যোগে স্বাধীনভাবে সর্ববিষয়ে শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই

দুই পাঠশালার উদ্দেশ্য। দেবেন্দ্রনাথও সরকারি প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্বও স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' কলকাতা থেকে হুগলি জেলার বাঁশবেড়ে গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এই পাঠশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের নিম্নলিখিত উক্তি বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।—

"আমরা পরের শাসনে রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি। অতএব এইক্ষণে আমাদের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।··· বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা···এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।"— সাহিত্যসাধক-চরিতমালা, ৪৫, পৃ. ৩৬-৩৮

এর পরের বৎসর পাঠশালার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়— "পাঠশালাতে পদার্থবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে, বঙ্গভাষা স্বদেশীভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিতরিত হইতে পারিবেক।"—ঐ, পৃ. ৩৯

এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' আট বৎসর চলেছিল। ১৮৪৮ সালে এটি নানা কারণে উঠে যায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, রামমোহনের 'অ্যাংলো-হিন্দু-স্কুল' এবং দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' পরবর্তীকালের রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়-এর (১৯০১) অগ্রদূত। তিন বিদ্যালয়েরই উদ্দেশ্য মূলতঃ এক। শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

১৮৪৬ সালে কলিকাতায় 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল দেবেন্দ্রনাথের উদ্যম। এই বিদ্যালয়েরও বাংলা শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র অন্যতম মুখ্য অধ্যাপক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত আর 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়'-এর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া ত্রিপুরা জেলায় স্বীয় জমিদারির অন্তর্গত বরকামতা গ্রামেও দেবেন্দ্রনাথ একটি 'বঙ্গবিদ্যালয়' স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে একমাত্র বাংলা ভাষাতেই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হত।

দেশে বাংলাশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামও

বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই তিনি এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হন। অবশেষে ১৮৫৫ সালে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করতে প্রবৃত্ত হন। সরকারও তাঁর উপরেই বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব দেন। তখন তিনি এইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি 'নর্ম্যাল স্কুল' স্থাপন করেন (১৮৫৫)। প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ও পাঠশালার অন্যতম মুখ্য শিক্ষক সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত। বলা বাহুল্য, এইসব বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন উপলক্ষে বিদ্যাসাগরকে সরকারি আমলাতন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘকাল কঠোর সংগ্রাম চালাতে রয়েছিল। এই বাংলা শিক্ষা আন্দোলনের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের মনোভাব স্বভাবতঃই অনুকূল ছিল। তারই ফলে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথকে এই নর্ম্যাল স্কুলে ভরতি করানো হয়েছিল, আর এই নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষাই তাঁর সাহিত্য-জীবনের তথা তাঁর শিক্ষানীতির ভিত্তি রচনা করেছিল। এই কথা তিনি নানা প্রসঙ্গে নানা স্থানে সানন্দে প্রকাশ করেছেন। বোলপুর 'ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার মূলে এই নর্ম্যাল স্কুলের আদর্শও কিছু পরিমাণে কাজ করেছিল সন্দেহ নাই। বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে 'অ্যাংলো-হিন্দু-স্কুল' ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 'নর্ম্যাল স্কুল'-এর কথাও অবশ্য স্মরণীয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালের জানুআরি মাসে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও বি. এ পরীক্ষায় ইংরেজি, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত ইত্যাদির ন্যায় বাংলা সাহিত্যও অবশ্য পাঠ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল। তাই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যেরও পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যার মন্দিরে বাংলা সাহিত্য-সরস্বতীর এই মর্যাদা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। ১৮৬৮ সালে তাঁকে ওই বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে বিদায় নিতে হয়। বাংলাদেশের বিদ্যায়তন থেকে বাংলা এই নির্বাসন তখন দেশের চিত্তে কোনো আলোড়ন জাগিয়েছিল কিনা জানি না। তখন থেকেই বাংলায় বিদ্যার ক্ষেত্রে ইংরেজির একাধিপত্য। অবশেষে বাংলার শিক্ষামুক্তিব্রত আশুতোষের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ১৯০৬ সাল থেকে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিমাতৃমন্দিরে মাতৃভাষার স্থান একটু-একটু করে প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু আজও বিমাতৃগৌরবের পার্শ্ববর্তী দীনা মাতৃভাষার মলিন রূপ বঙ্গ-সন্তানের হৃদয়ে বেদনা সঞ্চার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজির এই একাধিপত্যই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইংরেজের প্রভাব গিয়েছে, কিন্তু ইংরেজির প্রভাব যায় নি। শিশুকাল থেকে ইংরেজি শিক্ষার লৌহবেষ্টনে আমাদের মন হয়ে যায় পঙ্গু, অচল। ফলে আমাদের সাহিত্য তথা জাতীয় জীবনও পূর্ণ শক্তিতে বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। আজ এই বিংশ শতকের মধ্যভাগেও যে দেশ অশিক্ষা তথা দারিদ্র্য-দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, তার মূলে আছে শিক্ষায় ইংরেজির সর্বগ্রাসী একাধিপত্য। আধুনিক কালের সর্বাঙ্গীণ মহৎ শিক্ষার আদর্শ আমাদের চারদিকেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। অথচ আমরা তার সুফল থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত আছি। তার কারণ ইংরেজি ভাষার লৌহ-যবনিকা বা দুর্ভেদ্য ব্যবধান। ১৮৮৩ সালেই রবীন্দ্রনাথ এ-কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন— "বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।"— ভারতী ১২৯০, কার্তিক। তারপর বহু বৎসর পার হয়ে গেল, কিন্তু এই দুঃসহ অবস্থার কোনো প্রতিকারের লক্ষণ আজও দেখা গেল না। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমোহন, লোকেন্দ্রনাথ, গুরুদাস, আশুতোষ প্রভৃতি বহু মনস্বীর সাধনা ও বাণী আজ পর্যন্ত নিষ্ফলই রয়ে গেল।

অনেকে মনে করেন ইস্কুলের শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া যায় বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষায় কিছুতেই দেওয়া চলে না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ ও কঠোর মন্তব্যের কথা অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষাও যে মাতৃভাষার যোগে দেওয়া সম্ভব, এ-কথা কে সাহস করে প্রথম বলেন জানি না। ১৮৮০ সালে বঙ্কিম-প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'কালেজী শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে অভিমত প্রকাশ করেন তাতে গভীর চিন্তা ও প্রবল সাহসের পরিচয় পাই। সে অভিমতের কথাও পূর্বে বলা হয়েছে। তিনি নিঃসংশয় সাহসের সহিতই বলেছেন, কলেজের শিক্ষাও বাংলাতেই দেওয়া উচিত। এর পরে শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু এই অস্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিকারের কোনো আশা এখনও দেখা যাচ্ছে না।

আমাদের শিক্ষা-সংগ্রামের অন্যতম মহানায়ক আশুতোষ। দেশের শিক্ষামুক্তির জন্য তাঁকে প্রভুশক্তির সঙ্গে কিরূপ কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, আশা করি পাঠক তা এখনও বিস্মৃত হয়ে যান নি। কিন্তু পুরুষসিংহ আশুতোষের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দেবার কোনো প্রয়াস দেখি না। তাঁর

মর্মর মূর্তির কণ্ঠে বৎসর বৎসর পুষ্পমাল্য অর্পণ করেই কি আমরা কর্তব্য সমাপ্ত করব? তাঁর জীবনসাধনার মর্ম কি আমরা কখনও উপলব্ধি করব না?

আমাদের শিক্ষাসংগ্রামের আর-এক মহানায়ক রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ জীবন-সাধনার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি একটি 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুমূর্তি' দেখে যাবার কামনা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অতৃপ্ত কামনা নিয়েই তাঁকে যেতে হয়েছে। তখন পরাধীনতার বাধা ছিল। এখনও আর তা নেই। কিন্তু সে কামনা পূরণের কোনো আভাস দেশের দিগন্তে আজও দেখা দেয় নি। এমন-কি, তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি পরিপূর্ণ বিমুখতা বা ঔদাসীন্য দেখি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতেও। রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ করে বলেছিলেন—"অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে।...তাদের দেশের সমস্ত কাজই হয় নিজের ভাষায়।" আর আমাদের সমস্ত কাজ হয় বিদেশের ভাষায়। তাঁর এই ক্ষোভ বিদূরণের ক্ষীণতম প্রয়াসও দেখি না কোথাও। আজকাল অবশ্য শিক্ষাসংস্কারের নানারকম প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে নানা দিক্ থেকে। কিন্তু মাতৃভাষার স্রোতাধারাকে উচ্চতম শিক্ষার সাগরসংগম পর্যন্ত প্রবাহিত করে নিতে পারেন, এমন কোনো ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না ভারতবর্ষের কোনো প্রান্তে।

একজন ভারতহিতৈষী ইংরেজ মনীষিকে ক্ষুব্ধচিত্তে বলতে শুনেছি, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে জাতীয় বিপ্লব ঘটেছে, যার ফলে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হল, সে হচ্ছে **'revolution arrested half way'**। তিনি গভীর দুঃখের সহিত অনুভব করেছেন যে, 'too much toleration of English tradition and institutions'-এর একটা মনোভাবই স্বাধীন ভারতে ওই বিপ্লবকে অর্ধপথেই স্তব্ধ করে দিয়েছে। জাতীয় জীবনের অন্য ক্ষেত্রে যাই হোক-না-কেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে ওই বিপ্লবের বেগ যে দ্বারপ্রান্তে এসেই স্তব্ধ হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-ঈশ্বরচন্দ্রের যুগে যে শিক্ষা-বিপ্লবের আরম্ভ, ১৯০৫ সালে বাংলার জাগরণে যার শক্তিসঞ্চয় এবং আশুতোষ-রবীন্দ্রনাথের হাতে যার প্রসার, আজ স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিক অধ্যায়ে প্রবেশ করে সে বিপ্লব যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। অথচ আজ আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ বিপ্লব চাই, সংস্কারমাত্র নয়। কেননা, দাসত্বের ঐতিহ্যলাঞ্ছিত শিক্ষার সংকীর্ণ ও জীর্ণ ভিত্তির উপরে স্বাধীনতার ইমারত কখনও স্থায়ী হতে পারে না।

ভাষার মুক্তি

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে বিখ্যাত মুকুন্দ দাসের দৃপ্তকণ্ঠে গান শুনেছিলাম—

ইংরেজ আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে,
মন তো স্বাধীন রয়।

আজ ইংরেজ গেছে, আমাদের দেহ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু মন স্বাধীন হয়েছে কি? পুরোপুরি হয়েছে বলতে পারি না। ইংরেজ আমাদের যেভাবে ভাবতে শিখিয়েছে, আজও আমরা অনেক অংশে সেভাবেই ভাবছি। স্বাধীন ভারতের আইনকানুন আদবকায়দা আচার-অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সব-কিছুতেই তার নিদর্শন মিলবে। সবচেয়ে বেশি মিলবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষাব্যবস্থায়। ইংরেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে কাঠামো গড়ে দিয়ে গেছে, সে কাঠামোই আজও বজায় আছে। ইংরেজের দেওয়া শিক্ষার ভঙ্গী ও ব্যবস্থায় আজও স্বাধীন ভারতের হাতের ছাপ পড়ে নি। তাতেই বোঝা যায়, আমাদের মনের মুক্তি এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। মন গড়বার কারখানা হচ্ছে বিদ্যালয়, আর তার উপায় হচ্ছে ভাষার স্বাধীনতা। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আজও স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মন তৈরি করার উপযোগী করে পুনর্গঠিত হল না। ইংরেজের গড়া শিক্ষা ও ভাষার সংকীর্ণ খাতেই আজও আমাদের জাতীয় মনের ধারা পূর্ববৎ বয়ে চলেছে; তাতে না আছে বেগ, না বিস্তার, না গভীরতা। এখনও সেই সরকারি ও বেসরকারি স্কুলকলেজের জাতিভেদ বহাল রয়েছে, এই জাতিভেদ ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদের চেয়ে কম মারাত্মক নয়। কিন্তু তা তুলে দেবার ক্ষীণতম আভাসও দেখতে পাচ্ছি না। তা ছাড়া, ভারতবর্ষ এখনও বৃটিশ গ্রহের চারদিকে উপগ্রহের মতো ঘুরছে। তাই এখনও আমরা দুনিয়াটাকে ইংরেজের দৃষ্টিতেই দেখছি। ভাষা ও সাহিত্য হচ্ছে জাতীয় দৃষ্টির প্রতীক। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের যোগেই দুনিয়াটা আজও আমাদের চোখে পড়ছে। ফরাসি, জার্মানি প্রভৃতি অন্য সাহিত্যের যোগে আমরা বিশ্বব্যাপার কখনও দেখি নি, আর নিজের ভাষা ও সাহিত্যের স্বাধীন দৃষ্টিতেও দেখতে শিখি নি। তাই বলতে হয়, দেহ স্বাধীন হলেও আমাদের মনের মুক্তি এখনও বাকি আছে। রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা স্বাধীন হয়েছি, অর্থব্যাপারেও

স্বাধীনতার জন্যে সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু মনের ব্যাপারে স্বাধীনতার উদ্যম কবে শুরু হবে?

মনের মুক্তি মানে ভাষা ও সাহিত্যের মুক্তি। তার প্রধান অন্তরায় দুটি, ইংরেজি ও হিন্দি। কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। এক দল বলেছেন, ইংরেজকে সরালেও ইংরেজিকে তার স্থান থেকে সরানো চলবে না, সরালে দেশ মধ্যযুগের অন্ধকারে ডুবে যাবে। আর-এক দল বলছেন, হিন্দিকে ইংরেজির আসনে বসাতেই হবে, নইলে সদ্য-পাওয়া স্বাধীনতাই মিথ্যা হয়ে যাবে। দুটোকেই বাড়াবাড়ি বলে মনে করি। ইংরেজির বিরুদ্ধে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন করলে মধ্যযুগের অন্ধকার দেখা দেবেই। দেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো আনবার ওই একটিমাত্র জানালাই খোলা আছে। ওই জানালাটাকে বন্ধ করবার কথা হতেই পারে না। কথা হচ্ছে ওই জানালাটাকে পুরোপুরি খোলা রেখেই দেশের দেওয়ালে আরও যত পারা যায়, নূতন জানালা খোলা। দেশের বড় বড় বিদ্যালয়গুলিতে চলুক-না ইংরেজির পাশাপাশি ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান প্রভৃতি দুনিয়ার সেরা সাহিত্যগুলির ব্যাপক অধ্যয়ন-অধ্যাপনা। দেশ ছেয়ে যাবে নূতন আলোর প্রবল বন্যায়। আধুনিক জগতের সাহিত্যগুলির মধ্যে ইংরেজিই মোটের উপর সেরা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরেজির একাধিপত্য তথা অতি-আধিপত্য আমাদের মনের পক্ষে কল্যাণকর নয়। বিগত ইংরেজ-শাসনের যুগে আমরাই যে শুধু ইংরেজিকে আয়ত্ত করেছি তা নয়, ইংরেজিও আমাদের মনকে আয়ত্ত করেছে। ফলে এক দিকে আমরা ইংরেজির বাইরে তাকাতে পারছি না, অপর দিকে এই বিদেশী আগন্তুকদের যেখানে প্রবেশাধিকার নেই, সেখানেও সে অনধিকার প্রবেশ করেছে, আমাদের বৈঠকখানা পেরিয়ে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছে। যার স্থান থাকা উচিত ছিল শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কর্ম এবং ভক্তির ক্ষেত্রেও সে জাঁকিয়ে বসেছে। আমাদের চিঠিপত্র, কাজকারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আফিস-আদালত সব-কিছুই চলে ইংরেজিতে। বাঙালি উকিল বাঙালি হাকিমকে মামলা বোঝাচ্ছেন ইংরেজিতে, বাঙালি শিক্ষক বাঙালি ছাত্রকে দেশের ইতিহাস বা অন্য-কিছু শেখাচ্ছেন, তাও ইংরেজিতে। এই কৃত্রিমতার চাপ দেশের মন কত দিন সইবে? ইংরেজি বই পড়ে বিলেতি বিদ্যা শিখব বই-কি? তা বলে বিদ্যাটাকে প্রয়োগ করতেও হবে ইংরেজিতে? বিলেতি ওষুধের ইন্‌জেকশন নেব, কিন্তু তার জন্যে কি সাহেব ডাক্তার না

আনলেই নয়? ইংরেজি বই পড়ে বুঝতে পারলেই যেখানে মনের পুষ্টি হয় সেখানে ইংরেজিতে বুঝিয়ে উত্তর লিখতে না পারলে যদি ফেল করা হয়, সেটা কি জুলুম নয়? কালিদাসের শকুন্তলা বা শেক্স্পীয়রের ওথেলো পড়ে বাংলায় তার সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয় করা চলবে না, করতে হবে ইংরেজিতে, একেই বলি জুলুম। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন বাংলায় এবং সে বিশ্লেষণ বাঙালির কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সে নজির আমাদের মহাবিদ্যালয়গুলিতে চলবে না। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্য পড়েই বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি করেছেন, এই আদর্শ আমাদের শিক্ষানায়করা অনুসরণীয় বলে মনে করেন না। আমাদের মাতৃভাষাকে বিমাতৃসদনে একটু স্থান দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে মাতৃমন্দিরের পুণ্য অঙ্গনকে মহোজ্জ্বল করে তোলবার কবিমনোরথ উত্থায় হৃদি লীয়মান হয়েই রইল।

ইংরেজিকে আমরা ভারতবর্ষ দূরে থাকুক, আমাদের বৈঠকখানা কুইট করতেও বলব না; কিন্তু অন্দরমহল কুইট করতে অবশ্যই বলব। এই সম্মানিত বিদেশিকে বিশ্ববিদ্যার অতিথিকক্ষে সমাদর করেই স্থান দেব, কিন্তু মাতৃভাষার নিভৃত কক্ষে তার প্রবেশাধিকার নেই। বিলেতি বিদ্যার বিদেশী জাহাজকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দরগুলিতে অবশ্যই ভিড়তে দেব, কিন্তু সে বিদ্যার দামি মালকে গাঁয়ে গাঁয়ে পৌঁছে দিতে হবে মাতৃভাষার ছোট-ছোট নৌকোতে করেই। সমুদ্রের জাহাজকে গাঁয়ের খালে-বিলে ঠেলে নেবার অসাধ্য কর্মে কোমর বাঁধব না। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যার্থীরা ইংরেজির যোগেই জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকার লাভ করবে, কিন্তু সে বিদ্যাকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবেন মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যোগে। দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে করতে হবে বিদেশী বিদ্যার বাহন। আমরা বিদেশি বিদ্যাকেই চাই, বিদেশি ভাষাকে নয়। অথচ আমরা সর্বদাই ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি বিদ্যাকে অভিন্ন বলে ভুল করি। মনে রাখতে পারি না যে, ইংরেজি ভাষাটা হচ্ছে উপায়, আর বিলেতি বিদ্যাটা হচ্ছে লক্ষ্য। উপায়কে লক্ষ্য বলে ভুল করেই আমরা গোলকধাঁধায় পড়েছি।

বিদ্যা আমদানির উপায় যদি করি ইংরেজিকে, আর বিদ্যার আদানপ্রদান ও বিস্তারের বাহন করি মাতৃভাষাকে, তা হলে আমাদের শিক্ষাজীবনের অনেকখানি সময় ও শক্তি বেঁচে যাবে। বলা বাহুল্য, ইংরেজি সাহিত্যশিক্ষা ও আলোচনার বাহনও করতে হবে মাতৃভাষাকেই, যেমন হয়ে থাকে সব

দেশেই। অবশ্য ইংরেজি ভাষা প্রয়োগের অর্থাৎ ইংরেজিতে লেখালেখি বা আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনও থাকবে, কিন্তু সে প্রয়োজন শতকরা একশো জন ছাত্রেরই প্রয়োজন হতে পারে না। মানসিক প্রবণতা ও ভাবী কর্মজীবনের দাবিতে সে প্রয়োজন হবে অতি অল্প লোকেরই। মনে রাখতে হবে বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজি-জানা লোকের সংখ্যা মাত্র একুশ লক্ষ বা দুশো জনের মধ্যে একজন। অথচ এ-কথাও সত্য যে, এই সামান্য সংখ্যার পক্ষেও ইংরেজি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, যদিও ইংরেজি পড়ার ও পড়ে বিদ্যালাভের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। ভবিষ্যতে দেশে শিক্ষা যখন সকলের পক্ষে আবশ্যিক হবে, তখন ইংরেজি প্রয়োগকারীর সংখ্যা হবে আণুবীক্ষণিক। তাদের জন্য অবশ্যই ইংরেজি প্রয়োগের শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে। বাকি সকলে ইংরেজি পড়বে বিদ্যালাভের উপায় হিসাবে, আর সে বিদ্যাপ্রয়োগের উপায় করতে হবে মাতৃভাষাকে। মাতৃভাষাকে ভালো করে আয়ত্ত করতে পারলে ইংরেজি শিখতেও কষ্ট হবে না, সময়ও কম লাগবে, বিশেষতঃ যদি ইংরেজিও শেখানো হয় মাতৃভাষাতেই। ইংরেজিতেই ইংরেজি শেখানো, লক্ষ্যকেই উপায়রূপে ব্যবহার করা অসাধ্য-সাধনেরই নামান্তর; সে চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের কত সময় ও শক্তির অপচয় হয় এবং কত শিক্ষার্থীর জীবনকে নিরানন্দ ও ব্যর্থ করা হয় তার হিসাব রাখে কে?

যা হোক, বিদ্যালাভের উপায় যদি করি ইংরেজিকে আর মাতৃভাকে করি ইংরেজি শেখার তথা বিদ্যার আদানপ্রদান ও বিস্তারের উপায়, তাহলে দেশের যে শক্তি ও সময় বেঁচে যাবে, তার পরিমাণ বিপুল। সেই বেঁচে-যাওয়া সময় ও শক্তিকে অনায়াসেই প্রয়োজনমতো ফরাসি, জার্মান, চীনা প্রভৃতি বিদেশি ভাষা, হিন্দি, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি স্বদেশি ভাষা বা অন্য যে-কোনো বিদ্যা শেখাবার কাজে লাগানো যাবে। তাতেই হবে ভাষার মুক্তি, শিক্ষার মুক্তি, মনের মুক্তি। এই মুক্তি ঘটতে পারে শুধু ইংরেজির জবরদস্তিকে নিরস্ত করে, তাকে বর্তমান একাধিপত্য ও অতি-আধিপত্যের আসন থেকে নামিয়ে স্বস্থানে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করলেই। এ-কথা ঠিক যে, একদিন-না-একদিন ওই উঁচু আসন থেকে নেমে এসে তাকে তার নির্দিষ্ট আসনে বসতেই হবে। তাতে যত বিলম্ব হবে, ততই আমাদের ক্ষতি।

কিন্তু মনে রাখতে হবে ইংরেজির জন্য নির্দিষ্ট আসন হবে সম্মানেরই, অপমানের কখনোই নয়। এমন-কি, সবচেয়ে বড় সম্মানেরই, যা সে পেয়ে

থাকে দুনিয়ার দরবারে। ভারতের দরবারেও সেই আসনই তার প্রাপ্য। তার থেকে তাকে নামাতে গেলে দেশের বুকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। শেক্স্পীয়র-মিলটনের ভাষার আসনে যদি তুলসীদাস-সুরদাসের ভাষাকে বসানো হয়, তবে আমাদের তুলসীদাস-সুরদাসের যুগেই ফিরে যেতে হবে, সে যুগের রাহু এসে গ্রাস করবে আধুনিক যুগের মধ্যাহ্নসূর্যকে। সুখের বিষয়, সময়ের নদীতে জীবনের তরণীকে উজানে বইয়ে-নেওয়া মানুষের সাধ্য নয়, চেষ্টা করলে নৌকাডুবি অনিবার্য। অথচ সে চেষ্টার হাওয়াই বইছে আজ চারদিকে।

আসল কথা, ইংরেজির মতো হিন্দিকেও তার স্বস্থানে বসাতে হবে। উচ্চতর আসনের দাবি করলেই মুশকিল। ইংরেজির আসন কোথায় তার আভাস দেওয়া গেছে। হিন্দির আসন কোথায় সে সম্বন্ধেও পারিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। এমন একটা দাবি উঠেছে, যেন হিন্দিই ভারতবর্ষের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বা স্টেট ল্যাঙ্গুএজ। এ ভাষাকে ভারতবর্ষের একমাত্র জাতীয় ভাষা বা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুএজ বলেও দাবি করা হয়। অথচ এই দুই দাবিরই কোনো মূল নেই। আমাদের সংবিধানে যে চৌদ্দটি ভাষার উল্লেখ আছে, সে কয়টাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা ও আমাদের জাতীয় ভাষা। পার্থক্য শুধু এই যে, ওই চৌদ্দটির মধ্যে একমাত্র হিন্দিকেই কেন্দ্রের তথা কেন্দ্র-রাজ্য ও বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের সরকারি ভাষা বলে স্বীকার করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে-কোন ভাষায় আবেদন-নিবেদন করবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। তথাপি হিন্দি তার এই নির্দিষ্ট এলাকার সীমা ডিঙিয়ে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষার দাবিতে ইংরেজির আসন দখল করতে অর্থাৎ একাধিপত্য বা অতি-আধিপত্য করতে চায় বলেই সমস্যা দেখা দেয়, অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। কেননা ভারতীয় সংবিধান অনুসারে যে-কোনো রাজ্য নিজের কাজকর্ম চালাবার জন্যে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতে পারে। হিন্দি যদি কারও মাতৃভাষার উপরে হস্তক্ষেপ করতে প্রয়াসী না হয়ে নিজের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সংযত থাকে, তাহলেই আর কোনো সমস্যা দেখা দেয় না।

ভারতবর্ষের চৌদ্দটি বড়-বড় ভাষার মধ্যে হিন্দি যে বিশেষ গৌরব দাবি করে, তার হেতু কি তাও ভেবে দেখা দরকার। হিন্দির পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে সংখ্যার যুক্তি। সংখ্যার যুক্তি মোক্ষম যুক্তি, এর বিরুদ্ধে কোনো

কথা চলতে পারে না ডেমোক্রেসির যুগে। সংখ্যার যুক্তিতে পাকিস্তান হয়েছে, এই যুক্তিতেই হিন্দি ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সরকারি ভাষা হয়েছে এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য হতে চায়। যুক্তিটা এই যে, ভারতবর্ষে হিন্দিভাষীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ভাষাতত্ত্ব তথা ইতিহাসের সামান্য জ্ঞানও যার আছে, সেই জানে ওই যুক্তির মধ্যে একটা মস্ত ফাঁকি রয়েছে এবং ওই ফাঁকিতেই সংখ্যাটাকে ফাঁপানো হয়েছে। আসলে হিন্দি খুব অল্প লোকেরই মাতৃভাষা আর অনেকেরই সেটা পোশাকি ভাষা মাত্র। দিল্লী-মীরাট এবং আগ্রা-মথুরা অঞ্চলের লোকেরাই বলতে পারে হিন্দি তাদের মাতৃভাষা। বাকি যারা নিজেদের হিন্দিভাষী বলে পরিচয় দেয়, হিন্দি তাদের পোশাকি ভাষা মাত্র, মাতৃভাষা নয়। আজকাল যাকে বলা হয় উত্তরপ্রদেশ, অল্পকাল আগেও তার নাম ছিল 'আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশ'। ওই নামটাতেই তার আসল পরিচয় পাওয়া যায়। 'আগ্রা' প্রদেশেরই ভাষা হিন্দি, অর্থাৎ ওই প্রদেশের লোকেরাই ঘরে বাইরে উভয়ত্রই হিন্দি বলে। আর 'অযোধ্যা' প্রদেশের লোকেরা ঘরে অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বলে আওধি আর বাইরে পোশাকি ভাষারূপে ব্যবহার করে হিন্দি, এরা আসলে মাতৃভাষাত্যাগী। হিন্দি আর আসলে এক গোষ্ঠীর ভাষাও নয়। হিন্দি হচ্ছে শৌরসেনী প্রাকৃতের দুহিতা, আওধি অর্ধমাগধীর। আর মৈথিলী, বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি হচ্ছে মাগধী প্রাকৃতের দুহিতা। সুতরাং বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতির সঙ্গে বরং আওধির কিছু আত্মীয়তা আছে, কিন্তু হিন্দির সঙ্গে নেই। এইসব বিবেচনা করেই প্রবীণ ঐতিহাসিক পানিক্কর 'উত্তরপ্রদেশ'কে আগ্রা ও অযোধ্যা এই দুই প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের সামান্য জ্ঞানও যাঁদের আছে, তাঁদের কাছে ওই প্রস্তাব সমীচীন বলেই গণ্য হবে। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ যথার্থ হিন্দিভাষী; আর পূর্বাংশ আওধিভাষী, কিন্তু তাও কাশী-গোরখপুর অঞ্চল বাদে। এই অঞ্চলের ভাষা হিন্দিও নয়, আওধিও নয়, ভোজপুরিয়া। ভোজপুরিয়া মাগধী প্রাকৃতের অপত্য, অর্ধ-মাগধীর নয়। সুতরাং কাশী-গোরখপুর অঞ্চল ভাষা হিসাবে অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত নয়, সে হিসাবে এই অঞ্চল বিহারেরই অংশ।

পূর্বেই বলেছি, অযোধ্যাবাসীরা মাতৃভাষাত্যাগী, সে হিসাবে বিহারীরা আরও বড় অপরাধী। উত্তর বিহারে মৈথিলী, পশ্চিম বিহারে ভোজপুরিয়া আর মধ্য বিহারে মগহী, এই তিনটিই মাগধী প্রাকৃতের অপত্য। মাগধীর আর

তিনটি অপত্য হচ্ছে অসমিয়া, বাংলা, ওড়িয়া। সুতরাং ভাষা হিসাবে বিহারীরা অসমীয়া-বাঙালি-ওড়িয়াদেরই জ্ঞাতি, হিন্দিভাষীদের নয়। কিন্তু বিহারীরা মাতৃভাষা ত্যাগ করে হিন্দি ভাষার গলায়ই মালা দিয়েছে। একেই বলে গোত্রান্তরিত হওয়া। তাছাড়া, তারা নিজের ভাষা-জ্ঞাতিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রক্তসম্পর্কহীন হিন্দিভাষীদের সঙ্গেই মিতালি পাকিয়েছে। "দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই," এক কবি-বাণীর কি বিচিত্র উদাহরণ!

সুতরাং দেখা গেল, একমাত্র আগ্রা প্রদেশেরই মাতৃভাষা হিন্দি, অযোধ্যা প্রদেশে এবং কাশী-বিহার মাতৃভাষাত্যাগী। শেষোক্ত দুই প্রদেশের মাতৃভাষা অন্তঃপুরচারিণী, তাদের বৈঠকখানার পোশাকি ভাষা অর্থাৎ ভদ্রসমাজে ও সাহিত্যে ব্যবহারের ভাষা হিন্দি। যাঁরা ঘরে-বাইরে ভাষায় দ্বৈতবাদী, তাঁরা কিন্তু ঘরের কথা বাইরে বলেন না অর্থাৎ মাতৃভাষার কথা স্রেফ চেপে যান এবং নিজেদের একমাত্র হিন্দিভাষী বলেই পরিচয় দেন। তাঁরা হিন্দির অধীনতা থেকে মাতৃভাষাকে মুক্ত করবার ইচ্ছা পর্যন্ত পোষণ করেন না। ভাষার এই দ্বৈতবাদ তাঁদের মনোজীবনকে খণ্ডিত করে কিনা, তাঁদের প্রতিভাবিকাশের অন্তরায় ঘটায় কিনা সে প্রশ্ন নাইবা তুললাম। কিন্তু এ-কথা বলতেই হবে, তাঁরা মাতৃভাষাকে অস্বীকার করে নিজেদের হিন্দিভাষী বলে পরিচয় দেন বলেই হিন্দিভাষীর সংখ্যা এমন কৃত্রিমভাবে ফেঁপে উঠেছে। যা হোক, তাঁরা মাতৃভাষার কথা চেপে গেলেও ভাষাতাত্ত্বিক কিন্তু তাঁদের ঘরের কথা বাইরে ফাঁস করে দিয়েছেন। তাতে জানা যায়, যথার্থ হিন্দিভাষীর সংখ্যা অর্থাৎ হিন্দি যাদের 'মাতৃভাষা' তাদের সংখ্যা যত বড় দেখানো হয় তত বড় নয়, সব ভাষার তুলনায় বেশি নয়, অন্ততঃ বাংলাভাষীর চেয়ে নয়।

দেখা গেল হিন্দির পক্ষে সংখ্যার দাবি ধোপে টেকে না। ভাষার বা সাহিত্যের গুণেও হিন্দি ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য নয়। এবিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, **"Hindi prose literature is still feeling its way, and its standards are not yet fixed."**

এ-কথা অন্য-সব ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। এই অবস্থায় হিন্দিকে সহসা ইংরেজির আসনে বসাতে যাওয়া বা অন্য-সব ভাষার এলাকার দিকে হাত বাড়ানো খুবই অবিবেচনার কাজ হবে। আরও কিছুকাল

তাকে ইংরেজি ভাষার শাগরেদি করতে হবে এবং অন্য ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। তা হলে সে কালক্রমে সাবালকত্ব লাভ করে কেন্দ্রীয় সরকারি ভাষার কাজ চালাতে পারবে। তার আগেই অত উঁচুতে হাত বাড়ালে নিশ্চয় গমিষ্যত্যুপহাস্যতাং লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ। তবু এ-কথাও বলা প্রয়োজন যে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি যতই পুষ্টিলাভ করুক-না কেন, সুচিরভবিষ্যতেও সে যে ইংরেজির সমকক্ষতা লাভ করতে পারবে এমন কল্পনা করতে পারি না। সুতরাং হিন্দিকে ইংরেজির আসনে বসাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাকে কেন্দ্রীয় দপ্তরের কাগজপত্র ও আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে বন্ধুতা করে চলতে হবে।

তাই যদি হয় তবে হিন্দিকে সমস্ত ছাত্রের পক্ষে অবশ্য-শিক্ষাণীয় করে তোলবার প্রয়োজন কি? যারা সর্বভারতীয় সরকারি কাজের জন্যে প্রস্তুত হবে একমাত্র তাদের পক্ষেই হিন্দি অবশ্য-শিক্ষণীয় হতে পারে। এমন সময় আসতে খুব বেশি দেরি হবে না, যখন দেশের সকলেই একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হবে। তখন দেখা যাবে শতকরা নব্বই জনের বেশি লোকের পক্ষেই মাতৃভাষার যোগে শিক্ষা সমাপ্ত হবে, তাদের পক্ষে ইংরেজি তথা হিন্দি হবে নিষ্প্রয়োজন। বাকি দশ জনের পক্ষে হিন্দি এবং তার মধ্যে দু-একজনের পক্ষে ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতির প্রয়োজন হবে। এই সামান্য সংখ্যার জন্যে সকলের উপরেই ইংরেজি ও হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া জুলুম নয় কি? বিদেশেও দেখি মাতৃভাষার যোগেই অধিকাংশের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, সামান্যসংখ্যক উচ্চশিক্ষার্থীর পক্ষে অন্য ভাষা শেখা আবশ্যক হয়। আমাদের দেশেও সে আদর্শ চলবে না কেন?

বাংলা ভাষার কথা ধরা যাক। এভাষার জন্ম হয়েছে প্রায় হাজার বছর আগে পাল-সেন রাজাদের আমলে, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে। এই হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষা মুক্তির সন্ধানে পথ খুঁজে চলছে। আজ মুক্তির কাছাকাছি এসেও তার সংশয় ঘুচছে না। কারণটা বুঝিয়ে বলছি। বাংলা ভাষার জন্মলগ্নে এদেশে দুটি ভাষার দ্বৈতরাজ চলছিল—সংস্কৃত ও অপভ্রংশ। রাজকার্য তথা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা চলত সংস্কৃত ভাষায়। সেখানে প্রাকৃতজনের প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রাকৃতজনের জন্যে ছিল সৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষার সাহিত্য। এভাষাও ছিল জনসাধারণের অপরিচিত,

সুতরাং শিক্ষাসাপেক্ষ। শিক্ষাহীন নিম্নতম স্তরের সাহিত্যপিপাসুদের জন্যেই উদ্ভূত হয়েছিল মাতৃভাষার সাহিত্য; অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য। এই সাহিত্যও রচিত হয়েছিল অপভ্রংশেরই আদর্শে। বস্তুতঃ অপভ্রংশ রচয়িতারাই বাংলা সাহিত্যের পত্তন করেন। যা হোক, এ-কথা সত্য যে, তখনকার দিনে বাংলাদেশে সংস্কৃত অপভ্রংশ ও বাংলা ভাষার তিন ধারা চলছিল, আর বাংলার ধারাটাই ছিল ক্ষীণতম ও অবহেলিত। অর্থাৎ তখনও বিমাতৃ মন্দিরেরই এক কোণে ছিল বাংলার স্থান। তারপরে এল তুর্কি-পাঠানের রাজত্বকাল। তারা নিয়ে এল বিদেশি ভাষার প্রবাহ—তুর্কি ফারসি আরবি। ক্রমশঃ ফারসি এসে দখল করল রাজতখ্‌ত। রাজকার্যে সংস্কৃতের স্থান রইল না, সে দখল করল ফারসি। রাজসরকারের কর্মপ্রার্থী হিন্দুরাও ফারসিতে মুনসিয়ানা দেখাতে পিছপা হল না। মক্তব-মাদ্রাসায় চলল আরবি-ফারসির পঠনপাঠন। ওদিকে টোল চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিতরা চালালেন সাহিত্য-দর্শন-স্মৃতি আয়ুর্বেদের চর্চা সংস্কৃত ভাষায়। আর বাংলা থাকল অবহেলিত পল্লীজনের জন্য, তার শিক্ষাব্যবস্থা পাঠশালায়। অর্থাৎ, এ যুগেও তিন ভাষার আধিপত্য, আর বাংলার স্থান সর্বনিম্নে। কিন্তু এ যুগে চৈতন্য-প্রমুখ ধর্মনায়কদের প্রবর্তনায় ও অন্যান্য কারণে জনসচেতনতা প্রবলতর এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কৃপায় বাংলাভাষাও পুষ্টতর হয়েছে।

সর্বশেষে ইংরেজের আমলে ফারসির প্রভাব তিরোহিত এবং সংস্কৃতের প্রভাব ক্ষীণতর হল। তার জায়গায় এল ইংরেজির প্রভাব প্রচণ্ডগতিতে। তার পাশে-পাশে বাংলার স্রোত চলল ক্ষীণবেগে। ইংরেজির প্রভাবে ভালো-মন্দ দু-রকম ফলই হল। কাব্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতি রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা প্রেরণাই জুগিয়েছে, আধিপত্য করেনি। ফলে বাংলা সাহিত্যের এই দিকটা অপ্রত্যাশিভাবে পুষ্টিলাভ করেছে। কিন্তু কর্ম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা বাংলা সাহিত্যকে প্রেরণা না জুগিয়ে তাকে চেপে মারতেই চেষ্টা করেছে। ইংরেজ আমলে বাঙালি যে ইংরেজি সাহিত্য রচনা করেছে, তার বিপুলতা বিস্ময়জনক। ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয়ে বাঙালি যা লিখেছে, তার পৌনে ষোলো আনাই তো ইংরেজিতে এবং বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালি জাতি সে পরিমাণেই বঞ্চিত হয়েছে। রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র যদুনাথ

জগদীশচন্দ্র বাংলা ভাষাকে বঞ্চিতই করেছেন। আর রাজকার্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মের ক্ষেত্রে বাংলা তো প্রবেশাধিকারই পায়নি। একমাত্র রসের ক্ষেত্রে বিচরণ করে একটা ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাকে জ্ঞান এবং কর্মের বাহকও হতে হবে। আশা হচ্ছিল ইংরেজের তিরোধানের ফলে বাংলা ওই দুই ক্ষেত্রেও তার ন্যায্য অধিকার লাভ করবে, হাজার বছরের পরপীড়নের পরে সে এবার জ্ঞান কর্ম ভাব—এই তিন বিভাগেই তার শক্তি ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দেবে। কিন্তু এখনও ইংরেজি তার দৃঢ় মুষ্টি শিথিল করেনি এবং অপরদিকে হিন্দি তার এলাকা প্রসারণ করতে উদ্যত হয়েছে।

আদি যুগে সংস্কৃত ও অপভ্রংশের চাপে বাংলা ছিল সংকুচিত ও সংকীর্ণ। মধ্যযুগে ছিল ফারসি ও সংস্কৃতের প্রভাব, কিন্তু সে প্রভাব ছিল অপেক্ষাকৃত কম; তাই বাংলার প্রসার হল অপেক্ষাকৃত সহজ। তৃতীয় যুগে ইংরেজির চাপ এল বটে, কিন্তু প্রেরণাও এল। ফলে বাংলার পূর্ণবিকাশ বাধা পেল, কিন্তু তার আংশিক বিকাশই হল বিস্ময়কর। বর্তমান যুগে যদি ইংরেজির প্রেরণাটুকু বজায় রেখে তার চাপকে নিরস্ত করা যায়, আর হিন্দিরও স্পর্শ টুকু রেখে তার এলাকাকে যথাস্থানে সীমাবদ্ধ রাখা যায়, তাহলে শুধু বাংলা ভাষারই কল্যাণ হবে না তার প্রভাবে হিন্দি ভাষাও সমৃদ্ধ হবে। আর ভাষার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে মনের মুক্তি ও জাতীয় জীবনের বিকাশ।

সাহিত্যের মুক্তি

সাহিত্যশক্তিই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। কেননা সাহিত্যের মধ্যেই জাতীয় মননশক্তির সমবায় ঘটে। আর মননশক্তিই যে মানুষকে সর্ববিধ জড়শক্তি ও পেশীশক্তির উপরে আধিপত্য দিয়েছে, এ-কথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেখানে মননশক্তির জাগরণ ঘটে না, সেখানে জড়শক্তি ও পেশীশক্তির সংহতি সম্ভব নয়। সাহিত্যই মানুষকে সর্বাধিক মারাত্মক বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে। সাহিত্য যেখানে জাগ্রত ও সক্রিয় নয় সেখানে আত্মবিচ্ছেদের অসংখ্য ফাঁক দিয়ে মানুষের সব শক্তিই নিঃশেষ হয়ে যায়। ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়েই তার প্রমাণ বিকীর্ণ হয়ে আছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে জাতির সাহিত্যশক্তি যত গভীর ও নিবিড় সে জাতি ভীষণতম রাষ্ট্রনৈতিক দুর্যোগের মধ্যেও অভ্যুদয়ের অধিকারী হয়। এই সাহিত্যশক্তিই জাতিকে সর্বতোমুখী মুক্তির পথে প্রেরণা দেয়। ইংরেজ জাতির ইতিহাসই এ-কথার সবচেয়ে সংশয়াতীত সাক্ষ্য বহন করে। সেই ইংরেজ এদেশে এসেছিল একহাতে শাসনদণ্ড এবং আর-এক হাতে সাহিত্য-মুক্তির বাণী নিয়ে। এই বাণী সঞ্চারিত হয়েছিল আমাদের সাহিত্যে। আমাদের মনে যখন থেকে সাহিত্যের শক্তি উদ্যত হয়ে উঠল তখন থেকেই ইংরেজ শাসনশক্তির অবসান সূচিত হয়েছিল, এ-কথা যেন কখনও না ভুলি।

আমাদের দেশে এই সাহিত্যের জাগরণ ঘটেছে, কিন্তু মুক্তি ঘটে নি। কেন ঘটে নি, না ঘটার ফল কি হয়েছে, আর সে মুক্তি ঘটাবার উপায় কি তা ভেবে দেখার সময় বয়ে যাচ্ছে।

মানুষ শুধু প্রাণবান্ জীব নয়, সে মনোবান্। প্রাণী হিসাবে সে জন্মায় স্বদেশের মাটিতে, মনোবান্ জীব হিসাবে তার আবির্ভাব স্বভাষার ভূমিতে। তার প্রাণলীলার ক্ষেত্র স্বদেশের মাটি, আর মনোলীলার প্রকাশ স্বভাষার রঙ্গমঞ্চে। মাতৃভূমির কোলে দেহজীবনের পরিবৃদ্ধি আর মাতৃভাষার আশ্রয়ে আমাদের মনোজীবনের অভিব্যক্তি। দীর্ঘকালের ত্যাগ, সাধনা ও সংগ্রামের ফলে আমাদের মাতৃভূমি সুচিরকালীন বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং আমাদের জননেতারা তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষার বন্ধনদশা মোচনের কোনো পরিকল্পিত প্রয়াস কোথাও দেখতে পাই না। অথচ এ-কথা ধ্রুবসত্য যে, ভাষার মুক্তি ছাড়া শুধু দেশের

মুক্তি আমাদের জাতীয় জীবনে সার্থকতার সন্ধান দিতে পারবে না। মন যেখানে মুক্ত নয়, সেখানে দেহের মুক্তি কি করতে পারে? অমৃতলোকের সন্ধান পেতে হলে মনের মুক্তি চাই। মনে আছে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার যুগে ইংরেজ লাটকে লক্ষ্য করে যেসব গান করা হত, তার একটি লাইন হচ্ছে এই—

'ফুলার, আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন তো স্বাধীন রয়॥'

আজ কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছে তার উলটো কথা।—দেহ মোদের স্বাধীন বটে, মন তো স্বাধীন নয়। সুতরাং আমাদের ভয়ের কারণ আজও রয়েছে। কেননা ইংরেজের প্রভাব গিয়েছে বটে, কিন্তু ইংরেজির প্রভাব যায় নি। যাবার নামও করে না। ইংরেজের শাসন ছিল স্থূল, তাই তার বন্ধন ছেদন কঠিন ছিল না। কিন্তু ইংরেজির শাসন সূক্ষ্ম, যে শিকল দিয়ে সে মনকে বেঁধেছে তা অদৃশ্য, তাই তার বাঁধন কাটার কথা মনেও হয় না। ডাকাতের ভয় দূর করা যায়, কিন্তু ভূতের ভয় কিছুতেই ছাড়ানো যায় না, মনের মজ্জাতে তার আশ্রয়।

ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করা চলে, তাকে কাবু করাও যায়। ভূতের সঙ্গে লড়াই চলে না, তাকে কাবু করাও সম্ভব নয়। ভূতের ভয় থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় দিনের আলোর আশ্রয় গ্রহণ। আজ চিন্তাহীনতার গাঢ় অন্ধকার আমাদের মনকে চারদিক থেকে কেবলই বিভীষিকা দেখাচ্ছে। কবে যে আমাদের মনের পূর্ব দিগন্তে জ্ঞানের আলো ঝিকিয়ে উঠে সব বিভীষিকার অবসান ঘটাবে, তারই প্রতীক্ষায় আছি।

এ-কথা আমরা ভুলে যাই যে, মানুষের জীবনযাত্রার ন্যায় একটা মননযাত্রাও আছে। যদি না থাকত, তবে আমরা চিরকালের জন্য ইতিহাসের আদিম পর্বেই থেকে যেতাম। এমন কি, ডারউইনের থিওরিও কিছুদুর পর্যন্ত সত্য হয়ে আর এগোতে পারত না। পশুদেরই আছে একমাত্র জীবনযাত্রা, সেই পশু যেদিন মননযাত্রার পথে পা বাড়াল, সেদিন থেকেই মানুষের যথার্থ আবির্ভাব। জীবনযাত্রার এক চাকার গতি অস্থির, সেই চাকায় চড়ে ভবিতব্যতার অভিমুখে যারা যাত্রা করেছিল, কালের মোড়ে-মোড়েই তাদের পতন ঘটেছে; ইতিহাস-পথের আশেপাশে তাদের কঙ্কালাবশেষ আজও মাঝে-মাঝেই আমাদের চোখে পড়ে। নিছক জীবনের সঙ্গে মননকে জুড়ে দিয়ে মানুষ যেদিন দুই চাকার রথে

চড়ে বসল, সেদিন থেকেই তার অগ্রগতি সুস্থির অথচ দ্রুত হয়ে উঠল। এক চাকার আবর্তনে শুধু গতিই আছে, স্থিতি নেই; প্রতি মুহূর্তেই তার পতনের আশঙ্কা। দুই চাকার রথের আরোহী স্থির থেকেও গতিশীল; তার অতিক্রমণে স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য থাকে। মুহুর্মুহু পতনের আশঙ্কা তার মনকে নিত্য বিচলিত করে না। জীবন ও মননের দুই চাকার রথে চড়ে মানুষ যেদিন ইতিহাসের বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু করল, সেদিন থেকে

স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে;
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

সেদিন থেকে মানুষ স্থির থেকেও নিত্যবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। জীবন ও মননের সমন্বয়েই আসে স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য। মানুষের রথচক্র যে ওই সমন্বয়ের পথ থেকে রেখামাত্রও বিচলিত না হয়ে কল্যাণের দিকে নিত্য এগিয়ে চলেছে, এমন কথা বলছি না। দেশে দেশে যুগে যুগে ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে তার বহু ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত আছে। যেখানেই জীবন ও মননের সমন্বয়ের ত্রুটি ঘটেছে, সেখানেই দেখা দিয়েছে মানুষের দুর্গতি। কোথাও তার রথগতি অবলীত বেগলাভ করে ইতিহাসের কোনো মোড়ে এসে মানুষকে বিনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। জানি না আজ পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে তারই পুনরাবৃত্তির পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে কিনা। কোথাও জীবন-মননের সমন্বয় ব্যাহত হয়ে ইতিহাস-পথের মাঝখানেই রথের চাকা ভেঙে গিয়ে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, যেমন হয়েছে আমাদের এই ভারতবর্ষে। ওই চাকা-ভাঙা রথে বসেই আমরা কিছুকাল যাবৎ তারস্বরে নানারকম আস্ফালন করছি, যারা আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, পরুষকণ্ঠে গালাগালি করেও তাদের নাগাল পাবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না—অবশেষে হতাশ হয়ে দ্রাক্ষালুব্ধ বিফলকাম শৃগালের মতোই বলছি, যারা দ্রুত এগিয়ে গেল, ঐতিহাসিক বিনাশের মধ্যেই তাদের শেষ পরিণতি। আবার আমরা কেউ-কেউ ঐতিহাসিক গতিলাভের আশায় রথের মুখটাকে অতীতের দিকে ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ভাঙা চাকা ধরেও কম টানাটানি করি নি। বঙ্কিম-ভূদেব-রাজনারায়ণের আমল থেকে এই সেদিন পর্যন্তও এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা কি করুণ দৃশ্যেরই অবতারণা করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। সুখের বিষয় অবশেষে আমাদের নেতাদের দৃষ্টি পড়েছে রথের ভাঙা চাকার দিকে। রব উঠেছে চাকা মেরামত করা চাই, চাকা মেরামত করা

চাই।' তার জন্য বহুমহলা পরিকল্পনাও রচিত হয়েছে, ভাঙা চাকাতে হাত লাগানোও হয়েছে। কিন্তু কোন্ চাকাটাতে ; জীবনের না মননের ? কোন্ চাকা ভেঙে যাওয়ার ফলে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির রথ ইতিহাসের মধ্যপথে এমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ? আমি বলি আমাদের মননের চাকাটাই বিকল হয়ে গিয়েছিল, তাই জীবনের চাকাটাও স্তব্ধ অচল হয়ে পড়েছে। ইতিহাসই এই সত্যের সাক্ষী। কিন্তু এখানে ওই সাক্ষীকে জেরা করবার সময় আমাদের নেই। সুতরাং আমাদের মনন-চাকার বিকলতার কথাই সত্য বলে মেনে নেব। কিন্তু আমাদের নেতাদের মুখে কি কথা শুনছি ? আমরা কি নিত্যই শুনছি না যে, আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে, নতুবা আমাদের বাঁচোয়া নেই ; আমাদের বাঁচনের মান standard of living বড়ই নীচু, তাকে উঁচু করতেই হবে, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ইত্যাদি। আমরা যাকে বাঁচন বলি, সেটা এদেশের মরণের পর্যায়েই নেমে এসেছে, তার প্রতিকার চাই— এ-কথা কে অস্বীকার করবে ? কিন্তু কি উপায়ে ? রোগী জীবনশক্তি হারিয়ে মুমূর্ষু দশায় এসে পৌঁচেছে। তাকে বেশি করে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে, না তার রোগের বীজ নষ্ট করতে হবে ? বস্তুতঃ তাকে পথ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে ওষুধ দিয়ে তার রোগ দূর করতে হবে। এটাই হচ্ছে তার বাঁচবার, বলিষ্ঠ হবার একমাত্র উপায়, অন্য পথ নেই। আমাদেরও আজ ওষুধ-পথ্য দুই চাই ; তা না করে শুধু ভূরিভোজনের ব্যবস্থায় মন দিলে প্রত্যবায়ই ঘটবে। আমাদের দেশে আজ জীবনের মান এত নেমে গেছে, কারণ মননের কোনো মানই নেই। যদি জীবনের মান রক্ষা করতে চাই, তাহলে প্রথমেই মননের মান বাড়াতে হবে। পশ্চিম ভূখণ্ডে মানুষ মনন ও বুদ্ধির বলে দেশকালের ব্যবধানকে প্রায় শেষ করে এনেছে। আর আমরা অমনন ও অবুদ্ধির সহায়তায় জীবন-মরণের ব্যবধানকেই প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছি—এটাই আমাদের চরম কৃতিত্ব। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমাদের এই কৃতিত্বের কথাই অক্ষয় হয়ে রয়েছে। অথচ আমাদের দেশে একদিন মনন ও বুদ্ধির গৌরব দৃঢ়স্বরে ঘোষিত হয়েছিল। ইংরেজি প্রবাদে আছে, জ্ঞানই বল। বস্তুতঃ জ্ঞানবলের চেয়ে বড় বল আর কিছু নেই। আমাদের দেশের বালক-পাঠ্য হিতোপদেশ গ্রন্থেও অনুরূপ কথা আছে।—

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ॥

এই হিতবাক্যে আমরা কর্ণপাতও করি নি, ফলে সিংহ-শশকের অলীক গল্প

ঐতিহাসিক সত্যের রূপ নিয়ে আমাদের কাছে সমুপস্থিত হল। ইংরেজ-শশক ভারত-সিংহকে বুদ্ধিবলে পর্যুদস্ত করে প্রায় দুশো বৎসর রাজত্ব করে গেল। তবু কি আমাদের চেতনা হয়েছে? এই যুক্তিতেও যদি প্রত্যয় সঞ্চার করতে না পারি তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে আপ্তবাক্যের আশ্রয় নিতে হবে। (কিন্তু ভয়ে ভয়ে, কেননা শাস্ত্রবাক্যকে অনেক সময়েই ভেলকির অরেকল বা ম্যাকবেথের ডাইনি-বচনের ন্যায় বিভিন্নার্থে গ্রহণ করা যায়, আর যে সমুদ্র মন্থন করে বিপরীতার্থক বাক্যরাশির উদ্ধার করা না যায় তা শাস্ত্রপদবাচ্যই নয়।) উপনিষদে বলা হয়েছে—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে।" পরমার্থিক কল্যাণ লাভের সহায় যে পরাবিদ্যা তাকেই এখানে বলা হয়েছে অবিদ্যা। এই মৃত্যুবরণ অপরা বিদ্যার প্রসাদেই প্রতীচ্য জনপদবাসীরা অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হয়েছে। আর আমরা ঐহিক অপরা বিদ্যাকে অস্বীকার করে পরাবিদ্যার কৃপায় এক ধাপেই অমৃতলোক প্রাপ্তির অত্যাকাঙ্ক্ষায় ও দুশ্চেষ্টায় একেবারে মৃত্যুলোকের কিনারায় এসে অবতীর্ণ হয়েছি। তাই তো আমাদের কবিকে প্রাচীন ভারতের কাছে ব্যাকুলচিত্তে প্রার্থনা জানাতে হয়েছে—

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

মৃত্যুতরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইহনিষ্ঠ অপরাবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ। এই অপরাবিদ্যার প্রসাদ লাভ বুদ্ধিচর্চাসাপেক্ষ। অথচ 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর' ইত্যাদি আরামপ্রদ মিঠে বুলির সাহায্যে বিশ্বাস, ভক্তি ও মোহের দেশজোড়া কাঁথা চাপা দিয়ে আমাদের খোকা-বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছি আর গুন্‌গুন্ সুরে কেবলি বলছি—

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

খাজনা দিতে হচ্ছে দারিদ্র্য দিয়ে, দুর্ভিক্ষ দিয়ে, মহামারী দিয়ে। অথচ একদিন ভারতবর্ষ যখন সজীব ছিল, জাগ্রত ছিল, উদ্যত ছিল, তখন এদেশে অবিদ্যার চর্চা ছিল নিরন্তর, বুদ্ধির শিখা ছিল অনির্বাণ। তাই তো গীতিকার বলেছেন—

'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'

কেননা,

'বুদ্ধিনাশৎ প্রণশ্যতি'।

বুদ্ধির শরণ গ্রহণ করো, নতুবা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আজ যে আমরা সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি তার মূলে রয়েছে বুদ্ধিচর্চার প্রতি দীর্ঘকালব্যাপী বিমুখতা। আবার আপ্তবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করি। রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে ঋষিবাক্যতুল্য বলেই মনে করি। তাই আপ্তবাক্য হিসাবে তাঁর উক্তিই উদ্‌ধৃত করছি।—

'বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্‌কার আছে 'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ', যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে। শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে সংযুক্ত করুন।"

ভগবানের কাছে এই যে বুদ্ধির বর প্রার্থনা, তার কারণ অবুদ্ধিই আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্গতির মূল।

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে যেন করিতে পারি জয়।'

ভগবান নিজে এসে মানুষকে রক্ষা করেন না, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণা দিয়েই তাকে রক্ষা করেন। বিপদ্‌কে জয় করবার একমাত্র আয়ুধ হচ্ছে বুদ্ধি, হিতোপদেশের এই হিতবাক্য আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি। বুদ্ধিহীনকে যে স্বয়ং বিধাতাও সৌভাগ্য দান করতে পারেন না, এ-কথা হরপার্বতী, সংবাদের সুপরিচিত কাহিনীতেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। করতলগত সৌভাগ্যও যে বুদ্ধির দোষে ফসকে যেতে পারে, সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতাকে বাঁচাতে হলে এ-কথা যেন আমরা কিছুতেই না ভুলি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি 'সাধারণ'-বাণী আজ আমাদের বিশেষ করে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। তাঁর উক্তি এই—

'সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তাঁর কাছে হাত জোড় করে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার বিধিবিরুদ্ধ ভয়ংকর ফাঁকটাকে কখনও পাঠান, কখনও মোগল, কখনও ইংরেজ এসে পূর্ণ করে বসেছে। বাইরে থেকে এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ্য…বুদ্ধিকে

না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। জীবনযাত্রার পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যেস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাঁদের ঢেকিলীলার শাস্তি হবে না, সুতরাং পরপদ-পীড়নের তালে তালে মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্তন ঘটবে—এইমাত্র প্রভেদ।'
—'কালান্তর', সমস্যা

ভয়ংকর অপ্রিয় কথা, কিন্তু সত্য। সেইজন্য বিশেষ করে স্মরণীয়। অপ্রিয় কথা শোনাবার মতো হিতৈষী জগতে দুর্লভ।

আজ ভৌগোলিক ভারতবর্ষ পরবশতার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু সংস্কৃতিগত চেতনাময় ভারতবর্ষে পরবশতার অবসান ঘটেছে কি? সেখানে কি এখনও মনুমান্ধাতার সমাজবিধান, কোরানশরিয়তের ধর্মনির্দেশ ও ইংরেজের চিন্তাভাবনার অদৃশ্য রাজত্ব একসঙ্গেই চলেছে না? এই অদৃশ্য রাজত্বের সাংঘাতিক পীড়নের অবসান ঘটাতে হলে দীপ্ত বুদ্ধির শাণিত অস্ত্রকে কোষমুক্ত করতে হবে। কেননা, চিত্তরাজ্যে যেখানেই আমরা বুদ্ধিকে মানব সেখানেই আমরা স্বাধীন হব। "সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।" আমাদের চিত্তরাজ্য থেকে সর্বদুঃখের মূল পরবশ্যতার অবসান ও সর্বসুখের উৎস আত্মবশ্যতার অভ্যুদয় ঘটাতে হলে চাই বুদ্ধির জাগরণ, চাই সর্বতোমুখী মননশক্তির বিকাশ। বোধিদ্রুমতলে নিরন্তন ধ্যানসাধনান্তে সত্যবুদ্ধির মহাজাগরণের ফলে যে মহাপুরুষ 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হয়েছেন তাঁর বাণীও আজ স্মরণীয়, তিনিও আত্মনিষ্ঠতা মননপরায়ণতার আদর্শের কথাই ভারতীয় ইতিহাসের ভাণ্ডারে চিরকালের জন্য সঞ্চিত করে গেছেন। তাঁর শেষবাণী হচ্ছে—আত্মশরণো ভব, অনন্যশরণো ভব। নিজেই নিজের শরণ নাও, আর কারও শরণ প্রার্থনা কোরো না। তিনি বলেছেন—

অত্তা হি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরোসিয়া।
অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং॥

—ধর্মপদ। ১২/৪

অর্থাৎ, নিজেই নিজের প্রভু, তা ছাড়া আর কে প্রভু থাকতে পারে? যিনি নিজেকে আয়ত্ত করতে পারেন, তিনিই দুর্লভ প্রভুত্বের অধিকারী হন।

গীতাতেও অনুরূপ উক্তি আছে (৬/৫) এর চেয়ে মহত্তর স্বাধীনতার বা আত্মবশ্যতার আদর্শ আর কি হতে পারে? এই যথার্থ স্বাধীনতা প্রাপ্তির

উপায় কি? উপায় মননশক্তির আশ্রয় গ্রহণ। কেননা "মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।' অর্থাৎ 'মন আগে, ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে' (রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ)। বুদ্ধের বাণী সংগৃহীত হয়েছে যে গ্রন্থে তার নাম 'ধম্মপদ'। ধম্মপদ বৌদ্ধজগতের গীতা। উদ্‌ধৃত লাইনটি ওই ধম্মপদ গ্রন্থের প্রথম উক্তি। ধম্মপদের প্রথম দুই শ্লোকের মর্মার্থ এই—

গোরুর গাড়ির চাকা যেমন গোরুর পায়ের অনুসরণ করে, দুঃখও তেমনি প্রদুষ্ট মনের অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে ছায়া যেমন কায়ার অনুবর্তী হয়, সুখও তেমনি প্রসন্ন মনের অনুগামী হয়। সুতরাং যথার্থ সুখ অর্জন করতে হলে মোহের আবিলতা ঘুচিয়ে মনের প্রসন্নতা, বুদ্ধির নির্মলতা বিধান করা চাই। তাই বলছিলাম দেশের সুখসম্পদের মান বাড়াতে হলে বুদ্ধির ও মননের মান বাড়াতে হবে। **Standard of thinking** না বাড়ালে **standard of living** কখনও বাড়তে পারে না। অনেক সময় শুনতে পাই জীবনের মান বাড়লেই মননের মানও বাড়বে। এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা তা সত্য নয়। নিছক জৈব জীবন তথা বর্বরতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত যে মানবজীবন, তা মননের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তার উলটোটা সত্য নয়, অর্থাৎ জীবনের মানবৃদ্ধির দ্বারাই মানুষের মনন নিয়ন্ত্রিত হয় না। যদি হত তাহলে জীবন স্ফূর্তিতে ভরা আদিম অধিবাসীদের কিংবা অফুরন্ত সচ্ছলতার মধ্যে পরিবর্ধিত ঐতিহাসিক অভিজাত সম্প্রদায়ের মননের বিকাশ ঘটত সব চেয়ে বেশি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, আধুনিক কালের পাশ্চাত্ত্য জগতে মননশক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলেই সেখানে জীবনমানেরও এমন অভাবিতপূর্ব উন্নয়ন ঘটতে পেরেছে। ট্রেন-স্টীমার-এরোপ্লেন-সিনেমা-রেডিও প্রভৃতি যেসব সরঞ্জাম মানুষের জীবনমানের ক্ষেত্রে এমন অবিশ্বাস্যরকম বিপ্লব ঘটিয়েছে, তা তো মনন-বিকাশেরই প্রত্যক্ষ ফল, জীবনশক্তির নয়। জীবনকে উপবাসী রেখে জীর্ণ দশায় এনে ফেলে মননের উন্নয়ন করতে হবে এমন বাতুলতা আমি করছি না, এ-কথা বলাই বাহুল্য। আমি বলছি সভ্যতার সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জাম আমদানি করলেই দেশে মননের উন্নয়ন হবে না, অন্তরের স্বাধীনতা আসবে না; আর তা না হলে আমাদের দুঃখরজনীরও অবসান হবে না। কেননা, যে আত্মবশ্যতা সর্বসুখের উৎস তারই নামান্তর অন্তরের স্বাধীনতা, ইউরোপের মননশক্তি-প্রসূত আধুনিক সভ্যতার সমস্ত উপকরণই আজ অসভ্য বর্বর আদিম অধি-বাসীদেরও ভোগে লাগছে। তারাও ট্রেনে চড়ছে, টেলিগ্রাম পাচ্ছে, রেডিও

শুনছে, সিনেমা দেখছে, এমন কি, তারা ওসব যন্ত্রপাতি চালনাও করছে। কিন্তু তা বলেই তারা যে সভ্যতারও অধিকারী হয়েছে এ-কথা বলা মোটেই চলে না। আসলে তারাও ওই যন্ত্রপাতির অঙ্গবিশেষে পরিণত হয়েছে এবং পরের নির্দেশে চালিত হচ্ছে। অতএব ভেবে দেখতে হবে আমাদের দেশে এই যে বহুবিধ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছে, তাতে সত্যই আমাদের দুঃখদারিদ্র্যের অবসান হবে কি না। আর যাই হোক, তাতে মনের দারিদ্র্য ঘুচবে না; আর মনের দৈন্য যতদিন থাকবে ততদিন দুঃখ-লাঞ্ছনাও আমাদের ছাড়বে না। সভ্যতার সাজসরঞ্জাম আমদানি বা উৎপাদন যতই হোক-না কেন, আমাকে বলতেই হবে, 'এহ বাহ্য আগে কহ আর', 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' সভ্যতার সম্পদ আর চিত্তের সমৃদ্ধি এক কথা নয়। তাই তো প্রত্যক্ষতঃই দেখতে পাচ্ছি বর্তমান জগতের মানসসরসী তীরে আধুনিক কালের অলকাপুরী আমেরিকাতেও।

মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।

নতুবা মর্ত্যজগতের এই আমেরিকা-পুরীতেও আত্মহত্যার হিড়িক এখন নিত্য-ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল কেন? বস্তুতঃ বাইরের সম্পদে চিত্তের দৈন্য ঘোচে না, আর চিত্তের দীনতা না ঘুচলে দুঃখদুর্গতিরও অবসান নেই। অন্তরের সম্পদ, চিন্তার স্বাধীনতা যার নেই, রাজাসনে বসেও সে স্বাধীন হয় না। এইজন্যই ইংরেজ রাজত্বের অবসানে দেশব্যাপী স্বাধীনতার মধ্যে থেকেও আমরা যথার্থ স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছি না। বুদ্ধদেব বলেছেন, মানুষের জিভ স্পর্শমাত্রই সুপরসের স্বাদ পায়, কিন্তু কাষ্ঠময় বা তৈজসদর্বী সুপরসের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও তার স্বাদ পায় না, কারণ সে শক্তিই তার নেই। আমাদের সেই দশা। অহরহ স্বাধীনতার মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও আমাদের নির্জীব মন মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে না। তাই বলছিলাম, আমাদের মনকে সজীব করে তোলা চাই। সচেতন করে তোলা চাই। মননশক্তিকে সক্রিয় করে তোলা চাই। তাহলেই আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পাব, তার সদ্‌ব্যবহার করতে পারব। নতুবা শরের গলায় মুক্তাহারের মতোই সে স্বাধীনতা আমাদের কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমরা স্বাধীন হয়েছি এবং নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থাও গঠন করেছি। সে রাষ্ট্রের লক্ষ্য জনকল্যাণ এবং কল্যাণসাধনের কাজও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু

জনকল্যাণের শ্রেষ্ঠ উপায় কি এবং কোন্ রাষ্ট্রকে আদর্শ রাষ্ট্র বলে স্বীকার করব? এই আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্‌ধৃত করি।—

"আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি, যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখি নি। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই। এই প্রয়াস কখন থেকে পাশ্চাত্ত্য দেশে বললাভ করেছে? যখন থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুলপরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে সংসার যাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার করতে সাহস করেছে তখন থেকেই জনসাধারণ…মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর করতে চেষ্টা করছে।" —'কালান্তর', সমাধান

রাষ্ট্রনীতির এই আদর্শকে বলা যায় সর্বোদয়ের আদর্শ। কিন্তু তা সর্বজনের সেবা করে নয়, তাকে সুখসম্পদ্ দান করে নয়, সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধিকে জাগ্রত করে, তার আত্মবিশ্বাসকে উদ্‌বুদ্ধ করে। সর্বজনকে স্বাধীন বুদ্ধির অধিকারী করেই তাকে স্বায়ত্তশাসনের ও যথার্থ মুক্তির স্বাদ দিতে হবে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের জনকল্যাণপ্রচেষ্টার মধ্যে বুদ্ধি জাগাবার কোনো অভিপ্রায় দেখতে পাই না। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের যোগে সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসাদ বিতরণের ব্যাপক অভিপ্রায় নেতাদের চিত্তকে অধিকার করেছে। কিন্তু জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি খোলবার অভিপ্রায় দেখি না। অথচ বৈজ্ঞানিক সম্পদ্‌লাভের চেয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিলাভ বহুগুণে শ্রেয়ঃ। কেননা, ওই দৃষ্টিলাভের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ স্বাধীনতার কল্যাণ-সম্পদ্।

বাংলা দেশে দামোদর-ময়ূরাক্ষীয় জলস্রোতকে বিজ্ঞানের শৃঙ্খলে বেঁধে তার যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা দেশের মাটিকে শ্যামল করে সম্পদ্‌বৃদ্ধির যে সাধু প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে তা সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু ওদিকে আমাদের গ্রামে-গ্রামে সমাজের স্তরে-স্তরে চিত্তস্রোত শুকিয়ে গিয়ে দেশব্যাপী অনুর্বরতার অভিশাপ যে সমগ্র জাতিকে মানসিক নিত্য-দুর্ভিক্ষের কবলে নিক্ষেপ করছে, তার প্রতিকারের কোনো প্রত্যক্ষ চেষ্টা কোথাও দেখতে পাই না। নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে দেশকে শস্যসম্পদ্‌শালী ও লোকালয়কে বৈদ্যুতিক আলোতে আলোকিত করা চাই বইকি। কিন্তু জনসাধারণের মনস্রোতকেও তেমনি পরিকল্পিত উপায়ে

কাজে লাগিয়ে জাতীয় চিত্তভূমিকে সমৃদ্ধ ও সর্বজনের মনের কক্ষকে বুদ্ধির দীপ্তিতে আলোকিত করা চাই। বরং এই মননশক্তির উদ্‌বোধনই চাই সর্বাগ্রে। কেননা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশক্তি চালনার মূলেও থাকে মননশক্তিরই ক্রিয়া। মননশক্তিকে যথোচিতভাবে উদ্‌বুদ্ধ না করে যন্ত্রশক্তিকে চালাতে গেলে বিভ্রাট্ও ঘটতে পারে, অন্ততঃপক্ষে যন্ত্ররাজ বিভূতির প্রসাদও যে পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায় না এটা নিঃসন্দেহ।

সুতরাং যথার্থভাবে জনকল্যাণ করতে হলে দেশের মননশক্তিকে, বুদ্ধিশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে, তাকে কাজে লাগাতে হবে। তার উপায় কি? তার উপায় শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার এবং সাহিত্যের মুক্তিবিধান। শিক্ষা ও সাহিত্য অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার হলেই সাহিত্যেরও উন্নতি ও প্রসার ঘটে, কার্যকারণ সম্বন্ধের জোরেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটতে পারে নি, ইংরেজের প্রভাবে ও ইংরেজির মোহে। বিষয়টা আরও একটু খুলে বলা দরকার।

মুখ্যতঃ মানুষের মননশক্তির উদ্‌বোধনের নামই শিক্ষা আর মানুষের মনন-সম্পদের চিরন্তন ভাণ্ডারের নামই সাহিত্য। সুতরাং, এ-দুটি যে পরস্পর-নিরপেক্ষ হতে পারে না এ-কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের শিক্ষার দোষত্রুটি ও অপূর্ণতার ফলেই সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে নি। এখানেই বলে রাখছি, সাহিত্য বলতে আমি শুধু রসসাহিত্যই বুঝি না, ব্যাপকার্থে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বপ্রকার মননসম্পদ্‌কেই আমি সাহিত্য বলে গণ্য করি। এই ব্যাপকার্থ গ্রহণ যে অন্যায় নয়, এ-কথা সমর্থনে আমাদের সাহিত্য-সম্মেলনগুলির ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

আগে শিক্ষার কথাই বলি। আমাদের শিক্ষার প্রধান দোষ দুটি—তার অগভীরতা ও সংকীর্ণতা। আমরা যে শিক্ষা পাই তা সাধারণতঃ ব্যবহারিকতার বাহ্য প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে না, চিত্তকে সুনিয়ন্ত্রিত করে না এবং চরিত্রকেও গঠন করে না? তাছাড়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিক্ থেকেও যে শিক্ষা সংকীর্ণ, আর সমাজগত ব্যাপ্তির দিক্ থেকেও তা নেহাতই অপরিসর—এ শিক্ষা সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরের অল্প কয়েকজন মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ষোল আনার পনেরো আনা লোকই এই ত্রুটিপূর্ণ

শিক্ষার আলো থেকেও বঞ্চিত। শিক্ষার এই দ্বিবিধ দোষেরই মূল কারণ একটি—বৈদেশিক ইংরেজি ভাষার মধ্যস্থতা। দুর্বোধ্য বেদমন্ত্রের মধ্যস্থতা যেমন ভক্ত ও ভগবানের প্রত্যক্ষ যোগের অন্তরায় ঘটায়, ইংরেজির মধ্যস্থতাও তেমনি শিক্ষণীয় ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ঘটায়। ফলে এই কৃত্রিম শিক্ষা আমাদের ব্যবহারে যদি বা লাগে, মর্মে কখনও লাগে না। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত মন্ত্রের মতোই ইংরেজি বিদ্যাও আমাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর এক দুস্তর বিচ্ছেদ রচনা করেছে। ফলে আমরা 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর'। আমাদের শিক্ষিত সমাজের কাছে ইংরেজই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ঘরের কাছে অশিক্ষিত প্রতিবেশীরা দূরবর্তী গ্রহের চেয়েও দূরবর্তী —দূরবীণ লাগিয়েও তাদের হৃদয়ের দেখা আমরা পাই নে। যে দেশে শিক্ষার এই অবস্থা সে দেশের সাহিত্যের অবস্থাও যে ভালো হতে পারে না, তা সহজেই বোঝা যায়। রোগী যখন মরণদশায় পড়েও রোগের যন্ত্রণা বোঝে না, তখনই তার অবস্থা হয় শোচনীয়। আমাদেরও প্রায় সেই অবস্থা। আমরা বাংলা-সাহিত্য নিয়ে গর্ব করি। কিন্তু তার গলদ যে কোথায় তা বুঝতেও পারি না, প্রতিকারের চেষ্টা তো কল্পনারও অতীত।

সাহিত্য মানুষের শিক্ষা তথা মনোজগতেরই প্রতিরূপ। শিক্ষায় ও মননেই যেখানে গলদ রয়েছে, সাহিত্য সেখানে পূর্ণাঙ্গ হতেই পারে না। বাংলা-সাহিত্যকে একটুখানি পরখ করলেই তার অভাব ধরা পড়ে। প্রথমতঃ, তার অব্যাপ্তি, যে বাংলা সাহিত্যের আমরা গর্ব করি, তা কয়জন বাঙালির সম্পদ্? শতকরা পাঁচজনেরও কিনা সন্দেহ। তাই যদি হয়, তবে এই সাহিত্য বাঙালি জাতির কোন্ কল্যাণসাধন করবে? বাংলাসাহিত্যকে বাংলা দেশের সর্ব-সাধারণের সম্পদ্ করে তোলা চাই। নতুবা এ সাহিত্য আমাদের বাঁচাতে পারবে না। যেসব বড়-বড় জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তার তলাটা হালকা হলে চলে না। সেসব জাহাজের তলায় ভারী মাল বোঝাই করে জাহাজকে গভীর জলের মধ্যে স্থিতিদান করা হয়। তলা ভারী না হলে অর্থাৎ ব্যালাস্ট না থাকলে মাথাভারী জাহাজ ঝড়-তুফানের আঘাত সইতে পারে না, সহজেই কাত হয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। আমাদের মাথাভারী বাংলাসাহিত্যেরও সেই দশা। তার তলায় ব্যালাস্ট নেই, জনসাধারণের হৃদয়ের গভীরতায় তার প্রবেশ বা প্রতিষ্ঠা নেই। এই অবস্থায় আমাদের জাতীয় জীবনে যদি কখনও দুর্যোগ দেখা দেয়, তা হলে এ সাহিত্যও

রক্ষা পাবে না, আমাদেরও সে রক্ষা করতে পারবে না—এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলাসাহিত্যের ভিত্তিপরিসরও বড়ই সঙ্কীর্ণ। একে সাহিত্য-সৌধ বা সাহিত্যপিরামিড না বলে সাহিত্যস্তম্ভ বলাই ভালো। কীর্তিস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু কীর্তিসৌধ কখনও নয়। সমগ্র জাতীয় চিত্তকে আশ্রয় দেবার মতো প্রশস্ত কক্ষ তার নেই। কেননা, বাংলাসাহিত্য একাঙ্গীন; একমাত্র কবিকল্পনাকে আশ্রয় করেই সে স্তম্ভের মত একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরিধিও খুব বেশি নয়। একমাত্র রসচর্চাকেই সে আশ্রয় করেছে, মননকে সে এখনও স্বীকার করতে পারে নি। বহু-মহলা ইংরেজি সাহিত্যে মননের বিভিন্ন রত্নকক্ষে যে অজস্র সম্পদের সন্ধান মেলে, বাংলা সাহিত্যে তা আমরা আশাও করি না। কেননা, আমরা ধরেই নিয়েছি যে, বাংলায় শুধু কাব্য গল্প ও নাটকই হতে পারে, উচ্চাঙ্গের মননসাহিত্য রচনা করতে হলেই ইংরেজির আশ্রয় নিতে হবে। কেন এমন হল? হল এইজন্য যে, উচ্চশিক্ষায় এখনও আমরা বাংলাকে একমাত্র রসসাহিত্যের কোঠাতেই এক-ঘরে করে রেখেছি—ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের কক্ষে তার প্রবেশাধিকার নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে নরশার্দুল আশুতোষের যে মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তার গায়ে লিপিবদ্ধ আছে এই প্রশস্তিবচন—

His noblest achievement, surest of all
The place of his mother-tongue in step-mother's hall.

আমাদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির যে আমাদের বিমাতার অর্থাৎ ইংরেজিরই মন্দির, একথা অসংকোচেই স্বীকার করা হয়েছে। তারই এক কোণে দীনা মাতৃভাষার একটুখানি স্থান করে দিয়েছেন, এটাই আশুতোষের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজের রাজত্বকালে এটুকু করাতেও যথেষ্ট দুঃসাহসের প্রয়োজন হয়েছিল একথা স্বীকার করি। কিন্তু আজও যে আমরা ঐশ্বর্যশালিনী বিদেশিনী বিমাতার ষোড়শোপচার পূজার্চনার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে তার পদপ্রান্তে দীনা মাতৃভাষাকে (যার স্তন্যরসে আমাদের জীবন-মন গঠিত হয়েছে) একটুখানি আশ্রয় দিয়েই পরিতৃপ্ত রয়েছি, তার চেয়ে কলঙ্কের বিষয় আর কি হতে পারে? মাতৃ-অবমাননা ও বিমাতৃ-বন্দনার এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি?

মননসাহিত্য চর্চা ও রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার এই যে অতিপ্রাধান্য

তার হেতু কি? প্রথম হেতু ইংরেজের স্বীকৃতি। রাজার জাতির স্বীকৃতিতে উৎসাহিত হয়ে আমরা শতাধিক বৎসর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত চর্চাই বিদেশি বিমাতৃভাষাতেই করে এসেছি। দ্বিতীয় কারণ আমাদের মনের জড়তা। জড়ের প্রধান ধর্ম এই যে, কোনো শক্তি তাকে একবার যেদিকে গতি দান করে, সে নিজের শক্তিতে তার থেকে নিবৃত্ত হয়ে অন্য পথ ধরতে পারে না। ইংরেজের হাতের অর্থাৎ মেকলের হাতের ঠেলা খেয়ে আমাদের মন শতাধিক বৎসর ধরে যে-পথে চলেছে, নিজের জড়তাবশতঃ সে ও-পথ ছেড়ে অন্য পথ বেছে নেবার কথা ভাবতেও পারে না। বরঞ্চ সেই অভ্যস্ত পথকে আঁকড়ে থাকবার অনুকূলেই নানা যুক্তির অবতারণাও করে। তার মধ্যে প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, ইংরেজিই সমস্ত ভারতবর্ষকে ঐক্যদান করেছে এবং ইংরেজিই সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করেছে। ইংরেজির আশ্রয় ত্যাগ করলে ভারতীয় ঐক্য এবং বিশ্বের সঙ্গে যোগ নষ্ট হবে, আর তাতেই ঘটবে আমাদের মহতী বিনষ্টি। ছোট কাপড়ে মোটা দেহের একাংশ ঢাকতে গেলে অপরাংশ ফাঁক হয়ে যায়। এই যুক্তিও সেই রকম। এই যুক্তিতে এক সমস্যা ঘোচাতে গিয়ে যে আর-এক সমস্যার সৃষ্টি করছি, সে কথা আমরা ভুলেই যাই। ইংরেজির সাহায্যে ভারতবর্ষের ঐক্যবিধান করতে গিয়ে বাঙালির ঐক্যকে যে নষ্ট করছি, বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে স্বদেশবাসীর সঙ্গে যে বিযুক্ত হচ্ছি, সেদিকে আমাদের খেয়ালই নেই। ঈশপের গল্পে যে জ্যোতির্বিদ্ আকাশের নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, তারই দুর্দশা যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সে কথা ভাববার অবকাশও আমাদের নেই। ইংরেজির ঊর্ধ্ব গগনে জ্যোতিষ্করাজির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে আমরা যে স্বদেশের নিম্ন-ভূমিতে বিনাশের ভয়ংকর ফাঁকটার দিকেই পা বাড়াচ্ছি, সেদিকে হুঁশ নেই। বিশ্বের সঙ্গে যোগ রাখবার, ভারতবর্ষের ঐক্যবিধানের লোভে স্বদেশবাসীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিনাশলাভের অদ্বিতীয় মহৎ দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রেখে যাবার জন্য বাঙালির আবির্ভাব হয়েছে, একথা বিশ্বাস করতে পারি না।

বাংলায় রসসাহিত্য রচিত হবে মাতৃভাষায়, আর মননসাহিত্য রচিত হবে বিমাতৃভাষায়, এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ আর কতদিন চলবে? হৃদয় আর মস্তিষ্কের বিচ্ছেদ যে জীবনের পক্ষেই মারাত্মক, একথা যেন না ভুলি। মনন-সাহিত্যের যথোচিত বিকাশ না হলে রোচনসাহিত্যও যে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, একথাও কি বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে? গাছের শিকড় যদি যথেষ্ট পরিমাণে

খাদ্যসার সংগ্রহ করতে না পারে, তবে তার ফলে অমৃতরস যোগাবে কি করে? এটুকু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, আমরা যেন বাংলার এককক্ষময় অপ্রশস্ত একতলা ঘরের উপরে ইংরেজির বহুকক্ষময় প্রশস্ত দোতলার ঘর নির্মাণের অসাধ্য সাধনেই ব্রতী হয়েছি। রসসাহিত্য রচনায় আশ্রয় নেব বাংলার, আর ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মননসাহিত্য রচনায় আশ্রয় নেব ইংরেজির, এই অস্বাভাবিক অবস্থা দীর্ঘকাল টিকতে পারে না। এই অস্বাভাবিকতার অবসান না ঘটালে বাংলা সাহিত্যের মুক্তি নেই। আমাদের মহাবিদ্যালয়-সমূহে যেদিন ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত মননবিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অবাধে চলবে মাতৃভাষাতে, সেদিনই বাংলা সাহিত্যের বহুকক্ষময় প্রশস্ত প্রাসাদ রচিত হবে, সেদিন রসসাহিত্যেরও সুদিন আসবে। পণ্ডিতজনের জন্য উপরের তলার প্রশস্ত ভোজনাগার, আর সাধারণের জন্য নীচের তলার সংকীর্ণ পানীয়-শালা—এই সর্বনাশা আত্মবিচ্ছেদের অবসানও ঘটবে সেই দিনই।

সেদিন যে সুনিশ্চিতই আসবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। 'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।' 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।' ভরসার কারণ সেই অনাগত কালের দখিনে হাওয়ার আমেজ এখনই যে মনের মধ্যে অনুভব করছি। সমস্ত দৈন্যসংকীর্ণতার ঝরা-পাতার পরিবেশে বাংলাসাহিত্যের এই ঋতু-পরিবর্তনের মধ্যেই আমি দেখতে পাচ্ছি—'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'। রাজ-সরকারের ঔদাসীন্য, শিক্ষানায়কদের নিষ্ক্রিয়তা এবং পণ্ডিতজনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা মননসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যে ইতিমধ্যেই অজস্র মুকুল-মঞ্জরীর আবির্ভাব হয়েছে—

চোখ আছে যার দেখছে সে জন,
অন্ধজনে দেখবে কি?
উষার আগে আলোর আভাস
সকল চোখে ঠেকবে কি?

এসব মুকুল-মঞ্জরীর অনেক কিছুই ঝরে যাবে সত্য, কিন্তু এই বসন্তপর্যায় শেষ হতে-না-হতেই যে বাংলা মননসাহিত্যের শাখায় শাখায় ফলসম্ভারের আবির্ভাব ঘটবে তা ঋতুচক্র আবর্তনের মতোই ধ্রুব সত্য। আজ যদি বাংলা সাহিত্যের 'আদমশুমারি' নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে গত কয়েক বছরে বাংলার মননবিভাগে ছোট-বড় যত বই বেরিয়েছে এবং বেরোচ্ছে, এর পূর্বে কোনো কালেই তা হয় নি।

তার কারণ কি? প্রধান কারণ ইংরেজের তিরোধান। ইংরেজের আকর্ষণেই আমরা দীর্ঘকাল ইংরেজি ভাষার চতুর্দিকে চক্রপথে আবর্তিত হচ্ছিলাম। ইংরেজ আজ তিরোহিত হয়েছে, তার নিত্য আকর্ষণের প্রভাবও শিথিল হয়েছে। ফলে জড়ত্বের নিয়ম অনুসারে আমরা আরও কিছুকাল ওই চক্রপথেই আবর্তিত হব, কিন্তু ক্রমক্ষীয়মাণ গতিবেগে। এভাবে ইংরেজের টান যেদিন নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে, সেদিন আমাদের সাহিত্য সমগ্রভাবেই মাতৃভাষাকে আশ্রয় করে তাকেই প্রদক্ষিণ করতে থাকবে, তাতেই হবে তার সার্থকতা, সেদিনই আসবে সর্বাঙ্গীণ বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ, সঙ্গে আসবে আমাদের শিক্ষার সমগ্রতা ও জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ।

তা হলে এদেশ থেকে কি ইংরেজির চর্চা একেবারেই উঠে যাবে? তার উত্তর—না, কখনও না। ইংরেজি হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণখনি। যতদিন তার স্বর্ণভাণ্ডার নিঃশেষ না হবে, ততদিন আমাদের সুদক্ষ খোদাইকররা তার থেকে অবিরাম স্বর্ণ আহরণ করতে থাকবে। শুধু ইংরেজি কেন? ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষার খনিতেও আমাদের খোদাইকরদের কাজ চলবে অবিশ্রান্তভাবে। সে সোনা শোধন করে তাঁরা দেবেন আমাদের স্বর্ণকারদের হাতে। সেই স্বর্ণকাররা তার থেকে বহু বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার রচনা করে পরাবেন আমাদের মাতৃভাষাকে। সেই সুদিনকেই আমি বলছি বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

তবে এতদিন আমরা কি করেছি। এতদিন আমরা সবাই মিলে ইংরেজির সোনার খনিতে সেঁধিয়ে কেবলই অশোধিত সোনা সংগ্রহ করেছি এবং পরস্পরের গায়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করেছি। কেউ-কেউ যে ওই সোনা দিয়ে অলংকার গড়ার কাজেও মন দেন নি, তা নয়। যাঁরা সেদিকে মন দিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গী বিমাতার দেহলাবণ্যকেই বিচিত্র স্বর্ণালংকারে ভূষিত করবার ব্যর্থ সাধনাতে জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু শ্বেতভূজা কৃষ্ণহস্তের সে পূজার্ঘ্যকে ক্ষণিক হাস্যে গ্রহণ করলেও তাকে নিত্যকালের অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখেন নি। পক্ষান্তরে মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্র প্রমুখ আরও কয়েকজন সামান্য কয়েকখানি স্বর্ণালংকার রচনা করে ভক্তিনম্র চিত্তে শ্যামাঙ্গী দীনা মাতৃভাষার রিক্ত কণ্ঠেই পরিয়েছেন। সেই দরিদ্র সন্তানের ভক্তি-অর্ঘ্যকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে গ্রহণ করে তাকে নিত্যকালের রত্নাধারেই তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন। কিন্তু তাতেও তৃপ্ত না হয়ে মায়ের সেই ক'টি ভক্ত সন্তান—

'কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায়,
সে যে আমার জননী রে।'

এই বেদনা-সংগীত কণ্ঠে নিয়ে শুধু অশ্রুজলের মুক্তাহারেই মায়ের শ্যামাঙ্গ ভূষিত করে তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাংলা মায়ের অধিকাংশ সাবালক সন্তানই ইংরেজির স্বর্ণখনিতে প্রবেশাধিকার পেয়ে ও অমার্জিত বিদেশি সোনা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সুযোগ পেয়ে খনির সেই অন্ধকার গহ্বরকেই আমাদের চিরকালের আশ্রয়স্থল বলে সগর্বে স্বীকার করে নিয়েছেন। বার-বার মায়ের আহ্বান শুনেও রৌদ্রালোকে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার আশঙ্কাতে ওই মোহান্ধকারের বাইরে আসতে তাঁদের চরণ দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু কাল বসে নেই। ওদিকে খনির বাইরে মাতৃভাষার অমানিশার শেষে নব প্রভাতের সোনার আলোতে আহ্বানগীত ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে,
মরি, হায় হায় হায়।

আজ মাতৃভাষার অঙ্গনে বিগত রজনীর অন্ধকার কেটে গিয়ে নব প্রভাতের অভ্যুদয় ঘটেছে। এই শুভ মুহূর্তে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে বিদেশি খনির তিমিরগর্ভ থেকে এবং নবযুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নূতন উষাকে অভিনন্দিত করে সমবেত কণ্ঠে গাইতে হবে—

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।

শিক্ষা, সাহিত্য ও জনজীবন

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গৌরবে আমাদের গর্বের সীমা নেই। রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেছিলেন—

বাঙালি আজি গানের রাজা, বাঙালি নহে খর্ব ;
জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব।

এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার করে দেখা যেতে পারে দু দিক্ থেকে। এক, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের স্বরূপ কি ও তার সত্য মূল্য কতখানি। দুই, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের তুলনায় পূর্ববর্তী সাহিত্যের মূল্যই বা কতখানি এবং তা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি কি না। একে একে বিচার করে দেখা যাক।

আধুনিক বাংলাসাহিত্য শুধু শিক্ষিত সমাজেরই সাহিত্য। আমাদের চিরাগত জনসমাজের অতি অগভীর উপরের স্তরেই তার উদ্ভব ও বিকাশ। জাতীয় জীবনের গভীরতায় মূল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ও সেখান থেকে সঞ্জীবনরস সংগ্রহ করে কালজয়ী শক্তি অর্জনের সুযোগ সে পায় নি, এখনও পাচ্ছে না। অনেকটা কৃত্রিম টবে সযত্নলালিত চারাগাছের পুষ্পশোভার মতোই আধুনিক বাংলাসাহিত্যের এই গৌরব। তার আয়ুষ্কালও কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী মাত্র। সুদীর্ঘ ভাবী কালের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় এর সমস্ত কৃত্রিমতার খাদ ছাই হয়ে গিয়ে খাঁটি সোনা অবশিষ্ট থাকবে সামান্যই। ইংরেজি শিক্ষা যেমন আমাদের জাতীয় জীবনকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে, আমাদের অতি গর্বের বাংলাসাহিত্যও কি তাই করে নি? বিপুল জনসমাজ আমাদের এই সাহিত্যিক ভোজসভায় অনাহূত ও অনাদৃত। তারা বহুকাল এই ভোজসভায় দেউড়ির বাইরে হতাশ ও বুভুক্ষু-হৃদয়ে অপেক্ষা করে আছে। স্বাধীন দেশেও এই বিসদৃশ অবস্থা পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এই অবাস্তব ইংরেজি শিক্ষা ও কৃত্রিম সাহিত্যের ডিঙি বেয়ে আমরা ইতিহাসের সাগর পার হতে পারব না। তার প্রবলতম বাধা আমাদের উপেক্ষিত এই অগণিত জনসমাজ। কেননা, কবির কথায়—

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে,
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।...
যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

কিন্তু এ অবস্থা স্থায়ী হতে পারে না। 'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।' কালচক্রের আবর্তনে অবহেলিতেরও অভ্যুত্থান ঘটে। আমরা সাহিত্যগর্বিতরা এই সত্যকে আজও উপেক্ষা করেই চলছি। একদিন-না-একদিন তার মাশুল মেটাতে হবেই। কালের প্রভাবে শিক্ষাশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ও স্ববলে সিংহদ্বার ভেঙে এই অবজ্ঞাত জনসমাজ একদিন যখন বাংলাসাহিত্যের রাজ্যপাট অধিকার করে বসবে, তখন যে এই সাহিত্যের বর্তমান চেহারা সম্পূর্ণ পাল্‌টে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তখন অবশ্য তাকে গঙ্গা বা পদ্মার জলে বিসর্জন দেওয়া হবে না। তখন তাকে ইতিহাসের জাদুঘরে গৌরবের আসনেই সযত্নে অধিষ্ঠিত করে রাখা হবে। ভাবী কালের সর্বজনীন বাংলাসাহিত্য হবে সজীব, সচল, অনতিক্লত ও জাতীয় জীবনরসে নিত্যপ্রবর্ধমান। তখনকার দেশব্যাপী পাঠকের অন্তরে বর্তমান কালের আমদানি-করা উপাদানে অতিপ্রসাধিত ও সংস্কৃতিবিলাসী নাগরিকের কক্ষচারী বাংলাসাহিত্যের উজ্জ্বলতা বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগাতে পারে, কিন্তু মমতামাখা প্রীতি জাগাতে পারবে কি না সন্দেহ। জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে (১৯৪১) এসে রবীন্দ্রনাথ এ সত্যটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর নিজের রচনাও 'গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'। এই সর্বত্র-গামিতার লক্ষ্য তাঁর স্বদেশেরই উপেক্ষিত বিপুল জনসমাজ। তাই তিনি বললেন—

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকল রবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।

এই বিপুল জনতা সম্বন্ধে তিনি যে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। অতি অল্প বয়সে তিনি যখন ধনীর দুয়ারে উপেক্ষিত কাঙালিনী মেয়ের অন্তরের বেদনার কথা উপলব্ধি করেছিলেন, তখন থেকে সারাজীবনই তিনি এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দেবার ও তাদের অন্তরে আশা সঞ্চারের সাধনা করে গেছেন সাহিত্যে ও কর্মে। কিন্তু এ সাধনা বাইরের সাধনা, এ উপলব্ধি পরোক্ষ উপলব্ধি। দূর থেকেই তিনি তাদের জীবনকে দেখেছেন, তাদের হৃদয়ের

প্রতিস্পন্দন অনুভব করেছেন। তাদের সঙ্গে একাত্মতা-স্থাপন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাদের অন্তরে প্রবেশ করবার সাধ্যও তাঁর ছিল না। কেননা—

> পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার ;
> বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
> অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
> সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।

সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসে সংকীর্ণ বাতায়ন থেকে তিনি যা দেখেছেন, অন্যরা তাও দেখেন না ; আর যে 'সম্মানের নির্বাসন'-বেদনা তিনি অনুভব করে গেছেন সে বেদনার আভাসমাত্রও অন্যত্র দেখা যায় না। এই চারটি ছত্রে রবীন্দ্রনাথ যা বোঝাতে চেয়েছেন তার নিহিতার্থ টুকু আরও তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। আমরা দেখেও দেখি না (কেননা দেখতে চাই না) যে, আমাদের বর্তমান বাংলা-সাহিত্য ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কুলীন কায়স্থদের সৃষ্টি মাত্র, আর কারও হাত তাতে লাগে নি বললেই হয়। এই তিন জাত একত্র মিলেও সমগ্র বাঙালি সমাজের 'অতি ক্ষুদ্র অংশ' বই কিছু নয়, অথচ তারাই সমাজের উচ্চ মঞ্চ অধিকার করে বসেছেন এবং সেখান থেকে সংকীর্ণ বাতায়ন-পথে কখনও কখনও নিম্নস্তরচারী জনতাজীবনের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের জীবন-যাত্রার বেড়াগুলি যে তাঁদেরকেই অখণ্ড জাতীয় জীবনের উদার ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্মানের সংকীর্ণতার গণ্ডীতে নির্বাসিত ও অবরুদ্ধ করে রেখেছে সে চেতনা এখনও হয় নি। এই সম্মানিত ও অবরুদ্ধ জীবনের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের বর্তমান বাংলাসাহিত্যে। কিন্তু সাহিত্য-মন্দিরের বহিরঙ্গনে দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ এবং বিপুল মুসলমান বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান সমাজের প্রায় সমগ্র অংশ। যতদিন না আমাদের সাহিত্যের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হবে ততদিন বাঙালিজীবনের অকৃতার্থতাও ঘুচবে না, বাংলাসাহিত্যও কৃত্রিমতার কলঙ্কমুক্ত হবে না। বাংলাসাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে সবাইকে ডেকে বলার সময় এসেছে—

> মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
> মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
> সবার পরশে পবিত্র-করা
> তীর্থনীরে।

রবীন্দ্রনাথ এই সর্বজনীন সাহিত্যের অভাব বোধ করে গেছেন এবং তাঁর নিজের পক্ষে যা করা সম্ভব হয় নি তার আহ্বানও জানিয়ে গেছেন—

যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি নি দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

বেশ কিছুকাল থেকে আমরা আবার সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেই জনসাহিত্য রচনার বিলাসে অভ্যস্ত হয়েছি। আমরা এখন রাজধানীর ড্রইং রুমে বসে পল্লীসংগীত চর্চা করি আর লোকসংস্কৃতির রসগ্রাহিতাকে আভিজাত্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ বলে গণ্য করি। জনসমাজ থেকে সযত্নে নিরাপদ ব্যবধান রক্ষা করে তাদের দুঃখবেদনাময় জীবন নিয়ে সংস্কৃতিসম্ভোগের বিলাস বা উচ্চকণ্ঠে সমবেদনা প্রকাশ গুরুতর অপরাধ। তার এক দিকে আছে আত্মবঞ্চনা আর অপর দিকে প্রতারণা। ভবিষ্যতের ইতিহাস এজন্য আমাদের ক্ষমা করবে না।

প্রকৃত জনসাহিত্য রচনার উদ্‌যোগপর্বে চাই দেশব্যাপী জনশিক্ষার আয়োজন। শিক্ষিত জনতার মধ্য থেকেই উদ্‌ভূত হবে যথার্থ জনসাহিত্যিক। তখন এক দিকে যেমন অভিজাত শিষ্ট সমাজ ও অনভিজাত প্রাকৃত সমাজের ভেদরেখা ঘুচে যাবে, তেমনি শিষ্ট সাহিত্য ও প্রাকৃত সাহিত্যের মধ্যে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আর শিষ্ট সমাজে জনসংস্কৃতিসম্ভোগ-বিলাসের অবকাশ থাকবে না। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ভাবী কালের কাছে বেদনার্ত আবেদন জানাতে হবে—

এসো কবি, অখ্যাত জনের
নির্বাক্ মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার;
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

২

এবার অধুনাপূর্ব বাংলাসাহিত্যের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। এ কথা প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের তুলনায় আমাদের

পূর্বতন সাহিত্য নিতান্তই অনুজ্জ্বল। জগৎ-কবিসভায় দূরে থাক্, ভারত-কবিসভায় যাঁকে নিয়ে গর্ব করা যায়, সে যুগের এমন ক'জন কবির নাম করতে পারি? ভারতচন্দ্রকে বঙ্গচন্দ্র বলা যেতে পারে, কিন্তু তাঁকে যথার্থতঃ 'ভারত-চন্দ্র' বললে অতিশয়োক্তি দোষ ঘটবে নাকি? তুলসীদাসের সঙ্গে তুলনা করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। বস্তুতঃ তুলসীদাসের পাশে কৃত্তিবাস-কাশীরামকেও হীনপ্রভ বলেই স্বীকার করতে হয়। আসল কথা এই যে, তখনকার দীর্ঘকালব্যাপী নৈশ সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র কখনও দেখা যায় নি বলাই সংগত। রবির প্রসঙ্গ তো তোলাই অকল্পনীয়। সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যের কথা স্মরণ করলেই আমাদের প্রাক্তন বাংলাসাহিত্যের দৈন্যদশার কথা বোঝা সহজ হবে। শেক্‌স্পীয়ার-প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর কবিদের কথা ছেড়ে দিলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজ কবির সমকক্ষ ক'জন মধ্যকালীন বাঙালি কবির নাম আমরা করতে পারি? এই আপেক্ষিক দৈন্যের ঐতিহাসিক কারণ অবশ্যই আছে এবং তা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। কিন্তু এ স্থলে সে আলোচনা অনাবশ্যক। তবে সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার প্রয়োজনীয়তা আছে।

তখনকার দিনে ত্রিবিধ শিক্ষা চলত তিনটি স্বতন্ত্র ধারায়—ফারসি, সংস্কৃত ও বাংলা, যথাক্রমে মক্তব-মাদ্রাসা, টোল-চতুষ্পাঠী ও পাঠশালায়। এই ত্রিবিধ শিক্ষার সমবায় দেখা যেত খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসাবে ভারতচন্দ্র ও রামমোহনের নাম স্মরণীয়। তা ছাড়া শিক্ষার মানও ছিল সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষার তুলনায় অতি নিম্নস্তরের। শিক্ষার এই খণ্ডিত প্রকৃতি ও অবনত মানই হল সেকালের বাংলাসাহিত্যের পঙ্গুতা ও অনুজ্জ্বলতার মূল কারণ। আধুনিক কালে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও জ্ঞানের পরিধিবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার প্রকৃতি ও পূর্ণতার দ্বারাই সাহিত্যের প্রকৃতি ও পূর্ণতা নিয়ন্ত্রিত হয়, এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। বাংলাদেশের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

সে কালের বাংলায় ত্রয়ী বিদ্যার সমন্বয়গত এবং ত্রিবেদীদের সংখ্যাগত বিরলতার কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। দ্বিবেদীর সংখ্যা এত কম ছিল না। সংস্কৃত ও বাংলা বিদ্যার সমবায় ঘটত কিছু বেশি; ফলে প্রাচীন ভারতীয়

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিছু পরিমাণে যোগরক্ষা করা চলত। তৎকালীন বাংলাসাহিত্যে তার নিদর্শন আছে। কিন্তু ফারসি ও বাংলা বিদ্যার সমন্বয় প্রায় ঘটত না বলেই সমকালীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগরক্ষা সম্ভব হত না, ফলে তৎকালীন বাংলার মনোজীবনে ও সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল এক প্রকার শক্তিক্ষয়ী সংকীর্ণতা বা কূপমণ্ডুকতা। কিন্তু সংস্কৃত বা ফারসি বিদ্যার অতিপ্রাধান্য বাঙালির জাতীয় জীবনে বিক্ষিপ্ততা আনতে পারে নি। সংস্কৃত জানা ও না-জানা এবং ফারসি জানা ও না-জানা মানুষের মধ্যে বড়ো রকম ব্যবধান দেখা দিতে পারে নি, যেমন দিয়েছে আধুনিক কালে ইংরেজি জানা ও না-জানাদের মধ্যে। ফলে বাংলাসাহিত্যই তখনকার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উপরের ও নীচের স্তরের মধ্যে নিরন্তর যোগ রক্ষা করত। এই সাহিত্যিক যোগ ইতিহাসের সব পর্বেই ছিল অবিরত ও অব্যাহত। এ কথা সত্য যে, তখনও শিষ্টজন-রচিত সাহিত্যের পাশে-পাশে প্রাকৃতজন-রচিত একটি লোকসাহিত্যের ধারা প্রবাহিত ছিল। কিন্তু এই দুই ধারার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল না। উভয়েরই উদ্‌ভব ও লালনক্ষেত্র ছিল বাংলার পল্লীগ্রাম। শহর ও গ্রামের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক, উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদানও ছিল অবারিত। আধুনিক কালের মতো শহুরে সংস্কৃতি ও পল্লীসংস্কৃতির জাতিগোত্রগত পার্থক্য তখন ছিল অভাবনীয়। তা ছাড়া, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বা ছোটো-বড়োর আদান-প্রদানও ছিল নিত্যসক্রিয় ও সর্বস্বীকৃত। তাই দেখি এক কালে যা নেহাত লোকজীবনের কাহিনী মাত্র, অন্য কালে তা-ই উন্নীত হয়েছে শিষ্টজনগ্রাহ্য সাহিত্যে। যেমন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি। অন্য দিকে শিষ্ট জনেরাও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবস্তুকে প্রাকৃতজনসংবেদ্য রূপে উপস্থাপিত করতে নিত্যতৎপর। যেমন রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি। আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে-কালে দেশের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে বৈষয়িক যোগাযোগ রক্ষা ছিল দুঃসাধ্য, সে-কালেও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে চিত্তসংযোগের ক্রিয়া চলছিল অবলীলাক্রমে। তাই একই জনবাদ বা সাহিত্যকাহিনী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগত না। এই চিত্তসংযোগই নানা দুর্যোগ-দুর্দিনের মধ্যেও বাংলার জনসংযোগকে নিত্যবর্ধমান করে রেখেছিল। বাংলার সর্বত্র-সঞ্চারী নদীপ্রবাহগুলি যেন দেহের শিরাধমনীর মতোই দেশের সর্ব প্রান্তে শ্রী ও সমৃদ্ধি যুগিয়ে বাঙালিকে একই জীবনবন্ধনে আবদ্ধ করে রাখত, আর তাতেই

তার বহির্জীবনে দেখা দিত সুসমঞ্জস ব্যবহারিক ঐক্য। নানা ধারায় প্রবাহিত মধ্যকালীন বাংলাসাহিত্যও তেমনি বাঙালির চিত্তভূমির সর্বাংশে শক্তি ও পুষ্টি যুগিয়ে তাকে একই চেতনাবন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল, আর তাতেই তার অন্তর্জীবনে গড়ে উঠেছিল সুষমাময় সাংস্কৃতিক ঐক্য। প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, এই উভয়ের সমন্বিত ক্রিয়াফলে আধুনিক যুগের প্রত্যূষপর্বেই অখণ্ড বাঙালি জাতীয়তার অভ্যুদয় ঘটেছিল। এটাই পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের প্রধান গৌরব ও প্রধান কীর্তি। সে সাহিত্য বাঙালির চেতনাকে শহরে-গ্রামে উপরে-নীচে শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে বিচ্ছিন্ন করে নি; সমগ্র জাতিকে এককেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট করাই ছিল সে সাহিত্যের প্রধান কাজ। সে কাজে সকলেরই হাত লেগেছিল। এই সাহিত্যিক ভোজে হিন্দু-মুসলমানের ভেদও মানা হত না। কি রামায়ণ-মহাভারত, কি বৈষ্ণব শাক্ত বা বাউল পদাবলী, কোথাও মুসলমানের দানগ্রহণে কোনো কার্পণ্য ছিল না। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসই তার সাক্ষী। সে ইতিহাসের সাক্ষ্যগ্রহণ বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের অভিপ্রেত নয়। রামায়ণ-মহাভারত রচনায় মুসলমানের আগ্রহ-উৎসাহের অভাব ছিল না, এ কথা কে না জানে? মুসলমান-রচিত বৈষ্ণব পদাবলী যে হিন্দুর অপাঠ্য ও অগেয় ছিল না তার প্রমাণ পদাবলী-সংগ্রহ। শাক্ত সংগীত রচনা যে মুসলমানের পক্ষে অবৈধ বলে গণ্য হত না তার নিদর্শনও বিরল নয়। তবে সব চেয়ে উদার ছিল বাউল সম্প্রদায়। তাদের রচনাতেই বাংলাসাহিত্যের ও মননসংস্কৃতির সমন্বয়-ক্রিয়া চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, কারও পক্ষেই এ সম্প্রদায়ের দ্বার রুদ্ধ ছিল না। বাউল-সাহিত্য তাদের উভয়ের দানেই সমৃদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বাউল-সাধক লালন ফকিরের ভাবজগতে শুধু বৈষ্ণব শৈব শাক্ত নয়, তার সঙ্গে ঐসলামিক সাধনাও একাকার হয়ে মিশে গিয়ে একই বিশ্বতত্ত্বের সাধনায় পরিণত হয়েছিল। তাঁর পদাবলীর প্রায় সর্বত্রই এই সমন্বিত সাধনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মনে রাখতে হবে লালন ফকিরের সুদীর্ঘ জীবনকাল (মৃত্যু ১৮৯০)[১] রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগসেতুরূপে বিরাজমান ছিল। অপর দিকে দেখা যায়, রামমোহন (১৭৭২ ?-

১. দ্রষ্টব্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'লালন-গীতিকা' গ্রন্থ (১৯৫৮), ভূমিকা, পৃ ৫ এবং সনৎকুমার মিত্র-প্রণীত 'লালন ফকির: কবি ও কাব্য' গ্রন্থ (১৯৭৯), পৃ ১৯-২৫।

১৮৩৩) ও রামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) উভয়ের আয়ুষ্কাল ছিল তাঁর জীবন-কালের পরিধিভুক্ত। একটু মন দিয়ে অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, এই তিন জনের স্বীকৃত সাধনতত্ত্ব ও লালন-স্বীকৃত সাধনতত্ত্ব মূলতঃ অভিন্ন। কিন্তু লালন তো কখনও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আওতায় আসেন নি। তিনি নিরাগত খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতিরই আধুনিক প্রতিভূ। অথচ তাঁর গানের বাণী কি করে অশিক্ষিত প্রাকৃতজন ও রবীন্দ্রনাথের মতো শিষ্টজনের হৃদয়কে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে সেটাই চিন্তনীয়। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও এ কথা অনেকাংশে খাটে। আমাদের বক্তব্য এই যে, লালনের বাণী যেভাবে সমস্ত ভেদবিচ্ছেদকে লঙ্ঘন করে শিক্ষিত-অশিক্ষিতকে একত্র আকৃষ্ট ও সংহত করেছে, আমাদের পূর্বতন বাংলাসাহিত্যও সেভাবেই প্রতিনিয়ত বাঙালি জাতিকে একত্র সংবদ্ধ করেছে। মোট কথা, বাঙালি যে আজ নানা খণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও এক অখণ্ড জাতীয়তার অধিকারী হতে পেরেছে তা মুখ্যতঃ আমাদের বিগতকালীন বাংলাসাহিত্যেরই দান। আর, যে সাহিত্য জাতীয় জীবনের সমস্ত স্তরকে একতা ও সমন্বয় দান করে তাকেই বলা যায় 'জাতীয় সাহিত্য'। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য এই দুর্লভ গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়েছিল, আর এটাই তার প্রধান কীর্তি। আমাদের আধুনিক নগরবিহারী অভিজাত বাংলা-সাহিত্যকে এ হিসাবে জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য ছিল সর্বজনীন সাহিত্য। যেহেতু সর্বজনের অধিকাংশই সাধারণ মানুষ, তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই সাধারণ মানুষের জীবনই সর্বাধিক প্রতিফলিত হয়েছে। আর সে প্রতিফলন ঘটেছে স্বভাবের প্রেরণাতেই, বহিরাগত কোনো উত্তেজনার বশে নয়। সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রই সে সাহিত্যের প্রধান সম্পদ্। সে চিত্র অনুজ্জ্বল হতে পারে, কিন্তু তা সদ্য-তোলা অশোধিত সোনার মতোই খাঁটি ও মূল্যবান্। উজ্জ্বল গিল্‌টি সোনার মতো কৃত্রিম ও মূল্যহীন নয়। জনসাহিত্য স্বভাবতঃই হয় কলা-কৌশলহীন। তাই আধুনিক বাংলাসাহিত্যের চোখ-ভুলানো কলাসৌন্দর্যে অভ্যস্ত দৃষ্টিতে সে সাহিত্যের অপ্রসাধিত শোভা এমন ফিকে ঠেকে। রবীন্দ্রনাথ সে মোহভঙ্গ করার প্রয়াস করেছেন নানাভাবেই। মায়ের মুখের ছেলে-ভুলানো ছড়া, ঠাকুরমাদের ঝুলিভরা গল্পকথা, নাগরিক চোখের অন্তরালচারী কাব্যগাথা, পল্লীগায়কের কণ্ঠবিহারী লোকগীতি, বিশেষতঃ বাউলের গানে তিনি চিরকালই হারামণির সন্ধান করে গেছেন। আরও সন্ধানের জন্য

আমাদের প্রবর্তনাও দিয়ে গেছেন। বঙ্গভারতীর মণিমালা রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত মণিখণ্ডগুলিকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন তা কারও অজানা নয়। তারও বহু পূর্বে মধুসূদন বঙ্গভাণ্ডারের অবহেলিত অমূল্য রত্নরাশির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাঁর রচিত সাহিত্যে এসব রত্নের মর্যাদা রক্ষায়ও ত্রুটি করেন নি।

একটু মন দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, আমাদের অতীত বাংলাসাহিত্য যেন জনজীবনের এক আশ্চর্য চিত্রশালা। তার কক্ষে কক্ষে বিচিত্র জীবনের বিচিত্র চিত্রমালা। এখন আমাদের ঘরে ফেরার সময় এসেছে। সে দিকে চোখ ফেরালে লজ্জিত বা নিরাশ হবার কারণ নেই। পরের প্রাসাদের ঐশ্বর্য দেখে নিজের কুটিরের অপূর্ব শোভার প্রতি না তাকানোটাই বরং লজ্জার কথা।

৩

আধুনিক বাংলাসাহিত্য দেশব্যাপী জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই এ সাহিত্য এখনও আমাদের জাতীয় সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে নি। 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্', এই চিরন্তন ভারতবাণী এখনও আমাদের সংঘবদ্ধ জীবনে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। যদি বাংলাসাহিত্যকে সর্বজনীন জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তবে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য প্রাথমিক শিক্ষাকে মাতৃভাষার যোগে সর্বজনের পক্ষে সহজলভ্য করা। এই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আপাততঃ অগভীর হলেও তাতেই সার্থক জাতীয় সাহিত্য গড়ে-ওঠার পথ প্রশস্ত হবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি ('লোকহিত' প্রবন্ধ, 'কালান্তর' গ্রন্থ) বিশেষভাবে স্মরণীয়—"এই লিখিতে-পড়িতে শেখা তখনই যথার্থভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী হইবে।···সামান্য লিখিতে-পড়িতে শেখা দুই-চার জনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামি জিনিস হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।" এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীর কাছে বারবার আবেদন করে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'লোকহিত' প্রবন্ধ (১৯১৪) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩), এই দুটিমাত্র প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট। কিন্তু শুধু প্রবন্ধ লিখে ও আবেদন করেই তিনি নিরস্ত হন নি। নিজের উদ্যোগে বিশ্বভারতীয় অঙ্গ হিসাবে 'লোকশিক্ষাসংসদ্' প্রতিষ্ঠা করে (১৯৩৬) তাঁর

জনশিক্ষার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। আয়তনে বৃহৎ না হলেও অভিপ্রেত লক্ষ্যের বিচারে 'লোকশিক্ষাসংসদ' প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের একটি মহৎ কীর্তি সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে তাঁরই একটি বাণী—

"ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়,
বৃহৎ বলে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।"

এই লোকশিক্ষা-সংসদের পরিকল্পিত শিক্ষাস্তর তিনটি—আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য। প্রত্যেক স্তরেই শিক্ষণীয় বিষয় অনেকগুলি—ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু আদ্য থেকে অন্ত্য পর্যন্ত কোনো স্তরেই কোথাও ইংরেজির স্থান নেই। লোকশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত আদর্শ কি ছিল তা লোকশিক্ষা-সংসদের রবীন্দ্রপরিকল্পিত পাঠক্রমেই সংশয়াতীত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। আর এই সংসদেরই অনুষঙ্গ হিসাবে প্রবর্তিত 'লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা'র বইগুলিও এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রচিন্তিত শিক্ষাদর্শের অন্যতম নিদর্শন বলে গণ্য হতে পারে।

আমাদের দেশে যে অগণিত জনতা পুরুষানুক্রমে অশিক্ষা ও অবহেলার মধ্যে জীবনযাপন করে আসছে তাদের মধ্যে কত মেধা ও প্রতিভা যুগযুগ ধরে অনাদরে অবজ্ঞায় বিনষ্ট হচ্ছে তা আমরা ভেবেও দেখছি না। খাদ্যাভাব মেটাবার প্রয়োজনে আজ আমরা দেশের যেখানে যত অনাবাদী জমি আছে তাতে ফসল ফলাবার কাজে লেগে গেছি। কিন্তু সারাদেশে যে বিপুল পরিমাণ চিত্তভূমি বহুকাল যাবৎ অবহেলিত হয়ে আসছে সে দিকে আমরা ফিরেও তাকাচ্ছি না। এই বিপুল পরিমাণ অবহেলিত চিত্তভূমিতে যদি জ্ঞানের ফসল ফলাতে পারি তাহলেই আমাদের এই খণ্ডিত বাংলাসাহিত্যের পঙ্গুতা ঘুচবে, সে সাহিত্য হয়ে উঠবে, গতিশীল যথার্থ জাতীয় সাহিত্য। যদি শিক্ষা দিয়ে জ্ঞান দিয়ে আমাদের প্রতিবেশী এই অবজ্ঞাত জনতাকে দেশের উপর তলার শিক্ষিত শ্রেণীর সমান পর্যায়ে তুলে আনতে পারি তবে এই জনতাই একদিন জাতিগত ভাবে আমাদের লজ্জা ঘুচাবে, আমাদের চিত্তে যোগাবে অনড় আত্ম-বিশ্বাস আর বাহুতে যোগাবে সীমাহীন বল। এই দেশব্যাপী অজ্ঞ জনতার সহযোগিতার অভাবেই কর্ম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা এত পিছিয়ে আছি। যত দিন এই জনতার অন্তর্নিহিত মেধা ও প্রতিভার নিরন্তর অপচয় নিবারণ করে তাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে না পারব ততদিন আমাদের পিছিয়েই

থাকতে হবে। যদি আমাদের জীবনকে একতাবদ্ধ করে জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও কর্মে বলিষ্ঠ করতে চাই তবে আর কালব্যয় না করে এখনই এই বিশাল অনাবাদী চিত্তভূমিতে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার বীজ বোনার আয়োজন করতে হবে। আমাদের এই দেশব্যাপী অশিক্ষার কথা ভাবলে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে ইচ্ছা হয়—

এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।

এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে

আমাদের সাংবিধানিক নির্দেশ অনুসারে আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য দেশের প্রত্যেকটি লোককে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া। কেননা, গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় দেশ থেকে নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার সম্পূর্ণ অপসারণ। অথচ দেশের বিপুল জনসংখ্যার শতকরা ষাট জনই এখনও নামসই পর্যন্ত করতে পারে না। যেখানে মাতৃভাষার আলোতেই এই দেশব্যাপী অন্ধকারকে নিরস্ত করা একটা দুঃসাধ্য ব্রতস্বরূপ, সেখানে বিদেশি ভাষার বিজলি-বাতি আমদানির প্রস্তাব কি অলীক স্বপ্নমাত্র নয়? প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে প্রত্যেক শিশুকে ইংরেজি শেখাবার প্রস্তাব কার্যতঃ সমগ্র ভারত-ভূমিকে একটা বৃহত্তর ইঙ্গভূমিতে পরিণত করারই প্রস্তাব।

'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসবের সময় (১৯৬১)। তাতে শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্র-চিন্তার বিশদ আলোচনা থাকায় অস্বস্তি প্রকাশ করে বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাস আমাকে বলেছিলেন—'প্রবোধবাবু, গুরুদেবের এসব উক্তি পুরনো হয়ে গেছে, এখন সেসব কথার কোনো মূল্য নেই।' শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি তো জানি মনীষীদের বাণী তাঁদের কালে গ্রাহ্য না হলেও ভাবী কালে স্বীকৃত হয়। তার পরে আরও কুড়ি বছর কেটে গেল, এখনও আবার শুনছি রবীন্দ্রনাথের উক্তি ও বাণী এ কালের উপযোগী নয়। আমার তো মনে হয় তাঁর নির্দেশ মেনে নেবার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। এখন তো বাংলাকে শুধু শিক্ষায় নয়, বাঙালির জাতীয় জীবনেরই বাহন বলে মেনে নেবার উপযুক্ততম সময়। অথচ এই শুভক্ষণেই রব উঠেছে শহরে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র চাষী জেলে তাঁতি মুটে-মজুর সবাইকে ইংরেজি শিখিয়ে ভারতীয় নাগরিক করতে হবে। যে সময়ে উপরতলার ভদ্রসমাজে ইংরেজি-মিডিয়ম ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পড়াবার হিড়িক বেড়ে চলেছে, আর নীচের তলায় আর্ত মূক জনসমাজে মাতৃভাষার বর্ণজ্ঞানও ক্রমে কমে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে সবাইকে

একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে ইংরেজি শিখিয়ে দেশ থেকে শিক্ষাবৈষম্য তুলে দেবার 'মহৎ প্রস্তাব' তারস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে।

শিক্ষা বহুলাংশে নির্ভর করে শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক ভাবধারার উপরে। যে শিশু শহরে বাস করে এবং সুশিক্ষিত পরিবারে লালিত-পালিত, সে অতি সহজে ও স্বল্প সময়ে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজনের মতো হয়ে উঠতে হবে, এই ইচ্ছা ও আশা তাকে ভিতরে ভিতরে প্রেরণা দিতে থাকে। তাতেই তার মনের মাটি উর্বর হয়। প্রতিনিয়তই পারিবারিক ও সামাজিক ভাবনাচিন্তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বীজ তার হৃদয়-মনে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হতে থাকে। কিন্তু যে ছেলে গ্রাম্য অশিক্ষিত পরিবারে জন্মেছে তার অনুর্বর মনে শিক্ষার বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না। যদি-বা হয় তাহলেও পারিপার্শ্বিক খরার উষ্ণ বায়ুস্পর্শে অচিরেই শুকিয়ে যায়। এসব ছেলেকেও অল্প বয়সে ইংরেজি শেখাবার (আর তাও শহুরে শিক্ষিত পরিবারের সমপর্যায়ে) কল্পনাকে সুচিন্তাপ্রসূত বলে মনে করতে পারি না। আমি এখানে বাস করি পল্লীবেষ্টিত শিক্ষাকেন্দ্রে। প্রত্যহ পল্লী-অঞ্চলের নিরক্ষর অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। আমি জানতে চাই তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা। প্রায় সকলেই বুঝে গেছে ছেলেমেয়েদের, বিশেষতঃ ছেলেদের কিছু লেখাপড়া শেখাবার প্রয়োজনীয়তা কতখান। কিন্তু প্রায় কারও মনেই ছেলেকে উঁচু মানের শিক্ষা দেবার আকাঙ্ক্ষাটুকুও নেই। তাদের ছেলেরাও যে কখনও শিক্ষায় 'বাবুদের' সমান হয়ে উঠতে পারে তা তারা বিশ্বাস করতেই চায় না। ইস্কুলের শেষ সীমায় পৌঁছতে পারবে বলেও মনে করে না, তার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে না। ছেলেটা অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখে পিতার পেশাটাকে আরও ভালো করে চালাতে পারলেই যথেষ্ট। কাগজে-কলমে হিসাবপত্র লিখবে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেবে ও তুলবে, চিঠিপত্র লিখতে ও পড়তে পারবে ইত্যাদি রকম শিক্ষার চেয়ে বড়ো আশা বা ইচ্ছা তাদের মনে উঁকিও দেয় না। কিন্তু প্রায় সকলেইর অভিযোগ—"বাবু, ছেলেটাকে তো লেখাপড়া শেখাতে পারলাম না। বার-বারই ইংরেজিতে ফেল করছে, ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেটারও ইংরেজি শেখায় মন নেই। আচ্ছা বাবু, বলুন তো এত ইংরেজি শিখে সে কি করবে? ইংরেজিতে নিজের আর বাবার নাম-ঠিকানা লিখতে পারলেই তো হয়।" এই অভিযোগের উত্তর কি? আমার দুঃখ, ইংরেজি শিখতে পারল না এই অপরাধে সে মানচিত্র দেখে ভারতবর্ষের

চেহারাও চিনে রাখতে পারল না, গণতন্ত্রের প্রকৃতি কি, তাতে তার দায়িত্ব কতখানি তাও সে জানল না। অথচ তার ভোটের উপরেই নির্ভর করে দেশের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাবী পরিণতি। প্রথম পর্যায়ের শিক্ষায় যদি ইংরেজির বালাই না থাকত তাহলে এই দুর্দশা হত না, দেশের গণতন্ত্র অসংখ্য শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকের আশ্রয় পেত।

শুধু সমাজের নিম্নস্তরের জনগণের পক্ষে নয়, উচুস্তরের শিক্ষিতদের পক্ষেও শিক্ষাদানের প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি শেখাবার ব্যবস্থাকে আমি কেবল অনাবশ্যক নয়, অকল্যাণকর বলেই মনে করি। আগে নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। আমার শিক্ষারম্ভ হয়েছিল মদনমোহন তর্কালংকারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগ বইটি দিয়ে (১৯০২)। পড়তে পারার যে একটা আনন্দ আছে, বুঝতে পারার যে একটা রস আছে আর মাতৃভাষার ধ্বনিতে যে একটা কমনীয়তা আছে তা প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম এই বই পড়েই। চেনা জগৎকে নূতন করে চেনার যে আনন্দ, এই বই আমাকে সে আনন্দই দিয়েছিল। তাই এই বই পড়ার সুখস্মৃতি আজও মনে সতেজ আছে। আমার শিক্ষারম্ভের বছর-দেড়েক পরে আমাকে ইংরেজি বই ধরানো হয় ইস্কুলে। আমাকে বাড়িতে পড়াবার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত ইস্কুলের শিক্ষার উপরেই। ইস্কুলে আমার ইংরেজি-শিক্ষা মরুভূমিতে বালি চাষ করার মতোই নিষ্ফল হল। বৎসরান্তে যখন পরীক্ষার ফল ঘোষিত হল, তখন বাংলা প্রভৃতি বিষয়ের ফল শুনে আমার লজ্জিত হবার কোনো কারণ ছিল না, বরং শিক্ষক-মহাশয়ের সপ্রশংস উৎসাহবাণী শুনে আত্মপ্রসাদই লাভ করেছিলাম। সবশেষে যখন বললেন, 'কিন্তু ইংরেজিতে ফেল', তখন চোখের জল আর বাঁধ মানে নি। সে অশ্রু আজও আমার স্মৃতিতে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে। তবে আমার প্রমোশন হতে বাধা হল না অন্য বিষয়গুলির জোরে। নিরানন্দময় ইংরেজি-শিক্ষার এই পীড়ন সইতে হল আরও দু-তিন বৎসর। অবশেষে যখন বাংলা ব্যাকরণ পড়ে শব্দগঠন ও বাক্যরচনার আইন-কানুন ও কায়দা-কৌশল আয়ত্ত হয়ে গেল, তখন বাংলা ব্যাকরণের জ্ঞানই আমাকে ইংরেজি চিনিয়ে দিল। তখনই আমার ইংরেজি-শেখা এগিয়ে চলল দ্রুতগতিতে। এবার আমার পক্ষে ইংরেজিতেও অন্য সবাইকে ডিঙিয়ে শীর্ষস্থান দখল করা কঠিন হল না। এভাবে ওঠা গেল ষষ্ঠ শ্রেণীতে। এবার আমার সঙ্গে এসে ভরতি হল রামানন্দ পাল ও বসন্ত পাল নামে দুটি ছাত্রবৃত্তি পাস-করা ছেলে। রামানন্দ

কলুর ছেলে, অতি দরিদ্র। তাদের বংশের চিরন্তন নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচনের পথে সে-ই প্রথম পা বাড়িয়েছে। বসন্ত বণিক্-বংশের ছেলে। তার পরিবারে বাংলা-শিক্ষার পথ অচেনা ছিল না, ইংরেজি শিক্ষার আলো তখনও প্রবেশ করে নি। দুজনেই এসেছে ইংরেজি বিদ্যা আয়ত্ত করতে, একেবারে গোড়া থেকে। তাদের মধ্যে রামানন্দের মেধাই ছিল উজ্জ্বলতর। অচিরেই দেখা গেল আমাদের ক্লাসে আমার যেটুকু সম্মান ছিল তা আর বজায় থাকছে না, ইংরেজি বাদে আর সব বিষয়েই তারা আমার থেকে বহু দূর এগিয়ে আছে। কিন্তু ইংরেজিতে তারা সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে। দুই পক্ষেই চলল অধ্যবসায়ের প্রতিযোগিতা। বৎসরান্তে দেখা গেল ইংরেজি বাদে অন্য সব বিষয়ে আমি দৌড়ের ঘোড়ার মতো শুধু কান এগিয়ে দিয়ে অতি কষ্টে প্রথম স্থান অধিকার করেছি, রামানন্দ ও বসন্তের স্থান তার অতি অল্প নীচে। কিন্তু ইংরেজিতে তারা ক্লাসের অন্ততঃ চল্লিশটি ছাত্রকে ডিঙিয়ে এসে আমাকে ছোঁয়-ছোঁয় অবস্থায় পৌঁছেছে। ক্লাসের বাইরে কেউ তাদের ইংরেজি শেখার সহায়তা করে নি। ক্লাসে ইংরেজি-শিক্ষক যা বলতেন তার সবটুকুই তারা পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারত, তাদের উঁচুমানের ভাষাজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে। এই অভিজ্ঞতার কথা আমি আজও ভুলতে পারি না। যতদূর মনে আছে স্বনামখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে বলেছিলেন তিনিও বঙ্গবিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারও আগে বিখ্যাত মেধাবী আনন্দমোহন বসুও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করেছিলেন নির্ভেজাল বাংলা পড়ে। তাতে যে শিক্ষার ভিত তৈরি হয়েছিল তার উপরে উচ্চতম ইংরেজি বিদ্যার ইমারত গড়া তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয় নি।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা বার-বার বলে গেছেন। তিনি তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে (১৯২৪) তাঁর বারো বৎসর বয়স্ক দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের বাংলা শিক্ষা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ('দেশ' ১৩৬২ পৌষ ৮)—"কাঁচা বয়সেই ভাষাটা জীবনের সঙ্গে গভীর করে মেলে, আর ভাষার সঙ্গে-সঙ্গে দেশের যথার্থ প্রাণ প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়। আমি প্রায় ষোলো বছর পর্যন্ত ইংরেজি না শিখে বাংলা শিখেছিলুম। তাতেই আমার মনের ভূমিকা পাকা করে তৈরি হয়েছিল, সেই ভূমিকার উপর অতি সহজেই প্রায় বিনা চেষ্টায় ইংরেজির পত্তন হতে পারল।" তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে আছে —"বাংলা শিক্ষা যখন বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি

শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।” বাংলা ভাষায় তাঁর বিদ্যাচর্চা চলেছিল প্রায় ষোলো বছর পর্যন্ত। তার শেষ চার বছর তাঁকে বাড়িতে কিছু ইংরেজি শেখানো হয়েছিল ইস্কুলের নির্ভেজাল বাংলা বিদ্যা অর্জনে কোনো বাধা না ঘটিয়ে। অল্প বয়সে ইংরেজি শেখাবার কুফল সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি এই—“অতি বাল্যকালেই ইংরেজির সহিত মিশাইয়া বাংলা তাহাদের তেমন সুচারু রূপে অভ্যস্ত হয় না। ইংরেজিতেও শিশুবোধ্য বই পড়া তাহাদের অসাধ্য। ফলে তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।” বস্তুতঃ অতি অল্প বয়সে দুই ভাষা একসঙ্গে শেখাতে গেলে কোনো ভাষাই ভালো করে আয়ত্ত হয় না, ফলে মনোবিকাশের পথ হয় অবরুদ্ধ। অভিজ্ঞ বিচক্ষণ শিক্ষক মাত্রই তা জানেন। দুই ভাষা একসঙ্গে শেখানো শিক্ষানীতিসম্মতও নয়। আমি দেখেছি যেসব ইংরেজি-মিডিয়ম ইস্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের সঙ্গে সবসময় ইংরেজিতেই কথা বলেন সেসব ইস্কুলের শিশুছাত্ররা ইংরেজিটা ভালো করেই শেখে। কিন্তু তারা সাধারণতঃ বাংলায় কাঁচা থাকে। তাই অনেক সময় বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে একরকম দোআঁশলা ভাষায় ভাবতে ও বলতে অভ্যস্ত হয়। তাদের চিন্তাটাই হয় দ্বিচারী। আর নীচের ক্লাস থেকেই বাংলায় সঙ্গে ইংরেজি শেখানো হলে শিশুরা কোনো ভাষাই আয়ত্ত করতে পারে না, ফলে বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তাদের মনের বিকাশও হয় না।

আমার এক প্রখর বুদ্ধিমতী নাতনী, বয়স নয় বৎসর। পড়ে ইংরেজি-মিডিয়ম ইস্কুলে, ইংরেজিভাষিণী শিক্ষিকার কাছে। ইস্কুলের বাইরেও সে প্রয়োজনমতো ইংরেজিতে কথাবার্তা চালাতে, এমন-কি ঝগড়া করতেও দ্বিধা করে না। বাংলা বই পড়তেও তার আনন্দ কম নয়। কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে এসে সে গেল কোপাই নদী দেখতে। নদীতে নেমে মহানন্দে স্নান করল, আঁচল পেতে ছোটো-ছোটো মাছ ধরতেও চেষ্টা করল, কিন্তু মাছগুলি বড় দুষ্টু,—কিছুতেই ধরা গেল না। বাড়িতে ফিরে এসে তার এই নূতন অভিজ্ঞতার নিপুণ বর্ণনা শোনালো আমাকে। আমি বললাম, ‘এই চমৎকার গল্পটা লিখে আনো তো।’ অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিখে নিয়ে এল নিখুঁত ইংরেজিতে, বর্ণনাও মুখের ভাষার মতো সজীব। আমি ভেবেছিলাম এজাতীয় অভিজ্ঞতার গল্প সে স্বভাবতই লিখবে বাংলায়। তাই আবার বললাম, ‘বেশ সুন্দর হয়েছে, এবার এই গল্পটাই বাংলায় লিখে আনো তো।’ এবার দেখা

গেল তার মনের আড়ষ্টতা—আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, বাংলায় ভুল হবার ভয়। তাই আর লেখাই হল না। নেহাত দৈনন্দিন ঘরোয়া কথার বাইরে কোনো কথা বলতে গেলেই বার-বার ইংরেজি কথার আশ্রয় নিতে হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের এই আড়ষ্টতা বেড়ে যাবে, তার পরিণত চিন্তার ভাষা তার মাতৃভাষার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, তার অর্জিত বিদ্যাকে বাংলায় প্রকাশ করা তার অসাধ্য হয়ে যেতে পারে—এই আমার আশঙ্কা। এজাতীয় অভিজ্ঞতা আমার কম নয়।

এসব কারণে আমি মনে করি বারো বছর বয়স পর্যন্ত সব শিক্ষাই চালানো উচিত একমাত্র মাতৃভাষায়। তার পরের চার বছরে ঠিক প্রণালীতে শিক্ষা দিলে আজকাল দশম শ্রেণীর ছাত্ররা যে মানের ইংরেজি শেখে, তার চেয়ে উচু-মানের ইংরেজি শেখানো সম্ভব, এই আমার অভিজ্ঞতাজাত বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে প্রথমে ভেবে দেখা দরকার দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি শেখাবার প্রয়োজনীয়তা কি এবং কতখানি। আগেই বলেছি দেশের শতকরা ষাট জনের অধিকাংশেরই ইংরেজি শেখার কোনো প্রয়োজন নেই, থাকলেও অতি সামান্য। আর উপর-তলার মানুষের (বিশেষতঃ মেয়েদের) অনেকেই উচ্চতর শিক্ষালাভে আগ্রহী নয়, আগ্রহ থাকলেও যোগ্যতা নেই। তাদের পক্ষেও ইংরেজি শেখার প্রয়োজন বেশি নয়। সরকারি আপিস-আদালতের কাজকর্মে বাংলার ব্যবহার পুরোপুরি চালানো হলে সে প্রয়োজন আরও কমে যাবে। এছাড়া এমন অনেক মানুষ আছে যাদের ভাষা শেখার ক্ষমতাই অতি ক্ষীণ, তাদের পক্ষে ইংরেজি ভাষাটাই একটা বিভীষিকা। এদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষা শিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া তাহারা উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পড়ে। এই যে-সব ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন-কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে, যে জন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আন্দামানে চালান হইবার যোগ্য? যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাহাদের উপবাস কি কোনো দিন ঘুচিবে না?" এইজন্যই আমি মনে করি ইস্কুলের ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণী থেকে ইংরেজিকে ঐচ্ছিক বিষয় বলে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়। যারা ইংরেজি পড়তে চাইবে না তারা ইংরেজি ছাড়া অন্য বিষয়গুলি নিয়েই পড়তে থাকবে শেষ পর্যন্ত। অথবা তাদের ইংরেজির বদলে অন্য

কোনো বিষয় বেছে নেবার অধিকার দেওয়া যেতে পারে যারা ইংরেজি নির্বাচন করবে তাদেরও যে-কোনো কারণেই হক, যে-কোনো সময়ে তা ছেড়ে দেবার অধিকার দিতে হবে। তা হলেই শুধু আগ্রহী ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের উঁচুমানের ইংরেজি শেখাবার সুযোগ পাওয়া যাবে। যোগ্য-অযোগ্য সবাইকে ইংরেজি শিখতে বাধ্য করলে স্বভাবতঃই শিক্ষার মানকে নীচে নামাতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজি শিক্ষারও বাহন হবে মাতৃভাষা। সব সভ্য দেশেই বিদেশি ভাষা শেখানো হয় মাতৃভাষার যোগে। ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় লেখা হলে ইংরেজি শেখার রাজপথ খুলে যাবে গ্রামেগঞ্জেও। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ব্যাকরণ বাংলায় লিখেছিলেন বলেই সংস্কৃত শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে, নতুবা টোলে চতুষ্পাঠীতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত। তৃতীয়তঃ, ইংরেজিতে কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকবে না, থাকলেও সে বই থেকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। তা ছাড়া, ইংরেজি কবিতা পড়াবার কোনো প্রয়োজনও নেই। অর্থাৎ ইংরেজি শেখাতে হবে শুধু ভাষা হিসাবে, সাহিত্য হিসাবে নয়। একটা নির্দিষ্ট মানের কতকগুলি বইয়ের নাম করে দিতে হবে। সে মানের যে-কোনো ইংরেজি বই বা প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে পারে কিনা, তারই পরীক্ষা নেওয়া হবে। এই পরীক্ষার বাহনও হবে মাতৃভাষা। সব সভ্য দেশেই বিদেশি ভাষা শেখানো ও তার পরীক্ষা নেওয়া হয় মাতৃভাষায়। কোনো ইংরেজি গদ্যাংশ বাংলায় অনুবাদ করা বা তার মর্মার্থ বাংলায় লেখা ইত্যাদি রকম প্রশ্ন করা হবে। কিছু ব্যাকরণের প্রশ্ন এবং বাক্যরচনার প্রশ্নও অবশ্যই থাকবে। এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনার স্থান এটা নয়। সবশেষ প্রশ্ন ইংরেজি লিখতে শেখানো হবে কিনা। আমার মতে সেটাও হবে ঐচ্ছিক। যে-কোনো ভাষা শেখার দুটি প্রধান পর্যায়—এক, বই পড়ে বোঝা আর শুনে বোঝা ; দুই, মনের ভাব লিখে বোঝানো আর বলে বোঝানো। শুনে বোঝা আর বলে বোঝানো সামান্য শিক্ষা এবং কিছু বেশি অভ্যাস-সাপেক্ষ। সে প্রসঙ্গ এখন থাক্। যে-কোনো ভাষায়, বিশেষতঃ বিদেশি ভাষার বই পড়ে বুঝতে শেখার চেয়ে সে ভাষায় মনের কথা লিখে বোঝাতে শেখা অনেক গুণে কষ্টসাধ্য এবং স্বতন্ত্র শিক্ষা-সাপেক্ষ। বিদেশি ভাষায় মনোভাব লিখে বোঝানো অনেকের পক্ষেই অনাবশ্যক। সেজন্যই এই শিক্ষাকে ঐচ্ছিক করা বাঞ্ছনীয়, তার জন্য একটি বিশেষ বা অতিরিক্ত পত্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্বভাবতঃই শুধু কৃতী ছাত্ররাই এই শিক্ষা নিতে এগিয়ে আসবে, ফলে তাদের

জন্য বেশ উঁচুমানের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যাবে। এই দুই মানের ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা থাকতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ দুই ক্লাস থেকে বি-এ অনার্স পর্যন্ত। এই দুই ব্যবস্থা হলে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ইংরেজিতে অপটু ছাত্র-নিধনের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে অনেক উঁচু মানের ইংরেজি শিক্ষা দিতে পারার আত্মপ্রসাদ বা গৌরব লাভ করতে পারবে।

বোধ করি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই সর্বপ্রথম বাংলাকে 'কালেজী শিক্ষা'র বাহন করার প্রস্তাব করেছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে (১৮৮০)। 'বাঙ্গালা দিয়া ইংরাজি শিখ না কেন?'—এমন দুঃসাহসিক উক্তিও তিনি করেছিলেন এক শো বছর আগে লেখা তাঁর এই প্রবন্ধে। তারপরে আরও অনেক মনীষীই বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ বার-বার এই কথা বলে গেছেন। আজকালও মনস্বী শিক্ষাবিদ্‌রা স্বীকার করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করা উচিত। যদি তা করা হয় তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি-সমৃদ্ধি অচিরেই বহু গুণে বেড়ে যাবে। গবেষণাকর্ম পর্যন্ত শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণের দায়িত্ব বহন করতে হবে যে ভাষাকে, সে ভাষা শিক্ষার ভিত পাকা করে গড়তে হবে একেবারে নিম্নতম স্তর থেকে। সে ভাষা শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে আর কোনো ভাষাকে তার শরিক বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মানা চলবে না। ইংরেজিকে যখন কোনো স্তরেই শিক্ষার বাহন বলে মানা হবে না তখন সে ভাষা শিক্ষার মানকে সর্বক্ষেত্রে বাংলার সমকক্ষ রাখবারও প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। তাই শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজিকে বাংলার সমান আসনে বসানো অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকর। দেশের শতকরা ষাট জন নিরক্ষর মানুষকে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা দিতে চাই। সেই প্রাথমিক পর্যায়েই যদি ইংরেজি শেখাকে আবশ্যিক বলে গণ্য করা হয় তবে তাতে শিক্ষা প্রসারের মূল উদ্দেশ্যটাই পণ্ড করা হয়। "ইংরাজিতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির (১৮৮৩) সার্থকতা আজও অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দুটি প্রধান অন্তরায়ের কথাও বলা কর্তব্য। ইদানীং বি-এ শিক্ষার পর্যায়ে বাংলা 'অথবা' ইংরেজিকে যে স্তরে নামানো হয়েছে তার মতো আত্মঘাতী ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? যে বাংলাকে সব শিক্ষার বাহন হবার মর্যাদা দেওয়া হল, সে ভাষা ব্যবহারের

ক্ষমতা অর্জনের মানকেই টেনে নামিয়ে একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হল। এ যেন ধনুকের ছিলে কেটে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যবিদ্ধ করার অলীক কল্পনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষা একটু বদলে নিয়ে বলা যায়—'আপনি গড়ে তুলি বাংলা প্রাসাদ, আপনি ভেঙে দেয় তাহা।' মাতৃভাষা ব্যবহারে দক্ষতার নিম্নতম মান হয়েছে শতকরা কুড়ি। ইংরেজ আমলে আমাদের ছাত্রাবস্থায় সব বিষয়েই শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজি। কিন্তু তখনও বাংলা ভাষা-শিক্ষার মান ছিল ইংরেজির প্রায় সমপর্যায়ে। এখন বাংলাকে বসানো হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে, অথচ সে ভাষায় দক্ষতার মান হল সবার পিছে, সবার নীচে। একথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়—এ ব্যবস্থা কি সত্যই সুস্থচিন্তাপ্রসূত? তার চেয়েও বিস্ময়কর, যে ছেলে বাংলায় কুড়ির বেশি মার্ক পাবে তার সেই বাড়তি মার্ক যোগ করা হবে অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মার্কের সঙ্গে। যে ছেলে ইতিহাসে দর্শনে ফেল করল, বাংলা ভালো জানে বলে তার যেন ইতিহাস বা দর্শনের জ্ঞানও বেড়ে গেল, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পেল। ইংরেজির বেলাতেও তাই। এ ব্যবস্থার অবসান না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। বাংলা 'অথবা' ইংরেজি কেন? পাস এবং অনার্স উভয় ক্ষেত্রেই উঁচুমানের বাংলাকে করা চাই অবশ্য শিক্ষণীয়, শুধু ভাষাব্যবহার-শিক্ষার প্রয়োজনে, সাহিত্য-শিক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। আর, অনার্স পর্যায়ে এক পত্র রাখতে হবে (এবং আবশ্যিকভাবে) ইংরেজি বই পড়ে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনে অথবা ইংরেজি ভাষাপ্রয়োগ শিক্ষার প্রয়োজনে। এখানে এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

একটা কথা শোনা যায়—অন্যান্য দেশে ভাষাশিক্ষা ইস্কুল পর্যায়েই শেষ করে দেওয়া হয়, অতএব আমাদেরও তা-ই করতে হবে। মনে রাখতে হবে সেসব দেশে বিদ্যার সর্ব বিভাগে মাতৃভাষায় চিন্তাচালনার ফলে পূর্ণ পরিণত ভাষার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সেই পরিচয় হয়ে যায়। আমাদের ভাষা গল্প কবিতা প্রভৃতি রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকটা পরিণতি লাভ করলেও মননসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে এখনও খুঁড়িয়ে চলছে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার অন্যতম উদ্দেশ্যই হল সে-ভাষাকে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান চর্চার বাহন হবার যোগ্যতা দান। কাজেই বি-এ পর্যায়েও সব রকম মননবিদ্যায় মাতৃভাষা প্রয়োগের কলাকৌশল শেখায় ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন আছে এবং দীর্ঘকাল থাকবে।

শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলাকে পূর্ণ মর্যাদা দানের দ্বিতীয় প্রধান অন্তরায় সরকারি কাজকর্মে, আফিসে-আদালতে ইংরেজির আধিপত্য ও বাংলা ভাষার প্রতি উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য। আজকাল সরকারের প্রভাব সর্বব্যাপী। তাই ইংরেজি ভাষা যতদিন কার্যতঃ সরকারি ভাষারূপে ব্যবহৃত হবে ততদিনই ইংরেজি শেখার গুরুত্ব এবং আবশ্যিকতা থেকে যাবে। তাই সরকারি এলাকায় ইংরেজিকে পূর্ণ মর্যাদায় বহাল রেখে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাকে পূর্ণ মর্যাদা দানের প্রয়াস ফুটো পাত্রে জল ঢালার মতোই ব্যর্থ হওয়া অনিবার্য।

একটা কথা যথাস্থানে বলতে ভুল হয়েছে। সে কথাটা এখানেই বলি। এক কালে ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রান্তের ছেলেমেয়েরা শান্তিনিকেতনে আসত, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাদর্শের আকর্ষণে। কেরল ('কেরালা' নয়) প্রদেশের কোনো-কোনো ছেলে আমার কাছে প্রায়ই আসত। তাদের মধ্যে একটি প্রখরবুদ্ধি ছেলেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"ভারতবর্ষে সাক্ষরতার বিচারে কেরলের স্থানই সর্বোচ্চে, তার কারণ কি?" সে জানাল—"সেখানে দু-রকম ইস্কুল আছে, উচ্চ ইংরেজি ইস্কুল (শিক্ষার বাহন ইংরেজি) আর উচ্চ মালয়ালম ইস্কুল (শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা)। ইংরেজি বাদে শিক্ষার বিষয় ও মান একই। গ্রাম ও শহরের বহু ছেলেমেয়ে (মেয়েরাই বেশি) পড়ে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ইস্কুলে। এসব ইস্কুল থেকে পাস-করা ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও ইংরেজি ইস্কুল থেকে পাস-করা ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি। এটাই কেরলে সাক্ষরতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ।" সে আরও বলল,—"আমার মা-ও মালয়ালম ইস্কুল থেকে সসম্মানে পাস করেছেন। আমরাও তাঁরই উৎসাহে ও সহায়তায় বাড়িতে অনেক লেখাপড়া শিখেছি।" আমার ছেলেবেলাতেও এখানেও দু-রকম ইস্কুল ছিল। উচ্চ বাংলা-ইস্কুল থেকে যাঁরা পরীক্ষায় পাস করতেন তাঁরা ইস্কুলে বাংলা পড়াতেন। এঁদের বলা হত 'সেকেণ্ড পণ্ডিত', সংস্কৃত-শিক্ষককে বলা হত 'হেড পণ্ডিত'। আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে 'সীতার বনবাস' পড়েছি সেকেণ্ড পণ্ডিতের কাছে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাঁর শিক্ষার ফলেই আমার সামনে খুলে গিয়েছিল ইংরেজি ও সংস্কৃত শেখার প্রশস্ত পথ। সে পথে চলার আনন্দ আজও আমার সহচর হয়ে আছে। আজকাল বাংলায় এম-এ পাস করা অধ্যাপকরাও এমন পাকা করে বাংলা শেখাতে পারেন না। এইসব বাংলা-ইস্কুল উঠে গেছে আমার ছাত্রাবস্থাতেই। তার ফল ভালো হয় নি। যা হোক, আমার বিশ্বাস, কেরলের সেই আদর্শ অনুসরণ করলে পশ্চিমবাংলা

থেকে সহজেই এবং অল্প সময়েই নিরক্ষরতা অপসারণ করা সম্ভব হবে। তবে এখন আর দু-রকম ইস্কুল রাখার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক ইস্কুলেই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষালাভের দুটি পথ খুলে দিতে হবে, একটা ইংরেজিহীন বিশুদ্ধ বাংলার কাঁচা পথ আর অন্যটি ইংরেজির শানবাঁধানো পাকা পথ। সাহস থাকলে এই দুই পথকেই বি-এ পাস-কোর্সের শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে নেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন (১৯৩৬)—"শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ। জগতে এই সর্বজন-স্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে-বারে পাওয়া যাবে।" তাঁর এই বাণীর (ও নিজের অভিজ্ঞতার) প্রেরণাতেই আমি অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে চলেছি। আজও করলাম।

নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি উক্তি এই—"যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তার হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি করা।" তার পরেই বলেছেন—"আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমশলা।" তার ফলেই তাঁর প্রাথমিক বাংলা মূর্তি কালক্রমে বিশ্বজনীন রূপ নিয়ে দেখা দিতে পেরেছিল। আমাদের দেশের আরও অনেক স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তির প্রাথমিক বাংলা মূর্তি এভাবেই পরিণত বয়সে বিশ্বজনীন রূপ নিয়ে আমাদের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। আজ যদি অগণিত বঙ্গসন্তানকে বিলিতি মাটি দিয়ে গড়ে তোলবার চেষ্টা না করে বাংলার মাটি দিয়ে গড়া হয় তাহলে ভয়ের কারণ নেই, বরং তাতেই তারা অনায়াসে ও স্বাভাবিকভাবে এই বিশ্বজনীনতার উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে।

মনে পড়ে 'ভাহা ইংরেজ' মধুসূদনের কথা (১৮৬৫)—"বাংলা অতি চমৎকার ভাষা। আমাদের মধ্যে যাঁরা অল্প বয়সের শিক্ষার দোষে এ ভাষা ভালো করে জানেন না অথবা তাকে অবহেলা করেন, তাঁরা নিরতিশয় ভ্রান্ত। যখন আমরা বহির্জগতের কাছে কিছু বলতে চাইব তখন আমরা যেন নিজের ভাষাতেই বলি। যিনি নিজের ভাষা ভালো করে আয়ত্ত না করেও নিজেকে শিক্ষিত বলে জাহির করেন তাঁর শিক্ষাভিমানকে ধিক্।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর

'কালেজী শিক্ষা' প্রবন্ধে বলেছেন (১৮৮০)—ইংরেজিবাহিত শিক্ষার ফলে "শিক্ষিতদের সহিত অশিক্ষিতদের মনোমিল থাকে না। শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ায়।" এখন এই দ্বিজাতিতত্ত্বের অভিশাপ থেকে বাঙালিকে রক্ষা করার একমাত্র পন্থা বাংলা ভাষাকে সর্ববিধ শিক্ষার বাহন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজিশিক্ষিত মনস্বী ব্যক্তিদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় প্রবর্ত্তিত করা, এই সমৃদ্ধ সাহিত্য প্রচারের দ্বারা ইংরেজি বিদ্যাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধান যথাসম্ভব কমিয়ে আনা।

বর্ত্তমান সময়ের একটা লক্ষণীয় বিষয় হল চতুর্দিকের নিবিড় অশিক্ষার পরিবেশের মধ্যেও বাংলা সংবাদপত্রের দ্রুত বর্ধমান জনপ্রিয়তা। আমি দেখেছি, অনেক নিরক্ষর ব্যক্তিও (তাদের মধ্যে সাঁওতাল আছে) পরম আগ্রহে জানতে চায়, খবরের কাগজ কি লিখেছে বা রেডিওতে কি বলেছে। তাতেই বোঝা যায় দেশের সাধারণ মানুষের মনে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের আগ্রহ কত প্রবল। দেশে সর্বজনীন ইংরেজি শিক্ষার আলেয়ার পিছনে না ছুটে যদি শুধু মাতৃভাষার যোগে এমন প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যায় যাতে সকলেই বাংলা সংবাদপত্র পড়ে দেশ-বিদেশের কথা অন্ততঃ মোটামুটি-ভাবেও বুঝতে পারে, তাহলেই আমাদের গণতন্ত্র দেশের জনচিত্তে বদ্ধমূলরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। নতুবা যে-কোনো সংকটকালে এই গণতন্ত্র ভেঙে পড়তে পারে, এই আশঙ্কা অমূলক নয়। শুধু ইংরেজিশিক্ষিতরা সে সংকটকালে গণতন্ত্রকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না।

এইজন্যই চাই বাংলা শিক্ষা ও বাংলা সংবাদপত্রের অবারিত বিস্তার। আধুনিক কালে বাংলা সংবাদপত্রগুলিই হয়ে উঠেছে ব্যাপক জনশিক্ষার ও নাগরিক-চেতনা-সঞ্চারের শ্রেষ্ঠ বাহন এবং বিদ্যালয়লব্ধ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান পরিপূরক। তাই দেশে বাংলা শিক্ষা ও বাংলা সংবাদ পত্রের সমান অগ্রগতি জাতীয় কল্যাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

আমি ইংরেজি-শিক্ষার বিরোধী নই। যদি শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর থেকে শুধু আগ্রহী ও মেধাবী ছাত্রদের ইংরেজি শেখার ভালো ব্যবস্থা করা যায় অথবা তাদের ইংরেজি শিখতে উৎসাহিত করা যায়, তাহলে আমাদের উত্তরপুরুষেরা বর্তমান সংসদসদস্যদের চেয়েও উচুমানের ইংরেজি বলতে পারবেন, এ বিষয়ে

আমি নিঃসন্দেহ। আর তাঁরাই ইংরেজি-বিদ্যার সুফল দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারবেন মাতৃভাষার যোগে।

যাঁরা ইংরেজি বিদ্যালাভের জন্য আগ্রহী সেই উপরতলার স্বল্পসংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের পথে আমি অন্তরায় ঘটাতে চাই না। কিন্তু কলুসন্তান রামানন্দ পালের মতো নিচুতলার অগণিত চিরদুঃখী অজ্ঞ জনগণের আশু অভ্যুদয় আমি কামনা করি সর্বান্তঃকরণে।

পরিশেষে সবিনয়ে জানাই, একমাত্র বাংলা ভাষাকেই আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার একমাত্র বাহনরূপে মেনে নেবার পক্ষে যে এত কথা বললাম তার মূলে আছে বিশুদ্ধ শিক্ষানীতির প্রেরণা আর জনকল্যাণ-কামনা—আমার কোটি-কোটি ভাই-বোনের পুরুষানুক্রমিক নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার অভিশাপ-মুক্তির কামনা। আর, তাতেই সার্থক হবে আমাদের দেশের স্বাধীনতালাভ ও গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা।

বাঙালি জাতি ও বাংলার জাতীয় সাহিত্য

আমাদের দেশে এককালে শুধু কাব্যজাতীয় কল্পনাত্মক রচনামাত্রকেই বলা হত 'সাহিত্য'। বস্তুতঃ কাব্য ও সাহিত্য পরস্পরের প্রতিশব্দ বলেই গণ্য হত। তার আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে, তার লক্ষ্য মানুষের হৃদয়ে নানাবিধ অনুভূতি সঞ্চার করে তাকে জাগিয়ে তোলা। তার প্রকাশ হত গদ্য প্রপদ্যময় ভাষায়। নাটক এবং উপন্যাসও কাব্য তথা সাহিত্য বলে গণ্য। পক্ষান্তরে ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি পদ্যে লেখা হলেও সাহিত্য বলে গণ্য হত না। আধুনিক কালে কাব্য ও সাহিত্য অভিন্নার্থক বলে গণ্য হয় না। আজকাল 'কাব্য' শব্দের অর্থসংকোচ ঘটেছে আর 'সাহিত্য' শব্দের ঘটেছে অর্থব্যাপ্তি। নাটক-উপন্যাসকে এখন আর কাব্য বলা হয় না। পক্ষান্তরে কাব্য নাটক উপন্যাস তো সাহিত্য বলে গণ্য হয়ই, অধিকন্তু বিজ্ঞানসাহিত্য, দর্শনসাহিত্য, ইতিহাস সাহিত্য ইত্যাদি প্রয়োগও সুপ্রচলিত। আসলে মানব-মনের যে-কোনো রকম ভাষাগত সুশৃঙ্খল প্রকাশই আজকাল সাহিত্য বলে স্বীকৃত। সংক্ষেপে বলা যায়, ভাষাযোগে মানুষের আত্মপ্রকাশেরই নামান্তর সাহিত্য। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনেও এই ব্যাপক অর্থ টাই মেনে নেওয়া হয়েছে। কেননা মানুষের মনোজীবনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই তাঁর রচিত সাহিত্যেরও অর্থবিস্তার ঘটেছে।

সাহিত্যের কাজ মানুষের চিন্তাভাবনা, আনন্দবেদনা ও ইচ্ছাসংকল্পকে এক মন থেকে সকলের মনে সঞ্চারিত করা। সাহিত্য এভাবেই বহু মানুষকে এক-সঙ্গে বেঁধে সংহত করে। তাতেই গড়ে ওঠে এক-একটি সমভাষী সংঘবদ্ধ মানবগোষ্ঠী, যা আধুনিক কালে পরিণত হয়েছে এক-একটি আত্মসচেতন নেশনে বা জাতিতে। বাঙালি জাতিও এমনি করেই গড়ে উঠেছে বাংলা-ভাষার প্রভাবেই। আর বাংলাভাষী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাসভূমি সমগ্রভাবে পরিচিত হয়েছে 'বাংলাদেশ' নামে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি ('বাংলাভাষা পরিচয়, অধ্যায়-৭) এই—

"বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়, অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে

এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এত কাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলা প্রদেশের অংশ-প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারি দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি।"

এখানে বলা উচিত যে, বাংলাদেশের ইতিহাস নিছক খণ্ডতারই ইতিহাস নয়, সে ইতিহাস আসলে খণ্ডতা থেকে ঐক্যে উত্তরণের ইতিহাস। সে উত্তরণও দীর্ঘকাল ধরে ঘটিয়ে আসছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই। সে প্রক্রিয়া আজও সমাপ্ত হয় নি। সে প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে সহায়তা করেছে বাংলা-দেশের ভৌগোলিক ঐক্য, অর্থাৎ তার অখণ্ডনীয়তা। সে প্রসঙ্গ এখন থাক্। বাঙালি জাতির ঐক্যে উত্তরণের ঐতিহাসিক ক্রমটা একটু ভেবে দেখা যাক।

আধুনিক অখণ্ড বাংলাদেশ এক কালে বিভক্ত ছিল রাঢ় (উত্তর ও দক্ষিণ), তাম্রলিপ্তি (তমলুক অঞ্চল), গৌড় (মুরশিদাবাদ ও মালদহ অঞ্চল), পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ), সমতট (মেঘনার পূর্ববর্তী কুমিল্লা অঞ্চল), বঙ্গ (মেঘনার পশ্চিম ভূখণ্ড , বঙ্গাল (খুলনা-বরিশাল অঞ্চল) প্রভৃতি কয়েকটি জনপদে। এক কালে দক্ষিণ রাঢ় পরিচিত ছিল 'সুহ্ম' নামে আর আমার বিশ্বাস উত্তর রাঢ়ের নাম ছিল 'ব্রহ্ম'।[১] এসব বিভাগকে সেকালে বলা হত 'জনপদ', মানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাসভূমি। তাদের সকলের বাসভূমিকে সমগ্রভাবে বলা যেতে পারে 'মহাজনপদ'। এই মহাজনপদই কালক্রমে পরিচিত হয়েছে 'বাংলাদেশ' নামে। সেকালে এই মহাজনপদের ঐক্যবোধও ছিল না। ফলে তার ঐক্যজ্ঞাপক কোনো বিশিষ্ট নামও ছিল না। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী থেকে অনুমান করা যায়, এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে হয়তো কিছু উদ্ভবসূত্রগত (racial) ঐক্যও ছিল। কিন্তু সে ঐক্যের টান খুব প্রবল ছিল বলে মনে হয় না। তাদের মধ্যে স্বার্থসংঘাত তথা যুদ্ধবিগ্রহও ঘটত। ফলে তাদের বাসভূমির সীমারেখার সংকোচন-প্রসারণও যে ঘটত তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, তাম্রলিপ্তি যে এক সময়ে ছিল বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আবার অন্য সময়ে ছিল সুহ্মরাজ্যের অন্তর্গত, তা জানা যায় যথাক্রমে জৈন 'প্রজ্ঞাপনা' ও দণ্ডী-প্রণীত 'দশকুমার-চরিত' গ্রন্থের 'অবন্তীসুন্দরী-কথা' থেকে। তবে এসব জনপদ-বাসীদের মধ্যে ভাষাগত একটা মৌলিক সমতাও ছিল বলেই মনে করা হয়।

১. দ্রষ্টব্য গ্রন্থের শেষে 'অনুষঙ্গ' বিভাগে 'সুহ্ম ও ব্রহ্ম' প্রসঙ্গ।

কিন্তু তাদের সে আদিম ভাষা ছিল অতি দুর্বল। তাই কালক্রমে সে ভাষার প্রায় সবটুকু দখলই ছেড়ে দিতে হয়েছিল বহিরাগত সংস্কৃত (আর্য) ভাষার কাছে। এখন বাংলাভাষায় সেই আদিম ভাষার লুপ্তাবশেষ খুঁজে বার করতে হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে। এই সমুন্নত সংস্কৃত ভাষাই আমাদের বাংলাভাষায় সঞ্চার করেছে বিপুল প্রকাশশক্তি, বাংলাসাহিত্যকে দিয়েছে অসামান্য গৌরব আর বাঙালির চিত্তে জাগিয়েছে জাতীয় ঐক্যবোধ। কিন্তু তা সহসা হয় নি, হয়েছে কালক্রমে।

আবার সেই আদিম জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সুহ্ম, ব্রহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ, বঙ্গাল প্রভৃতি আসলে এক-একটি জনগোষ্ঠীর নাম, পরে তাদের বাসভূমিও সেসব নামেই পরিচিত হয়।

বঙ্গ ও বঙ্গালদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি এবং তাদের বাসভূমি কোথায় ছিল তা নিয়ে কিছু সংশয় দেখা যায়। মনে হয় বঙ্গ ও বঙ্গাল একই জনগোষ্ঠীর দুই শাখা। 'বঙ্গ' নাম অতি প্রাচীন।[১] 'বঙ্গাল' নাম নবম শতকের আগে পাওয়া যায় না। 'বঙ্গাল দেশ' ও 'বঙ্গাল রাগ', এই দুটি নাম পাওয়া যায় ভুসুকু-রচিত দুটি চর্যাগীতিতে (৪৯,৪৩)। তাতে অনুমান করা যায়, সংগীতজগতে বঙ্গালদের দান উপেক্ষিত ছিল না। কিন্তু সমাজে তারা নিন্দিতই ছিল। তাও জানা যায় ভুসুকু-রচিত একটি চর্যাগান (৪৯) থেকে—

> আজি ভুসুকু 'বাঙ্গালী' ভইলী,
> নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।

বোঝা যাচ্ছে বঙ্গালীরা, তখন চণ্ডালদের সমপর্যায়ভুক্ত বলেই গণ্য হত। তবু ভুসুকুপাদ জেনেশুনেই চণ্ডালীকে ঘরণী করে 'বঙ্গালী' নামের নিন্দাকে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হন নি। এই হিসাবে রামী-প্রেমিক চণ্ডীদাসকে বলা যায় ভুসুকুপাদের উত্তরসাধক। 'বঙ্গাল'-নিন্দার আর-এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ-প্রণীত 'টীকাসর্বস্ব'-নামক অমরকোষের টীকায় (১১৫৯-৬০)। এই টীকায় এক স্থানে তিনি বলেছেন, 'বঙ্গাল'দের একটি প্রিয় খাদ্যের নাম 'সিধ্মল'। আধুনিক 'বঙাল' ভাষায় বলা হয় 'সিধল', এরকম শুঁটকি মাছ। এর থেকে বোঝা যায়, দ্বাদশ শতকেও রাঢ় প্রদেশে বাঙালরা 'শুঁটকিখোর' বলে নিন্দিত ছিল। এটাই বোধ করি রাঢ়ী-বাঙালের পারস্পরিক নিন্দাভাষণের ('ঘটী-বাঙাল') প্রথম নিদর্শন। বঙ্গালরা এভাবে নিন্দিত

১. দ্রষ্টব্য গ্রন্থের শেষে 'অনুষঙ্গ' বিভাগে 'বঙ্গ' প্রসঙ্গ।

হলেও সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের দান উপেক্ষিত ছিল না। সংগীতে বঙ্গাল রাগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্গালদের কৃতিত্বের কিছু প্রমাণ আছে শ্রীধর দাসের সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে (১২০৬)। এই গ্রন্থের একটি শ্লোকে 'বঙ্গালবাণী'-কে তুলনা করা হয়েছে কবিনিন্দিতা পুণ্যসলিলা গঙ্গানদীর সঙ্গে ('অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ')। এই শ্লোকের 'বঙ্গালবাণী' কথার ব্যাখ্যায় কিছু মতভেদ আছে। কারও মতে বঙ্গালবাণী মানে 'বাংলাবাণী', আর অন্য মতে 'বঙ্গাল কবির বাণী'—সংস্কৃত ভাষায়। এই দ্বিতীয় মতটাই যুক্তিসংগত বলে মনে করি।[১] 'বঙ্গালবাণী' মানে বাংলাবাণীই হোক বা সংস্কৃতবাণীই হোক, বঙ্গালবাণী যে এসময়ে অবজ্ঞাত ছিল না, বরং সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিই পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। নতুবা এই শ্লোকটি সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে সংকলনযোগ্য বলে গণ্য হত না।

এখন দেখা যাক, বঙ্গালদের বাসভূমি অর্থাৎ বঙ্গালদেশের অবস্থান কোথায়? তামিল-সম্রাট্ রাজেন্দ্র চোলের সেনাবাহিনী এক অভিযানে দক্ষিণ রাঢ়ের (অর্থাৎ সুহ্মের) রাজা রণশূরকে পরাভূত করে গঙ্গার পূর্বতীরে বঙ্গালদেশের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, তার পরে আবার গঙ্গা পার হয়ে উত্তর রাঢ় (ব্রহ্ম) অধিকার করে (১০২১-২৩)। এর থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, একাদশ শতকে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী ভূখণ্ডই পরিচিত ছিল 'বঙ্গালদেশ' নামে। সদুক্তিকর্ণামৃতের পূর্বোক্ত শ্লোকটিতে গঙ্গা ও বঙ্গালবাণীকে যেভাবে যুক্ত করা হয়েছে তাতেও পরোক্ষ এই মতই সমর্থিত হয়। বঙ্গালভূমি গঙ্গা থেকে দূরবর্তী ছিল না বলেই এই উপমা কবির মনে এত সহজে আসতে পেরেছে। যা হোক, এ ছাড়া আরও নানা তথ্যের বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার গঙ্গার বিভিন্ন শাখাবেষ্টিত ভূভাগই সে সময়ে বঙ্গালদেশ দেশ নামে পরিচিত। কিন্তু উত্তর কালে বঙ্গালদেশের সীমাসংকোচ ঘটে এবং পূর্ববাংলার দক্ষিণাংশটুকুই বঙ্গাল নামে পরিচিত হয়। চৈতন্যভাগবতে (১।১০) আছে, নবদ্বীপবাসী শ্রীচৈতন্য বাঙালদের ভাষা নিয়ে পরিহাস করতেন—

> বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া
> বাঙালের কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।

১. দ্রষ্টব্য দীনেশচন্দ্র সরকার-প্রণীত 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ' (১৯৮২), পৃ ১৯৩-৯৬।

দেখা যাচ্ছে সেকালে বঙ্গদেশ আর বাঙালদেশ সমার্থক হয়ে গিয়েছে। কৃত্তিবাসের আত্মচরিতে (চতুর্দশ শতক) আছে—

বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥

গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে তখন বঙ্গদেশ বলতে বোঝাত পূর্ববাংলার একাংশকে—প্রধানতঃ বিক্রমপুর অঞ্চলকে। গঙ্গার পূর্বতীরস্থ ভূভাগও গৌড়ের অন্তর্গত বলে গণ্য হত। তখন গৌড় প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল নবদ্বীপ। অথচ সুপ্রাচীন কালে গঙ্গার শাখা প্রশাখাবেষ্টিত সমগ্র ভূখণ্ডই বঙ্গদেশ বলে স্বীকৃত ছিল। কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে রঘুর দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—দিগ্‌বিজয়কামী রাজা রঘু সমুদ্রতীরবর্তী শ্যামল জনপদগুলির অভিমুখে যাত্রা করে প্রথমেই প্রবেশ করলেন সুহ্ম-জনপদে (দক্ষিণ রাঢ়ায়)। সুহ্মরাজ নদীস্রোতে বেতস-লতার ন্যায় আনত হয়ে রঘুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করলেন—"আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্" (রঘু ৪।৩৫)।[১] পক্ষান্তরে বঙ্গরাজারা 'অনম্র' রইলেন এবং রণতরী নিয়ে এগিয়ে এসে রঘুর বিজয়বাহিনীকে বাধা দিলেন। কিন্তু রঘু বাহুবলে তাঁদের উৎখাত করে গঙ্গাস্রোতোবেষ্টিত বঙ্গভূমিতে কয়েকটি জয়স্তম্ভ (জয়স্তম্ভান্) প্রোথিত করলেন। অতঃপর বিজয়ী রাজা রঘু উৎখাত বঙ্গরাজগণকে তাঁদের রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বাংলাদেশের 'উৎখাত-প্রতিরোপিত' কলমা ধান (কলম-ধান্য) যেমন শস্যভারে আভূমি-অবনত হয়ে ভূস্বামীর সন্তোষসাধন করে, পরাভূত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গরাজারাও তেমনি ধর্মবিজয়ী রঘুর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে ধনরত্নাদি উপঢৌকনে পরিতুষ্ট করলেন।—

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতো'ন্তরেষু সঃ॥
আপাদপদ্মপ্রণতা কলমা ইব তে রঘুম
ফলৈঃ সংবর্ধয়ামাসুরুৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ।—রঘু ৪।৩৬-৩৭

এর থেকে বোঝা যায়, কালিদাসের সময়ে (পঞ্চম শতকে) সুহ্ম বা দক্ষিণ রাঢ়ভূমির পূর্বসীমাবর্তী গঙ্গার পরপারেই অবস্থিত ছিল বঙ্গজনপদ এবং ওই জনপদের মধ্য দিয়ে গঙ্গার বহু ধারা প্রবাহিত ছিল। সুতরাং তারা যে নৌবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল তা অপ্রত্যাশিত নয়।

১. দ্রষ্টব্য গ্রন্থের শেষে 'অনুষঙ্গ' বিভাগে 'সুহ্ম ও ব্রহ্ম' প্রসঙ্গ।

কালিদাসের বর্ণনায় দেখা যায়, রঘু বঙ্গজনপদ অধিকার করে সেখানে কয়েকটি জয়স্তম্ভ (জয়স্তম্ভান্) প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে মনে হয় কালিদাসের সময়ে (পঞ্চম শতক) বঙ্গজনপদ কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল আর এজন্যই বিভিন্ন রাজ্যে এক-একটি করে জয়স্তম্ভ স্থাপন করতে হয়েছিল। আরও মনে হয়, সে সময়ে এসব রাজ্যের অধিপতিরা সমবেত হয়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে দ্বিধা করতেন না। কালিদাসের কল্পনার মূলে এরকম কোনো ঐতিহাসিক সত্য না থাকলে 'জয়স্তম্ভান্' না লিখে শুধু 'জয়স্তম্ভং' লিখলেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত, ছন্দেও ত্রুটি ঘটত না। বস্তুতঃ উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থনও পাওয়া যায়। কবি কালিদাসের অল্পকাল পূর্বে 'চন্দ্র' নামে এক মহাপরাক্রান্ত রাজার বঙ্গবিজয়ের বর্ণনা দেখা যায় দিল্লির নিকটবর্তী মেহেরৌলি নামক স্থানের লৌহস্তম্ভে ক্ষোদিত প্রশস্তিতে। তাতে আছে রাজা চন্দ্র বঙ্গজনপদে 'সমবেতভাবে আগত' শত্রুদের (শত্রূন্ 'সমেত্যা-গতান্' বঙ্গেষু) যুদ্ধে প্রতিহত করে মহাকীর্তি অর্জন করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন বঙ্গজনপদবাসীরা বহিঃশত্রুর আক্রমণকালে সমবেত শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে বা শত্রুকে প্রতিহত করতে অভ্যস্ত ছিল। তাই মনে হয় কবি কালিদাস বঙ্গনৃপতিদের সমবেত প্রতিরোধের কথা স্মরণ করে সচেতন ভাবেই বহুবচনে 'জয়স্তম্ভান্' শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির মানচিত্রে দেখা যায় গঙ্গার শাখা-প্রশাখার অন্তর্বর্তী ভূখণ্ডকেই বলা হয়েছে 'গঙ্গরিডি'। অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গভূমিই গ্রীকদের কাছে পরিচিত ছিল 'গঙ্গরিডি' নামে। এইজন্যই ইতিহাসদর্শী কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে অভিহিত করেছেন 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' নামে। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণকালে (৩২৬-২৭ খ্রী-পূ) গঙ্গরিডি রাজ্যের সামরিক খ্যাতি ছিল বহুবিশ্রুত। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের পরিচালনায় গ্রীক বিজয়বাহিনী মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে বিপাশা নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত এগিয়ে এল। কিন্তু অপর দিকে মগধ (প্রাসিওই) ও বঙ্গ (গঙ্গরিডি) রাজ্যের মিলিত বাহিনীও প্রস্তুত ছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। এই মিলিত বাহিনীর, বিশেষতঃ বঙ্গরাজ্যের দুর্ধর্ষ হস্তিবাহিনীর বিশালতা ও পরাক্রমের কথা জেনে গ্রীক বাহিনী আর সম্মুখ সমরে অগ্রসর হতে সাহসী হল না। ফলে আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে স্বদেশ

অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্যটুকুই প্রতিধ্বনিত হয়েছে কবি সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে।—

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গমুখো ফৌজ আলেকজান্দারী
ঘরমুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি।

মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের (৩২২-২৯৮ খ্রী-পূ) পূর্বেই এই গঙ্গরিডি বা বঙ্গরাজ্য যে মগধ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার কিছু প্রমাণ আছে। আর মৌর্য রাজশক্তি যে একটি নৌবাহিনীর উপরে নির্ভর করত, তা যে অনেকাংশে এই গঙ্গাস্রোতোবেষ্টিত বঙ্গভূমিতে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে, তাতেও সন্দেহ নেই। আর ধোধ করি বঙ্গরাজের নৌবাহিনীই সেকালে পরিণত হয়েছিল মৌর্য নৌবাহিনীতে। এই প্রাসঙ্গিক বিবরণকে আর বাড়াবার প্রয়োজন নেই। তবু এটুকু বলা অন্যায় হবে না যে, এই সাগরতীরবর্তী বঙ্গজনেরা সাগর-উত্তরণেও কম দক্ষ ছিল না, তা মনে করার কারণ আছে।

কালিদাসে বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, সে সময়ে বঙ্গজনদের প্রধান শস্য ছিল 'কল্‌মা' ধান এবং সে ধান উৎখাত-প্রতিরোপিত হত। আশ্চর্যের বিষয়, কালিদাসের দেড় হাজার বছর পরে এখনও এই ধান বাংলার অন্যতম প্রধান শস্য বলে গণ্য এবং তুলে-রোয়াই তার উৎপাদন-পদ্ধতি। এই ধানের ফলনও বেশি। কালিদাসের বর্ণনাতেও কল্‌মা ধানের ফলনাধিক্যের উল্লেখ আছে। আজকাল এই ধান অঞ্চলভেদে কোথাও কল্‌মা বা দুধকল্‌মা, কোথাও কলমাকাঠি নামে পরিচিত। এ বিষয়ে আর-একটা স্মরণীয় কথা এই যে, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রও 'অন্নদার রন্ধন' প্রসঙ্গে এই ধানের উল্লেখ করেছেন।—

সুধা 'দুধকলমা' খড়িকামুটি রান্ধে,
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্ধে।…
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু,
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু।

দুই যুগের দুই শ্রেষ্ঠ কবি কলমা ধানকে বাঙালির ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছেন। মনে হয় কলমা ধান গঙ্গার এপারে-ওপারে রাঢ়ে ও বঙ্গে উভয়ত্রই অন্যতম প্রধান শস্য বলে গণ্য হত।

দেখা গেল সুপ্রাচীন কালে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী শাখানদীপ্লাবিত ভূখণ্ডই পরিচিত ছিল 'বঙ্গ' নামে। বঙ্গদের বাসভূমি পূর্ব দিকে বিস্তৃত ছিল মেঘনার

পশ্চিম তীর পর্যন্ত। উত্তরকালে এই বৃহৎ বঙ্গজনপদের দক্ষিণাংশ (গঙ্গাতীর পর্যন্ত) পরিচিত হয় 'বঙ্গাল' নামে। মনে রাখা উচিত, বঙ্গ ও বঙ্গাল নাম সমার্থক নয়, তাদের বাসভূমিও অভিন্ন নয়। নানা প্রাচীন অভিলেখে একই সঙ্গে বঙ্গ ও বঙ্গাল নামের উল্লেখ দেখা যায় দুটি স্বতন্ত্র জনপদ বা রাজ্যের নাম হিসাবে। এমন কি, চতুর্দশ শতকেও যে বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি স্বতন্ত্র জনপদ বা রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'তারিখ-ই-ফিরূজশাহী' নামে একটি ফারসি ইতিহাসগ্রন্থে। কিন্তু চৈতন্যদেবের সময়ে গৌড় -অঞ্চলে বঙ্গ ও বঙ্গাল যে অভিন্ন বলে স্বীকৃত হত, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। তার পরে নানা কারণে, বোধ করি প্রধানতঃ পোর্তুগীজ প্রভাবে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা নামটাই প্রাধান্য পেতে থাকে। আর বাদশা আকবরের রাজধানীতে বসে আবুলফজল প্রায় সমগ্র প্রদেশটাকে বললেন 'সুবা বাঙ্গালা'। রাজকীয় প্রভাব অলঙ্ঘনীয়। রাজকীয় কাগজে-পত্রে এই নামই প্রচলিত হল। তার পূর্বে আধুনিক কালের সমগ্র বাংলাদেশ কোনো এক নামে পরিচিত ছিল না। ক্রমে 'বাঙ্গালা' নাম সাহিত্যেও স্বীকৃতি পেল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের গ্রন্থরচনায় বর্গিদের আক্রমণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> লুঠি 'বাঙ্গালা'র লোকে করিল কাঙ্গাল।
> গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকোর জাঙ্গাল ॥

বোঝা যাচ্ছে, সে সময়ে গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ রাঢ়ভূমিও 'বাঙ্গালা' দেশের অংশ-বিশেষ বলেই স্বীকৃত হয়েছে। ফলে বাঙালির চিন্তাভাবনা থেকে পুণ্ড্র, সুহ্ম, ব্রহ্ম, সমতট প্রভৃতি ভৌগোলিক বিভাগের ধারণা তিরোহিত হল। কিন্তু রাঢ়, বরেন্দ্র, গৌড়, বঙ্গ, বঙ্গাল (বাঙাল) প্রভৃতি একেবারে লোপ পেল না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এসব নামের ভৌগোলিক তাৎপর্যবোধ ক্রমে ক্ষীণ ও প্রভাবহীন হয়ে এসেছে। যেমন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বঙ্গজ কায়স্থ প্রভৃতি শব্দ মূলতঃ ভৌগোলিক বিভাগ-সূচক হলেও বর্তমানে এসব শব্দের দ্বারা শুধু সামাজিক বিভাগই বোঝানো হয় বাসভূমি-নিরপেক্ষ ভাবে। তেমনি আবার রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণের নাম হল 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', যদিও তার ইংরেজি সংস্করণের নাম *Bengalee Grammar*। মধুসূদনের 'গৌড়জন' মানে ব্যাপকার্থক বঙ্গজন বা বাঙালি।[১] আবার তিনি যখন বলেন—'অলীক কুনাট্য-রঙ্গে মজে লোক-রাঢ়ে বঙ্গে', তখন বঙ্গ মানে হয় পূর্ববাংলা আর রাঢ়

১. দ্রষ্টব্য গ্রন্থের শেষে 'অনুষঙ্গ' বিভাগে 'গৌড়' প্রসঙ্গ

মানে হয় পশ্চিম বাংলা। কিন্তু যুক্তভাবে 'রাঢ়বঙ্গ' মানে হয় সমগ্র বাংলা— উত্তর বাংলা সহ। কেননা রাঢ়ভূমি দীর্ঘকাল গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পক্ষান্তরে মধুসূদনের 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' এই উক্তির বঙ্গ মানে সোজাসুজি সমগ্র বাংলাদেশ। এসব ভৌগোলিক নামের অর্থগত অ-স্থিরতা অনেকাংশেই নিরস্ত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে। অবশ্য এ বিষয়ে কবি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাবও কম ছিল না। যেমন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ' কিংবা 'বাঙালি তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না?' ইত্যাদি উক্তি থেকে বঙ্গ ও বাঙালি শব্দ-দুটি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আর-একটু সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন আছে। আমাদের এই বাসভূমির নামটা আসলে কি হওয়া উচিত—বঙ্গদেশ না বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ না পশ্চিম বাংলা? বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রিকার নাম 'বঙ্গদর্শন' বটে, কিন্তু সাধারণভাবে তিনি ব্যবহার করতেন 'বাঙ্গালা'। যেমন…বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালার ইতিহাস। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত করেন 'বাংলা'—বাঙ্গালা-র সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন—'বাংলার মাটি বাংলার জল'। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, বিশেষ-ক্ষেত্রে 'বঙ্গ' নাম স্বীকার করা গেলেও (যেমন বঙ্গভূমি, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গোপসাগর) এ নাম সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী নয়। আমরা নিজেদের পরিচয় দিই 'বাঙালি' বলে (বঙ্গবাসী নয়), আমাদের ভাষার, প্রচলিত নাম 'বাংলাভাষা' (বঙ্গভাষা নয়)। বহির্জগতেও **Bengal** ও **Bengali**-ই প্রচলিত। সারা ভারতেও আমাদের দেশ, ভাষা ও জাতির যে নাম প্রচলিত তা 'বঙ্গাল' শব্দেরই রূপান্তর, 'বঙ্গ' শব্দের নয়। আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গ ও বঙ্গাল এই দুই নামই প্রচলিত ছিল। তবু তাঁর সাম্রাজ্যের এই প্রত্যন্ত সুবাটির নাম রাখা হয়েছিল 'বাঙ্গালা' বোধ করি প্রয়োগ-বাহুল্যের প্রতি নজর রেখেই। অর্থাৎ ইতিহাসের রায় গিয়েছে 'বাঙ্গালা' বা 'বাংলা' নামের দিকেই, 'বঙ্গ' নামের দিকে নয়।

সব শেষে 'বঙ্গাব্দ' শব্দের সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে কোনো বিশেষ অব্দগণনার প্রচলন ছিল না। তুরকি-বিজয়ের পরে রাজকীয় ব্যবহারে হিজরী অব্দগণনা স্বীকৃত হল। সাহিত্যিক বা সামাজিক ব্যবহারে ক্রমে দেখা দিল শকাব্দ বা বিক্রম সংবৎ। এই দুই অব্দের ব্যবহার ঊনবিংশ শতকেও যথেষ্ট দেখা যায়। বোধ করি বিংশ শতকের প্রথম দুই-তিন দশকে এই দুই অব্দগণনা লুপ্ত হয়ে যায়। আকবরের বাংলাবিজয়ের পরে

রাজকার্যে হিজরী সালের বদলে প্রচলিত হল 'ফসলী সাল'। হিজরী অব্দগণনা হত ৩৫৪ দিনের চান্দ্র বৎসর অনুসারে। তাতে ঋতুপর্যায় ও মাসগণনায় কোনো সংগতি থাকে না। অর্থাৎ কোন্-কোন্ মাসে কোন্ ঋতু হয় তা বলা সম্ভব হত না। ফলে কোন্ মাসে কোন্ ফসল জন্মায় তাও নির্দিষ্টরূপে বলা যেত না। তাই রাজস্ব আদায়ের কোন নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করা সম্ভব হত না। এইজন্যই তখন থেকে 'ফসলী সাল' (৩৬৫ দিনের সৌর বৎসর) গণনার রীতি প্রবর্তিত হল। কিন্তু তার পূর্বে যত চান্দ্র বৎসর অতীত হয়েছে সে সংখ্যার সঙ্গেই নূতন সৌর বৎসরের সংখ্যা যুক্ত হতে লাগল। এই সরকারি 'ফসলী সাল'ই পরে 'বঙ্গাব্দ' নামে পরিচিত হয়েছে। কখন থেকে হয়েছে ঠিক বলতে পারব না। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য থেকে মনে হয় সে সময়েও শকাব্দ-গণনা বেশ প্রচলিত ছিল। কবি নিজেই এই কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করেছেন শকাব্দ অনুসারে।

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই 'শকে' এই গীত ভারত রচিলা॥

অর্থাৎ অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচনাকাল ১৬৬৪ শকাব্দ (অর্থাৎ বাং ১১৪৯, ইং ১৭৪২-৪৩)। ভারতচন্দ্র বরগীর বিভ্রাট্-কালও নির্দেশ করেছেন শকাব্দ অনুসারেই—

'শাকে' আগে মাতৃকা যোগিনীগণ:শেষে।
বরগীর বিরাট হইবে এই দেশে॥

অর্থাৎ বরগী-উৎপাতের তারিখ ১৬৬৪ শকাব্দ (অর্থাৎ বাং ১১৪৯, ইং ১৭৪২-৪৩)। কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্তের বহুপ্রচারিত 'সংবাদপ্রভাকর' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় স্বীকৃত হয়েছিল বঙ্গাব্দ। এখন পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলায়ই মেনে নেওয়া হয়েছে এই বঙ্গাব্দকেই। তবে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে খ্রীস্টীয় অব্দের ব্যবহার দিনদিন বেড়ে চলেছে উভয়ত্রই।

সবশেষে বলা উচিত যে, বঙ্গাব্দ গণনা অনৈতিহাসিক ও অবাস্তব। কেননা তার প্রথম প্রায় দশ শতাব্দী গণিত হয়েছে চান্দ্রবৎসর অনুসারে আর শেষ চার শতাব্দী গণিত হচ্ছে সৌরবৎসর অনুসারে। এখন চলছে ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ। অথচ ১৩৮৯ বৎসর (সৌর বা চান্দ্র) পূর্বে কোনো স্মরণীয় ঘটনাই ঘটে নি কোথাও—বাংলাদেশেও না, আরবেও না। এ-রকম আজব বা 'হাঁসজারু' অব্দগণনা পৃথিবীর আর কোথাও চলে বলে মনে হয় না। এর দ্বারা বাঙালি

জাতির ঐতিহাসিক চেতনার একান্ত অভাবই সূচিত হয়। ইতিহাসনিষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রও বঙ্গাব্দগণনার এই ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, বরং এ বিষয়ে তিনি কিছু ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করতেন, এমন মনে করার কারণ আছে।

২

দেখা গেল পুণ্ড্র, সুহ্ম, ব্রহ্ম, গৌড় বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি বহু জনপদে বিভক্ত কতকগুলি জনগোষ্ঠী নানা ঐতিহাসিক কারণে কালক্রমে ভাষাগত ও ভৌগোলিক ঐক্যচেতনায় সংহত হয়ে একজাতীয়তার পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু পূর্ণ সামাজিক সংহতি ও ঐক্যচেতনা এখনও হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েও ছিল না। 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে (১৮৭২) তিনি বলেছেন—"ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোনো প্রদেশীয় লোক সর্বাংশ এক··· তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতাবোধ নাই।" এই যে জাতীয় ঐক্যচেতনার অভাব, তার প্রধান কারণ তিনটি—সমাজভেদ, মর্মভেদ ও শিক্ষাগত অসাম্য। বিংশ শতকেও দেখি, আমাদের ইতিহাস-লেখকরা অনেকেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য ইত্যাদি ধরনের সমাজচিন্তার দ্বারাই চালিত হচ্ছেন, বাঙালি জাতির ঐক্যচেতনা তাঁদের চিন্তায় স্থান পায় নি। এই কথা বলে ইতিহাস-সাধক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও আক্ষেপ করে গিয়েছেন (১৯১২)। ভাগ্যক্রমে এই মধ্যযুগীয় মনোভঙ্গি এখন আর নেই। কিন্তু একজাতীয়তার চেতনা এখনও আমাদের মনে প্রবল ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। তা যদি হত তবে আমাদের শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই বাংলায় ইতিহাস পড়াবার ব্যবস্থা হত আর উচ্চতম স্তরে চলত বাংলার ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক গবেষণা। অন্য সব সভ্যদেশেই জাতীয় সাহিত্যচর্চার ন্যায় স্বদেশের ইতিহাসচর্চাও চলে পরম যত্নসহকারে। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই আমাদের শিক্ষার এদিকটা এখনও একেবারেই অন্ধকার রয়ে গেছে। আর সেজন্যই আমাদের সাহিত্যেও বাংলার ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থের এত অভাব। আজ থেকে এক শো বছর আগে (১৮৮০) বঙ্কিমচন্দ্র প্রবল আবেগময় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।··· বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।" তারপরে এক শো বছরে মাত্র একখানি পূর্ণাঙ্গ 'বাংলাদেশের ইতিহাস' আমরা পেয়েছি—ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্রের একক প্রচেষ্টায়। এক কোকিলে

বসন্ত হয় না, একখানি মাত্র ইতিহাসগ্রন্থের দ্বারা একটা জাতির লজ্জাও ঘোচে না। এই যে জাতীয় ইতিহাসের অভাব, তার কারণ আমাদের মনে এখন জাতীয় চেতনা জাগলেও সে চেতনা এখনও সক্রিয় প্রচেষ্টায় পরিণত হতে পারে নি। এই নিষ্ক্রিয়তার মূলে আছে পরিপূর্ণ সামাজিক সংহতির অভাব। এই সংহতির অভাবে শুধু যে আমাদের ইতিহাস-চেতনাই নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল হয়ে আছে তা নয়, জাতীয় সংহতির অভাবে আমাদের সাহিত্যও হয়ে আছে খণ্ডিত। এই বিষয়টা একটু বিশদভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, আমরা যে বাংলাসাহিত্যের গৌরবে গর্বিত তা সমগ্র বাঙালি জনসমষ্টির অতি অগভীর উপরের স্তরেই আবদ্ধ হয়ে আছে, এই স্বল্পায়ত উপরের স্তর ছাড়িয়ে নিচু স্তরের বিপুল জনসমাজে সঞ্চারিত হতে পারে নি। বস্তুতঃ কৃত্তিবাস ওঝা, বিজয় গুপ্ত ও মালাধর বসুর সময় থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাসাহিত্য আসলে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ, হিন্দু-সমাজের এই তিন শ্রেণীর সৃষ্টি। কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল তাদের জন্যই অভিপ্রেত। বাংলা সাহিত্যের নির্মাণকার্যে অন্য কোনো শ্রেণীর হাত প্রায় পড়েই নি বলা যায়। কারণ তারা উচ্চাঙ্গের শিক্ষাও পেত না। এর ব্যতিক্রম যা-কিছু পাওয়া গেছে তার পরিমাণ অতি সামান্য, আর গুণের বিচারে তা প্রধানতঃ লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। এখনও এই অবস্থার আশানুরূপ পরিবর্তন হয় নি। যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে তা এক দিকে যেমন আশাপ্রদ, অপর দিকে তেমনি নৈরাশ্যজনক। এ বিষয়টা বুঝিয়ে বলা দরকার।

মধ্য যুগে রাজকার্য চলত ফারসি ভাষাতে। তাই রাজকার্যলিপ্সু হিন্দুরাও মক্তব-মাদ্রাসায় ফারসি শিখত। তাদের সংখ্যা বেশি ছিল না। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান কেউ তাদের ফারসি ভাষার জ্ঞানকে ফারসি সাহিত্য রচনায় বা অন্যবিধ বিদ্যাচর্চার কাজে লাগাত বলে মনে হয় না। অথচ ফারসি ভাষা কাব্য ও ইতিহাস-রচনায় খুবই সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু মধ্য যুগের বাঙালি হিন্দু বা বাঙালি মুসলমানের লেখা ফারসি কাব্য বা ইতিহাসগ্রন্থ পাওয়া গেছে বলে জানি না। ফলে বাংলাসাহিত্যে ফারসি সাহিত্য বা ইতিহাসাদি বিদ্যার প্রভাব দেখা যায় না। হিন্দুরা শ্রেণী-নির্বিশেষে প্রায় সকলেই পাঠশালায় বাংলা পড়তে ও লিখতে এবং পাটীগণিতের প্রাথমিক অঙ্ক কষা শিখত। এই উদ্দেশ্যে 'শিশুবোধক'-জাতীয় পাঠ্যপুস্তকও রচিত হত। আর তাতেই বর্ণপরিচয়, গদ্য ও পদ্য পাঠ, চিঠিলেখার প্রণালী, নামতা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, শুভঙ্করের আর্যা,

হিসাব ও মানসাঙ্কের প্রণালী প্রভৃতি সবই থাকত। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা অনেকেই টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার পরে কাব্য, ছন্দ ও অলংকার অথবা দর্শন, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিখত। তৎকালীন বাংলাসাহিত্যেও এসব বিদ্যার অল্পাধিক প্রভাব দেখা যায়। সংস্কৃত-জানা পণ্ডিতরা বাংলাসাহিত্য রচনায় উদাসীন ছিলেন না। বস্তুতঃ রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সংস্কৃত-জানা পণ্ডিতদেরই দান। গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বা শাক্ত কবিরাও ছিলেন পরম সংস্কৃতজ্ঞ। ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্য কখনও সংস্কৃত ভাষার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় নি। সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ভাষার যোগাযোগ যেমন কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি, তেমনি দেশের উঁচু ও নীচু, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের পারস্পরিক যোগাযোগও কখনও ছিন্ন হয় নি। যাত্রাগান, কীর্তনগান, মঙ্গলগান, কবিগান, পুরাণপাঠ, কথকতা প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠানই ছিল লোক-শিক্ষার উপায়। এসব অনুষ্ঠানে ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই অবাধে যোগ দিত। এইভাবেই শিক্ষিত উঁচু শ্রেণীর আনন্দবেদনা ও চিন্তাভাবনা সঞ্চারিত হত অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত নিচু শ্রেণীর জনসাধারণের অন্তরে ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে। ছাপাখানা না থাকলেও এভাবেই তৎকালীন বাংলাসাহিত্যে ছিল শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বজনের সম্পদ্। এ সাহিত্যের প্রতি জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই ছিল সমান অধিকার ও সমান মমতা। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের তুলনায় তৎকালীন সাহিত্য হীনপ্রভ হতে পারে, কিন্তু বাঙালির 'জাতীয় সাহিত্য' বলে গণ্য হবার গৌরব তার ছিল। যে সাহিত্য কোনো জাতির সর্বস্তরের মানুষকে সমমনস্কতায় যুক্ত করে, সকলের আন্তরিক মমতায় অভিষিক্ত হয়, একমাত্র সে-সাহিত্যই কোনো দেশের জাতীয় সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য ভাবসম্পদে দীন হলেও জাতীয় সাহিত্য বলে হবার অধিকার পেয়েছিল। নগরে গ্রামে ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের কাছে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ।

কিন্তু আধুনিক বাংলাসাহিত্য ভাবসম্পদে মহিমান্বিত হলেও বাঙালির জাতীয় সাহিত্য বলে গণ্য হবার গৌরব সে অর্জন করতে পারে নি। সেকালের ন্যায় একালের বাংলাসাহিত্যও প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ—এই তিন শিক্ষিত শ্রেণীর সৃষ্টি। কিন্তু সমগ্র জাতির চিত্তে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি, দেশের সর্বত্র তার বিস্তার ঘটে নি···সে সংকুচিত হয়ে আছে নগরে এবং

স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত সমাজের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। তার মুখ্য কারণ ইংরেজি শিক্ষার ভ্রান্ত প্রণালী ও বিকৃত প্রভাব। সব সভ্য দেশেই বিদেশি ভাষা (যেমন ইংরেজি) শেখানো হয় মাতৃভাষার যোগে, আর শেখানো হয় বিদেশি সাহিত্য থেকে সম্পদ্ আহরণ-পদ্ধতি। তাতে বিদেশি ভাষা দেখা হয় সহজে এবং স্বল্প সময়ে, আর নিজের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পথও প্রশস্ত হয় স্বল্প আয়াসে। বিদেশি ভাষা লিখতে ও বলতে শেখানো হয় অল্পসংখ্যক মেধাবী ছাত্রকে। কেননা তারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে শুধু বিশেষ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদের দ্বারাই। সেজন্য দেশশুদ্ধ সবাইকে বিদেশি ভাষা লিখতে ও বলতে শেখানো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের রাজশক্তি ছিল বিদেশি। তাই এখানে ইংরেজি ভাষা ইংরেজিতেই শেখার ব্যবস্থা হল, অধিকন্তু ওই বিদেশি ভাষাকেই করা হল সমস্ত শিক্ষা ও ভাবপ্রকাশের একমাত্র বাহন। সাধারণ শিক্ষাকে সংকুচিত করার এবং উচ্চ শিক্ষাকে প্রতিহত করার এর চেয়ে ভালো উপায় আর কি হতে পারে? বিদেশি শাসকদের কাছে বিজিত জাতির অভ্যুত্থানের পথ রুদ্ধ করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি ছিল এটাই। একটা বিরাট সেনাবাহিনীর দ্বারা যা সম্ভব হত না, তাই নিঃশব্দে সম্পন্ন করা হয়েছে এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা। বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে ফোর্ট উইলিয়াম-এর চেয়েও শক্ত ঘাটি হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আর এই কূট শিক্ষানীতির ফলে আমরা বঞ্চিত হয়েছি কল্যাণপ্রসূ ইংরেজি শিক্ষার আশীর্বাদ থেকে। যদি আমাদের দেশে প্রথম থেকে সর্বস্বীকৃত পদ্ধতিতে অর্থাৎ মাতৃভাষার যোগে ইংরেজি শেখানো হত আর মাতৃভাষাকেই করা হত শিক্ষার বাহন, তা হলে অতি অল্প দিনেই ইংরেজি-বিদ্যার সুফল ফলত দেশের সর্বত্র, বাংলাসাহিত্যের বিকাশও হত দ্রুততর এবং সর্বাঙ্গীণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানও এমন দুস্তর হত না আর তার পরিণামে দেশের স্বাধীনতা অর্জনও এত বিলম্বিত হত না। মনে রাখতে হবে, বিদেশি শাসক-প্রবর্তিত ইংরেজিবিদ্যা শিক্ষার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে সামান্যসংখ্যক অসাধারণ মনস্বী ব্যক্তি কৃতিত্বের সঙ্গে সেসব বিদ্যায় পারদর্শী হতে পেরেছিলেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের মূলে আছে প্রধানতঃ তাঁদেরই প্রেরণা ও প্রচেষ্টা। এ জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন ('ভারত-কলঙ্ক', ১৮৭২)—"ইংরেজ আমাদের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদের নূতন কথা শিখাইতেছে।···যেসকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটির উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং

জাতিপ্রতিষ্ঠা।" পাদটিকায় তিনি জানিয়েছেন, এখানে 'জাতি' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে **Nationality** বা **Nation** অর্থে। ধর্ম বর্ণ ভাষা ও প্রদেশ-নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টির 'একজাতীয়ত্ব' বোধের সঞ্চারকে তিনি বলেছিলেন 'জাতি-প্রতিষ্ঠা'। আর ইংরেজি **Independence**-কে তিনি বলেছিলেন 'স্বাতন্ত্র্য'। এই 'স্বাতন্ত্র্য' ও 'একজাতীয়তা'-র ধারণা বা আদর্শ আমাদের দেশে ছিল না। এই দুই অমূল্য রত্ন আমরা লাভ করেছি ইংরেজের 'চিত্তভাণ্ডার' থেকে। কিন্তু এই দুই রত্ন ইংরেজ শাসকদের দান নয়, তারা বরং এই দুই রত্ন আহরণকে প্রতিহত করার চেষ্টাই করেছেন যথাসাধ্য। তার প্রমাণ কৃত্রিম ও দুঃসাধ্য শিক্ষাব্যবস্থা, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্‌ট, বঙ্গবিভাগ (১৯০৫), সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-ব্যবস্থা ইত্যাদি। যা হোক, ইংরেজি শিক্ষার এই সুফলকে বাংলাভাষার যোগে সর্বজনের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যেই তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন আর ইংরেজি জানা বহু মনস্বী ব্যক্তিকে প্রবর্তিত করেন বাংলাভাষা-চর্চায়। তাছাড়া, এই একই উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, গুরুদাস, লোকেন পালিত প্রমুখ মনস্বীরা সচেষ্ট হয়েছিলেন মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তৎকালীন ইংরেজিপ্রেমিক বাঙালিদের প্রতিবাদেই তা সম্ভব হয় নি। এখন অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে, এখন বাংলাকে শিক্ষার বাহনরূপে মানতে আপত্তি নেই। কিন্তু ইংরেজিকে শিক্ষার একেবারে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বস্তরে এবং সর্বজনের পক্ষেই আবশ্যিক করতে বা রাখতে এখনও অনেকেই বদ্ধপরিকর। এই ব্যবস্থায় কেউ যদি শিক্ষার কোনো স্তরে ইংরেজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে, তবে তার ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যা শেখার পথও চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। ফলে একটি তরুণ শিক্ষার্থী বিনা দোষে সারাজীবন অশিক্ষার শাস্তি ভোগ করবে আর সমস্ত দেশও একটি শিক্ষিত নাগরিকের সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। ইংরেজি লিখতে ও বলতে না পারলে এদেশে কি কেউ কখনও শিক্ষিত নাগরিক বলে গণ্য হতে পারবে না ?

এবার দেখা যাক, এক শো বছর আগে যখন দেশে ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ তুঙ্গে পৌঁছেছে তখন এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কি বলেছিলেন। 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় (১৮৭২) তিনি বলেছিলেন—"বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরেজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক।" কিন্তু ভারতীয়

ঐক্যের জন্য সব বাঙালি বা সব মারাঠির ইংরেজি শেখার আবশ্যকতা নেই, সব বাঙালি অন্য সব প্রদেশবাসীর সঙ্গে একত্র মিলিত হবে না। মিলিত হবেন শুধু সব প্রদেশের শিক্ষিত মেধাবী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই। এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ভারতীয় ঐক্যের জন্য 'যতদূর আবশ্যক', ততদূরই ইংরেজি চলুক। আমি বলি ইংরেজি শেখার প্রয়োজনীয়তা তার চেয়েও বেশি। শুধু বিভিন্ন প্রদেশবাসীর পারস্পরিক যোগরক্ষা ও ভাববিনিময়ের জন্য নয়, নানা আধুনিক বিদ্যার জ্ঞান আহরণের জন্য ইংরেজি শেক্ষা অত্যাবশ্যক। নতুবা বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্য সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ হবে না; নতুবা ভারতবাসীর মনে ব্যাপক-ভাবে একজাতীয়তাবোধ জাগবে না, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মূল্যবোধও জাগবে না। সুতরাং আমি মনে করি মেধাবী ও জ্ঞান-অর্জনে আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজি বিদ্যার প্রসার যত বেশি হয় ততই ভালো। তা বলে মেধাবী-অমেধাবী এবং আগ্রহী-অনাগ্রহী-নির্বিশেষ প্রত্যেক নাগরিককে ইংরেজি শিখতে বাধ্য করার এবং ইংরেজি শিখতে অক্ষম হলে তাকে বিদ্যা-মন্দির থেকে বহিষ্কৃত করার পক্ষপাতী আমি নই। ভারতীয় ঐক্য সাধনের অভিপ্রায়ে সকলের উপরে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া যতখানি অন্যায়; যোগ্য-অযোগ্য-নির্বিশেষে সকলের উপরে ইংরেজি চাপিয়ে দেওয়াও ততখানিই অন্যায়। শুধু অন্যায় নয়, অসম্ভবও বটে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"যদি তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি সাহেব হইতে পারিত, তবে মন্দ হইত না। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন—"এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা সম্পত্তির এবং অন্যপ্রকার পার্থক্য জন্মিতেছে। সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ।" এই ভাষা-ভেদের অবশ্যম্ভাবী ফল কি, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই।...এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বারবার বলে গেছেন উঁচুনিচু ধনীদরিদ্র উভয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধিত না হলে সমগ্র দেশের কল্যাণ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তাঁর দু-একটি উক্তি (বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা, ১৮৭২) এই—"সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই—যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি হইতে পারে না।" পরবর্তী কালে আর-এক প্রবন্ধে ('রামধন পোদ', ১৮৮১) তিনি আরও কঠোর মন্তব্য করেছেন—"সকল দেশেই বাবুর দল মর্কটসম্প্রদায়বিশেষ। শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বাহুবল।" আমরা আগেই বলেছি মধ্য যুগে বাংলার সাধারণ দরিদ্রসম্প্রদায় বর্তমানের ন্যায় এত উপেক্ষিত ও এত অশিক্ষিত ছিল না। নানা উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে উঁচুনিচু দুই সম্প্রদায়ের মিলন ঘটত, উভয়ের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হত। শিক্ষা ও বিদ্যা বিস্তারের নানা উপায় ছিল। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবেদনার অভাব ঘটতে পারে নি। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু বর্তমানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবেদনার যে একান্ত অভাব দেখা দিয়েছে তা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রই আক্ষেপ করে গেছেন সর্বাগ্রে। বস্তুতঃ এই দুই সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান ঘুচিয়ে উভয়ের মধ্যে আনন্দবেদনা ও চিন্তাভাবনার ঐক্য প্রতিষ্ঠা, এক কথায় সহৃদয়তাস্থাপনই ছিল তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই এই পত্রিকায় সূচনাতেই তিনি বলেছিলে—"এক্ষণে আমাদিগের উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র শ্রেণীর লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন।...যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন।" লক্ষ করার বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে উঁচুনিচু দুই সম্প্রদায়ের সহৃদয়তার কথা প্রসঙ্গে তাদের 'সমকক্ষতা' এবং 'বিমিশ্রণ-এর কথাও বলেছেন। এই সমকক্ষতা ও বিমিশ্রণের বিশেষ তাৎপর্য আছে। সে বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার আবশ্যকতা আছে। যা হোক, উক্ত সহৃদয়তার অভাবের মূল কারণ যে বিকৃত ইংরেজিক্ষার প্রভাব ও লোকশিক্ষার চিরাচরিত উপায়গুলির বিলোপ, সে বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ('লোকশিক্ষা', ১৮৭৮)—

> "ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্ধিত হইতেছে না।...তাহার স্থূল কারণ—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না।...ছয় কোটি যাট লক্ষের

> ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে,···বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।"

এই প্রায় সাত কোটি লোকের দুঃখদুর্দশা মর্মবেদনা ঘোচাবার একমাত্র উপায় তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। "কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই—" বঙ্কিমচন্দ্রের এই আবেদনের (১৮৭৮) পরে এক শো বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়েও দেশের দরিদ্র জনসাধারণ অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্তি তো পেলেই না, তাদের দুঃখ শিক্ষিতসমাজের হৃদয়স্পর্শও করল না। এখনও অন্তরায় ঘটাচ্ছে সেই ইংরেজির মোহ। যারা বাংলা বর্ণজ্ঞান থেকেও বঞ্চিত, আপাততঃ তাদের শুধু বাংলা শিক্ষা দিয়েই কি শুভারম্ভ করা যায় না।

'ইংরেজি শিক্ষার গুণে' দেশ থেকে লোকশিক্ষার চিরন্তন উপায়গুলি যে দিন-দিনই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও কম বেদনাবোধ করেন নি। তাঁর এই বেদনা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে (১৯৩৩)। ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ্।"

কিন্তু আমাদের দেশে লোকশিক্ষার যে স্বাভাবিক উপায়গুলি তখন স্বতঃই উদ্ভূত হয়েছিল, 'বিদেশি শিক্ষাবিধি'-র ফলে সেগুলি ক্রমে বিলুপ্ত হয়েছে আর তার পরিণামে দেখা দিয়েছে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সুগভীর বিচ্ছেদ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ('শিক্ষার বিকিরণ') এই—

> "দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনো দিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে।"

শুধু যাত্রাগান, কথকতা প্রভৃতি শিক্ষাবিস্তারের জনপ্রিয় উপায়গুলিই নয়, সাক্ষরতা-বিস্তারের উপায়স্বরূপ যে অসংখ্য পাঠশালায় দেশ ছেয়ে গিয়েছিল, বিদেশি শাসনব্যবস্থায় সেগুলিও ক্রমে লোপ পাচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উক্ত 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল, ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে।"

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আরও সবিস্তার মন্তব্য আছে তাঁর 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে (১৯৩৬)—

"আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু এডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায়, বাংলা-বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল; দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্তত ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া, প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তারই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষরপরিচয় আমাদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পড়োয়াদের সঙ্গে। · · দেশের খাল-বিল-নদী-নালায়, আজ জল শুকিয়ে এল, তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।" এ বিষয়ে অধিকতর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মোট কথা। বিদেশি শাসক-প্রবর্তিত ইংরেজি-শিক্ষার প্রণালীগত দোষে সমস্ত দেশ বহুমুখী পাশ্চাত্য বিদ্যার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারই ফলে বাংলাসাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভের সুযোগ পায় নি। ওই বিকৃত ও খণ্ডিত ইংরেজি-শিক্ষার আর-একটি কুফল এই যে, সে শিক্ষা অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, চিরপ্রচলিত লোকশিক্ষার উপায়গুলিও বিনষ্ট হল, দেশের অধিকাংশ লোক চিরাগত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ হারাল আর নূতন বিদ্যার সুযোগ না পেয়ে অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবে গেল। দেশের এমন দুর্দশা আর কখনও হয় নি।

৬

ইতিহাসের প্রভাবে এতদিন বাংলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যেভাবে পরস্পরের কাছাকাছি এসে ক্রমে একজাতীয়তার বন্ধনে সংহত হচ্ছিল, আধুনিক শিক্ষা ও সাহিত্যের ত্রুটি এবং ইংরেজ শাসকদের কূটনীতির প্রভাবে সে প্রক্রিয়াও স্তব্ধ হয়ে গেল, বরং বাঙালি জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যবধান ক্রমে বেড়েই চলেছে। আর তার ফলে দেখা দিয়েছে হিন্দু-মুসলমান তথা বর্ণহিন্দু ও অবর্ণহিন্দু ('হরিজন' বা 'তফশীলী') সম্প্রদায়ের উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ। মনে রাখতে হবে আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্য যদি বাংলার সর্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হত এবং তার পরিণামে

স্বরূপ সর্বত্র একমানসিকতা দেখা দিত, তাহলে ইংরেজের কূটনীতি আমাদের মধ্যে এই সর্বনাশা বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত না। আর,

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

কবির এই আকুল আকাঙ্ক্ষাও এমনভাবে ব্যর্থ হতে পারত না। উক্ত দ্বিবিধ বিচ্ছেদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদটাই গুরুতর। তাই এ বিষয়টা একটু বিশদভাবে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বাগ্রে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এ বিষয়টাকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। এ বিষয়টা অবতারণার পূর্বে বলা দরকার যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালা' ও 'বাঙ্গালী' শব্দ প্রসঙ্গভেদে দুই অর্থে ব্যবহার করতেন। 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে (১৮৮১। বাং ১২৮৭ ফাল্গুন) তিনি নিজেই বলেছেন—

"বাঙ্গালা নাম অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অর্থে পেশোয়ার পর্যন্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত—যথা 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি', 'বেঙ্গল আর্‌মি'। আর এক অর্থে বাঙ্গালা ততদূর বিস্তৃত না হউক,—মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা, পালামৌ উহার অন্তর্গত—এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন। [লক্ষিতব্য এ প্রসঙ্গে 'বিহার' নাম উল্লিখিত হয় নি।] এই দুই অর্থের কোন অর্থেই 'বাঙ্গালা' শব্দ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালা; আমরা সেই বাঙ্গালীর উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় 'বাঙ্গালা' শব্দের এই তিন অর্থের মধ্যে শেষ দুই অর্থেরই প্রয়োগ উহার দেখা যায় প্রসঙ্গভেদে। এই দুই অর্থের দ্বিতীয় অর্থটাই যে 'বাংলা' শব্দের মৌলিক অর্থ, অর্থাৎ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর বাসভূমি, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এই মৌলিক অর্থে বাঙালির সংখ্যা ছিল তিন কোটি। 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা'য় তিনি বার বার তিন কোটি বাঙালির কথাই বলেছেন। বৃহত্তর অর্থে 'বাঙ্গালা' শব্দে সেকালে বোঝাতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত সরকারি শাসনাধীন ভূভাগ। এই ব্যাপক অর্থে বাংলাদেশে সেকালে জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি। 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে (১৮৭৮। বাং ১২৮৫

অগ্রহায়ণ) তিনি পাঁচ বার উল্লেখ করেছেন 'ছয় কোটি ষাট লক্ষ' লোকের কথা এবং একবার 'সপ্তকোটি' লোকের কথা। লক্ষণীয় বিষয়, এই বিপুলসংখ্যক জনগণকে তিনি বার-বার বলেছেন 'মনুষ্য' বা 'লোক', আর একবার বলেছেন 'বাঙ্গালী'—অবশ্য, বৃহত্তর অর্থেই। 'দেশীয় ভাষায়' শিক্ষার অভাবে 'ছয় কোটি ষাট লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে'—বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিরা তা বোঝেন না, এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপ। এই বিপুল জনরাশির আকাশফাটা ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে একা বঙ্কিমচন্দ্রের বুকফাটা ক্রন্দনধ্বনিও যে মিশে গিয়েছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে এই 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধের সর্বত্র। তাঁর এই মর্মবেদনার কারণ কি, তা তিনি সংশয়াতীত রূপে বিবৃত করেছেন এই প্রবন্ধের প্রথম কয়েকটি বাক্যে।—

> "লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, 'বাঙ্গালা দেশে' নাকি ছয় কোটি ষাট লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাট লক্ষ মানুষের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্যই নাই। কিন্তু 'বাঙ্গালি'র দ্বারা কোন কার্যই সিদ্ধ হইতেছে না···'বাঙ্গালা'র ছয় কোটি ষাট লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য হয় না, তাহার কারণ এই যে—বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই।"

এই বিপুল জনগণের দ্বারা অসাধ্যসাধন দূরে থাক, কোনো কার্যই যে সিদ্ধ হচ্ছে না, তার এক প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। এই অকৃতকার্যতার আর-এক প্রধান কারণ নিদারুণ দারিদ্র্যের পেষণ। এই বিষয়টা আলোচিত হয়েছে তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের চার পরিচ্ছেদে। এই দীর্ঘ প্রবন্ধের সারকথা এই যে, ইংরেজ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তের ফলে দেশের অশেষ ক্ষতি হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে এক দিকে দেখা দিয়েছে পুঞ্জীভূত ধনসম্পদ্ আর অন্য দিকে চলেছে অসীম দারিদ্র্যের পীড়ন। জমিদারি ব্যবস্থার পরিবর্তে "প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে···সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত।···কেবল দুই চারি ঘরে রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত।" তাতে দেশের কল্যাণ হত। কারণ—"ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ।··· ইহাই ন্যায়সংগত।" এই নীতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

> "পাঁচ-সাত জন টাকায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই-চারি জন অতি ধনবান্ ব্যক্তির

পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। এখন যে পাঁচ-ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জনগম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।"

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের এই শেষ কয়েকটি বাক্য আর 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধের প্রথম কয়েকটি বাক্যের ভাবগত সাদৃশ্য চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। একটিতে আছে দেশের ধনবৈষম্যজাত দুর্দশার জন্য আক্ষেপ, আর একটিতে আছে দেশের জ্ঞানবৈষম্যজাত দুর্দশার জন্য আক্ষেপ। এখনও কি এই দুর্দশার অবসান হয়েছে? যা হোক, এই দুই প্রবন্ধের মধ্যে আর-একটি সামান্য পার্থক্য আছে—এক প্রবন্ধে আছে 'ছয় কোটি' প্রজার কথা, আর অন্যটিতে আছে 'ছয় কোটি ষাট লক্ষ' অথবা সোজাসুজি 'সপ্তকোটি' মানুষের কথা। মনে হয় মোটামুটিভাবে যখন সে সংখ্যাটা লেখকের সুবিধাজনক মনে হয়েছে তখন সেটাই লিখেছেন। কারণ যথাযথ সংখ্যানির্দেশ কোনো প্রবন্ধের পক্ষেই অত্যাবশ্যক নয়, তাই লেখকেরও তা অভিপ্রেত ছিল না।

এ প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আরও দুটি বিখ্যাত রচনা—'কমলাকান্তে'র 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধ এবং 'আনন্দমঠ'-এর 'বন্দেমাতরম্' গানের কথা। 'আমার দুর্গোৎসব প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১২৮১ কার্তিক। ইং ১৮৭৪) আছে—'ছয় কোটি কণ্ঠের হুঙ্কার'; 'বন্দেমাতরম্' গানে (বঙ্গদর্শন ১২৮৭ চৈত্র। ইং ১৮৮১) আছে—'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকলনিনাদ-করালে'; আর 'বঙ্গদেশের কৃষক, প্রবন্ধে আছে—'ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জনগম্ভীর মহানিনাদ'। তা ছাড়া, 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে 'ছয় কোটি ষাট লক্ষ' আর 'সপ্তকোটি' এই দুটি সংখ্যা আছে কার্যতঃ সমার্থেই। এই সংখ্যাগত অসমতা উপেক্ষণীয় বলেই মনে করি। কারণ 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে লেখকের অভিপ্রায় ছিল জনসংখ্যার আধিক্য দেখানো, সংখ্যাগত সত্যতারক্ষা নয়। তার চেয়ে বড় কথা, 'অবলা কেন মা এত বলে?'—'বন্দেমাতরম্' গানের এই খেদোক্তি অনিবার্যরূপেই মনে করিয়ে দেয়—"ছয় কোটি ষাট লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্য নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হইতেছে না।"—'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধের এই আক্ষেপোক্তির কথা।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, মৌলিকার্থে বাংলার তিন কোটি লোক এবং ব্যাপকার্থে বাংলার ছয় কোটি বা প্রায় সাত কোটি লোক, উভয় ক্ষেত্রেই

এই জনসংখ্যার মধ্যে শুধু হিন্দু নয়, মুসলমানকেও ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যাপকার্থক বাংলার ছয় বা সাত কোটি মানুষের মধ্যে বাংলাভাষী বাঙালি যেমন আছে, তেমনি অ-বাংলাভাষী বিহারি (মাগধী, মৈথিলী ও ঝাড়খণ্ডী-ভাষী) এবং ওড়িয়াও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন তা তাঁর পূর্বোদ্ধৃত উক্তিগুলি থেকেই নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। তাঁর মানসিকতা যদি সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না থাকত তবে তাঁর পক্ষে এরকম উক্তি করাই সম্ভব হত না। বন্দেমাতরম্ গানের সাত কোটি মানুষ গণনাতে একদিকে যেমন বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন জনপদবাসীকে ধরা হয়েছে, অপর দিকে তেমনি হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়কেও ধরা হয়েছে। [তবে এই গানটিতে বিশেষভাবে হিন্দুভাবসম্মত রূপকার্থ প্রয়োগ সমীচীন হয়েছে কিনা তা স্বতন্ত্র বিবেচনার বিষয়।] বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাভাষী বাঙালি সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন উক্তি থাকে। নিম্নে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃতি হল—

১। "লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক মুসলমান। ইহারা বাঙ্গালী বটে।...বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগের উৎপত্তিতত্ত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।"—বাঙ্গালীর উৎপত্তি, প্রথম পরিচ্ছেদ। ১৮৮০। বাংলা ১২৮৭ পৌষ)।

২। "এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই।...চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান।"—বাঙ্গালীর উৎপত্তি সপ্তম পরিচ্ছেদ (১৮৮১। বাং ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)।

[বাঙালি মুসলমানকে চতুর্থ শ্রেণী বলে গণ্য করা সংগত কিনা সে বিষয়ে মতান্তরেরর অবকাশ আছে।]

৩। "এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা, ইহারা অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোক—কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে

স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।"—বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (১৮৮০। বাং ১২৮৭ অগ্রহায়ণ)।

এজাতীয় চিন্তা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকেরই যোগ্য চিন্তা। বিশেষ করে এর শেষ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় বাঙালি মুসলমান সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও অনুভূতি কত গভীর ছিল। এ সম্বন্ধে আর-একটি বিষয়ও ভেবে দেখা দরকার। বাংলার কৃষকদের দুঃখদুর্দশা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র যে বেদনা বোধ করতেন, তার অনেকটাই ছিল বাংলার মুসলমানদের জন্য। কারণ অধিকাংশ মুসলমানই যে কৃষিজীবী সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। আর, 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি যে ছয় কোটি প্রজার 'সমুদ্রগর্জনগম্ভীর মহানিনাদ'-এর কথা বলেছেন, সে মহানিনাদের অর্ধেকই যে বাঙালি মুসলমানের কণ্ঠসমুত্থিত, তাও বঙ্কিমচন্দ্রের জানা ছিল বেশ ভালো করেই।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেসব প্রশ্ন তুলেছেন তার সদুত্তর কেউ দিয়েছেন কিনা তা আমার জানা নেই। এ বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এ সম্পর্কে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। সুযোগ পেলে সময়ান্তরে তা প্রকাশ করা যাবে।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে (ইং ১৮৭০) প্রথম পরিচ্ছেদের গোড়াতেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—"ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি, আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।" কিন্তু আমাদের দেশজোড়া বৃহৎ কৃষকসম্প্রদায়ের যে দুই প্রতিনিধি হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত, "উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?" তার পরেই তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—"যেখানে তাহাদে মঙ্গল নাই সেখানে দেশের মঙ্গল নাই।" কেননা, বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনায় হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত আসলে সমগ্র দেশেরই প্রতিনিধি। তাই তিনি বলেছেন—"তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন?...হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।" দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র দেশের প্রতিনিধি হিসাবে হাসিম শেখের নাম উল্লেখ করতে ভোলেন নি—শুধু তাই নয়, তিনি হাসিমকে অগ্রাধিকার দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। এর থেকেও

নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির জাতীয় জীবনে মুসলমানকে কতখানি গুরুত্ব দিতেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২) প্রণীত 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু' নামক কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালে (বাং ১২৭৯ পৌষ)। এই গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছিলেন তার প্রণিধানযোগ্যতা এখনও ফুরিয়ে যায় নি। তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

> "এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।
>
> "ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এখানে পৃথক্—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে, হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা, জাতীয় ঐক্যের মূলে ভাষার একতা। অতএব মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন।"—বঙ্গদর্শন, ১২৮০ পৌষ। ইং ১৮৭৪।

এই মন্তব্যের প্রত্যেকটি বাক্য মূল্যবান্। উপরে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সহৃদয়তার যে অভাবের কথা বলেছেন, 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা'তেই (১৮৭২) তিনি সে কথা বলেছিলেন প্রসঙ্গনিরপেক্ষভাবে। তিনি বলেছিলেন—"এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক।" আর 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধেও (১৮৭৮) তাঁর এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে আরও জোরালো ভাষায়।

মোট কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা যত্নসহকারে অনুধাবন করলে নিঃসন্দেহে বোঝা যাবে যে, তিনিই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী, প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা তাঁর চিন্তায় লেশমাত্রও স্থান পায় নি।

যদি সে সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ও মীর মশার্‌রফের ভাবগত আদর্শ ব্যাপক-ভাবে স্বীকৃত ও অনুসৃত হত, অর্থাৎ যদি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাঞ্ছিত সহৃদয়তা জন্মিত এবং শিক্ষিত মুসলমানরা মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা সাহিত্য-চর্চায় নিরত হতেন, তাহলে বাঙালির জাতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হত না। বাঙালির ভাগ্যে এত বিপর্যয় আর এত দুঃখদুর্দশাও ঘটতে পারত না। সুখের বিষয়, বর্তমান সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলাতেই মুসলমান বাঙালিরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় নিরত হয়েছেন। ফলে বাংলা-সাহিত্যের খণ্ডতাও অনেকাংশে ঘুচতে শুরু করেছে। পূর্বে বলেছি, যে-সাহিত্য একটা জাতির সর্বাংশে ও সর্বস্তরে সঞ্চারিত হয় না, সে-সাহিত্যকে 'জাতীয় সাহিত্য' বলা যায় না। কিছুকাল যাবৎ বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোজীবন তথা সমাজজীবনের প্রতিফলন ঘটছে বাংলাসাহিত্যে। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু যে ভাববিনিময় চলছে তা নয়, ভাবমিশ্রণও চলছে। পরিণামে দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক যোগাযোগের পথও প্রশস্ত হচ্ছে। অপর দিকে অনুন্নত হিন্দুসম্প্রদায়গুলিও যে অচিরেই শিক্ষা ও সাহিত্য-জগতে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করবে তার শুভসূচনা দেখা যাচ্ছে। বাঙালি জাতির এই তিন ভাবধারা যেদিন এক ত্রিবেণীসংগমে এসে একত্র মিলিত হবে সেদিনই বাংলাসাহিত্য দেখা দেবে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের পুণ্যতীর্থ রূপে। সেই শুভদিনের আবির্ভাব একান্তভাবেই নির্ভর করে আমাদের জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে, মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকৃতিদানের উপরে। সমাজের সর্বস্তরে মাতৃভাষা-যোগে শিক্ষার সম্প্রসারণ যত দ্রুত হবে, আমাদের সাহিত্যের সেই বাঞ্ছিত পরিণতিও তত দ্রুত এগিয়ে আসবে।

অনুষঙ্গ

ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই-একজন হতভাগ্য আছে, যে পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই-এক হতভাগ্য জাতি আছে, যে কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।

—বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৭৫)

১। সুহ্ম ও ব্রহ্ম

মহাভারতে ভীমের দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে সুহ্ম ও প্রসুহ্ম, এই দুই জনপদের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন—'সুহ্মা রাঢ়াঃ'। অর্থাৎ তাঁর মতে সুহ্ম ও রাঢ় অভিন্নার্থক। আসলে সুহ্ম শুধু দক্ষিণ রাঢ়েরই নামান্তর, সমগ্র রাঢ়ের নয়। একটু পরেই তা দেখানো যাবে। জৈন 'আচারাঙ্গ সূত্রে' আছে, রাঢ়ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত আর এই দুই ভাগের নাম 'সুব্ভভূমি' ও 'বজ্জভূমি'। সুব্ভভূমি যে 'সুহ্মভূমি'র রূপান্তর, এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু বজ্জভূমি নাম 'বজ্রভূমি'-র রূপান্তর কিনা, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। কারণ বজ্রভূমি নামক কোনো জনপদের উল্লেখ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তাছাড়া, ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মনে করেন ওই অঞ্চলে হীরে পাওয়া যেত বলেই তার নাম হয়েছে 'বজ্রভূমি' অর্থাৎ হীরের দেশ। আচারাঙ্গ সূত্র রচনার সময়ে রাঢ়ভূমিতে কোথাও হীরে পাওয়া যেত এমন কোনো প্রমাণ নেই। যদি সেখানে সত্যই হীরে পাওয়া যেত তবে প্রাচীন সাহিত্যে তার আরও উল্লেখ থাকাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তেমন কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় নি। তাছাড়া বজ্জভূমি নামটা যদি অর্থবহ শব্দ হয়ে থাকে তবে সুহ্মভূমি নামটাও তাই হত। আসলে 'সুব্ভ' (সুহ্ম) আর 'বজ্জ' (তার মূলরূপ যা-ই হোক) এই দুটি নামই অর্থহীন রূঢ় শব্দ, অঙ্গ বঙ্গ পুণ্ড্র প্রভৃতি শব্দের মতো। আমার বিশ্বাস 'বজ্জভূমি' নামটা 'ব্রহ্মভূমি' নামের বিকার মাত্র। আমার এই ধারণার কারণ কি, একটু পরেই তা বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করব।

অন্ততঃ নবম শতক থেকেই সমগ্র রাঢ় প্রদেশকে যে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হত, তার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর দক্ষিণ রাঢ়েরই বিশেষ নাম যে সুহ্মভূমি সে বিষয়েও সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ প্রসিদ্ধ কবি দণ্ডী-প্রণীত 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থে (আনু. সপ্তম বা অষ্টম শতক) দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) সুহ্মভূমির অন্তর্গত বলে উক্ত হয়েছে। তাম্রলিপ্ত দক্ষিণ রাঢ়েরই অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং দক্ষিণ রাঢ়ই যে এককালে সুহ্মভূমি নামে পরিচিত ছিল তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। লক্ষ্মণসেনের (দ্বাদশ শতক) সভাকবি ধোয়ী-রচিত 'পবনদূত' কাব্যের বর্ণনা (শ্লোক ২৭-৩২) থেকেও বোঝা যায়, 'সুহ্মদেশ' রাঢ়ভূমির দক্ষিণাংশেই অবস্থিত ছিল।

পঞ্চম শতকের কবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে (৪।৩৫) সুহ্ম নামের

উল্লেখ আছে, সে কথা যথাস্থানে আগেই বলা হয়েছে। বরাহমিহির-প্রণীত 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থের (ষষ্ঠ শতক) চতুর্দশ অধ্যায়ে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ ও উপবঙ্গ নামের সঙ্গে সুহ্ম ও বর্ধমান নামের উল্লেখ আছে। আর ষোড়শ অধ্যায়ে আছে বঙ্গ, সুহ্ম ও বর্ধমান[১] নামের উল্লেখ। এর থেকে বোঝা যায়, সে সময়ে এক দিকে তাম্রলিপ্তি আর অন্য দিকে বর্ধমান অঞ্চল সুহ্মের অন্তর্গত ছিল না। তার পরে বাংলার রাজা রাজ্যপালের (আনু ৯১৭-৫২) ভাতুড়িয়া শিলা-প্রশস্তিতে এবং নয়পালের (আনু ১০২৭-৪৩) শিয়ান শিলা-প্রশস্তিতেও সুহ্মদেশ, সুহ্মরাজ ও সুহ্মজাতির উল্লেখ দেখা যায়।[২] বোধ করি সুহ্মদেশ-এর শেষ উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বাদশ শতকের কবি ধোয়ী-র পূর্বোক্ত 'পবনদূত' কাব্যে।

ব্রহ্ম জনপদের প্রথম সংশয়াতীত উল্লেখ পাওয়া যায় কবি-নাট্যকার রাজশেখর-এর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে (দশম শতক)। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্য জনপদ-সমূহের যে তালিকা আছে তাতে সুহ্ম ও ব্রহ্ম, এই দুই জনপদের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় পাশাপাশি—'অঙ্গবঙ্গ-সুহ্মব্রহ্ম-পুণ্ড্রাদ্যা জনপদাঃ'। আর সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে—'... সুহ্মব্রহ্মোত্তর-প্রভৃতয়ো জনপদাঃ'। প্রথম তালিকাটি হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতো সদাসতর্ক ইতিহাস-স্রষ্টারও চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই দ্বিতীয় তালিকার 'ব্রহ্মোত্তর' শব্দটা তাঁর মনে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। ফলে 'ব্রহ্মোত্তর' শব্দটা তাঁর মনে একটি স্বতন্ত্র জনপদের নাম বলেই প্রতীত হয়েছে। 'ব্রহ্মোত্তর' শব্দ কয়েকটি পুরাণে এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (১৪।৪৪) জনপদ-নামের তালিকাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু সেসব তালিকায় ব্রহ্মোত্তর শব্দের পূর্বে সুহ্ম নামটাই বাদ পড়েছে। তাই স্বভাবতঃই 'ব্রহ্মোত্তর' কথাটা জনপদবিশেষের নাম বলেই ভ্রম হয়। আসলে পুরাণ ও নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত পাঠ বহুলাংশেই বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর। পুরাণের এই বিকৃত পাঠের উপরে নির্ভর করায় ফলে 'ব্রহ্মোত্তর' শব্দ সম্পর্কে যে ভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল, পরবর্তী কালে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'-তেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক কালে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতো

---

১. 'বর্ধমান' নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে।

২. দ্রষ্টব্য দীনেশচন্দ্র সরকার-প্রণীত 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ' (১৯৮২), পৃ ১০৩, ১১৪, ১৮৩ এবং ১৮৬।

তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকও এই ভ্রান্তি এড়াতে পারেন নি। আসলে 'ব্রহ্মোত্তর' শব্দটা যে 'ব্রহ্ম' এবং 'উত্তর' এই দুই শব্দের সমাসবদ্ধ রূপ, তা বোঝা যায় 'সুহ্মব্রহ্মপুণ্ড্রাত্যাঃ' এবং 'সুহ্মব্রহ্মোত্তর' এই দুই উক্তির মিলিত সাক্ষ্য থেকেই। 'সুহ্মব্রহ্মোত্তর, কথার মানে 'সুহ্ম এবং তার উত্তরস্থিত ব্রহ্ম' অথবা 'সুহ্ম এবং তৎসহ ব্রহ্ম'। 'সুহ্ম' বর্জিত হলে শুধু 'ব্রহ্মোত্তর' তার আসল তাৎপর্যই হারায়। পুরাণে এবং নাট্যশাস্ত্রে তাই হয়েছে। এইজন্যই আধুনিক ঐতিহাসিকদের মনেও ঘটেছে গুরুতর ভ্রান্তি।

দ্বাদশ শতকের 'পবনদূত' কাব্যে দেখা যায়, দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত পবন প্রথমে এল 'সুহ্মদেশে' এবং তৎপরে ('অথ') গেল 'ব্রহ্মদেশে'। তাতেও বোঝা যায়, ব্রহ্ম অবস্থিত ছিল সুহ্মের উত্তরে। 'সুহ্মব্রহ্মোত্তর' কথার তাৎপর্যও তাই। এর থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, সেকালে দক্ষিণ রাঢ় পরিচিত ছিল 'সুহ্ম' নামে আর উত্তর রাঢ়ের নাম ছিল 'ব্রহ্ম'।

আশ্চর্যের বিষয়, এ ক্ষেত্রেও 'পবনদূত'-এর সম্পাদক সুপণ্ডিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, এই দুইজনই উল্লিখিত 'অথ' শব্দটির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি, তাই তাঁদের ধারণা হয়েছে এখানে সুহ্ম শব্দটাই লিপিকর-প্রমাদের ফলে 'ব্রহ্ম' রূপ ধারণ করেছে। অথচ যে কয়টি পাণ্ডুলিপির সহায়তায় 'পবনদূত' কাব্য সম্পাদিত হয়েছে তার সবগুলিতেই আছে 'ব্রহ্ম'। আসলে 'ব্রহ্ম'-নামক কোনো জনপদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তাঁরা সন্দিহান ছিলেন, আর সেজন্যই তাঁরা সবগুলি পাণ্ডুলিপির 'ব্রহ্ম' শব্দকেই লিপিকরপ্রমাদ বলে ধরে নিয়েছেন। ফলে উক্ত 'অথ' শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি।

মোট কথা। আমার বিশ্বাস উত্তর রাঢ় অর্থাৎ ব্রহ্মই মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে 'প্রসুহ্ম' নামে। আর, জৈন আচারাঙ্গ সূত্রের 'বজ্জভূমি' শব্দটাও বোধহয় আসলে 'ব্রহ্মভূমি' নামেরই ভ্রান্তিপ্রসূত বিকৃত রূপ মাত্র। যদি তাই হয়, তবে আধুনিক 'বীরভূম' নামটা প্রাচীন 'ব্রহ্মভূমি' নাম থেকেই উৎপন্ন কিনা তাও ভেবে দেখা উচিত বলে মনে করি।

আরব-লেখক আল মাসুদি-র বিবরণে 'রুহ্ম' নামে একটি ভারতীয় দেশের নাম পাওয়া যায়। আর-এক আরব-লেখক সুলেমান-এর বিবরণে (নবম শতক) এই নামটাই উল্লিখিত হয়েছে 'রাহ্মি' (বা 'রহ্মি') রূপে। [illegible] (বা রাহ্মি) যে পাল-রাজাদের শাসনাধীন বাংলাদেশ, [illegible] বিষয়ে ঐতিহাসিকদের

মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু পাল-রাজাদের রাজ্যকে 'রুহ্ম' বলা হল কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেউ চেষ্টিত হন নি। আমার মনে হয় 'রুহ্ম' নামটা 'ব্রহ্ম' নামেরই রূপান্তর আর রুহ্ম শব্দটাই যে বিকৃত হয়েছে রাহ্মি বা রুহ্মি-তে, তাতে সন্দেহ নেই। দেবপালের সময় থেকেই পাল-রাজারা 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন। একাদশ শতকে রচিত কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক) আছে— "গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া ততো

ভূরিশ্রেষ্ঠিকনাম ধাম পরমম্‌…।"

বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণ মিশ্রের সময়ে (একাদশ শতক) রাঢ়া ছিল গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্গত আর ভূরিশ্রেষ্ঠি গ্রাম (আধুনিক ভুরশুট) ছিল রাঢ়ের অন্তর্গত। এই রাঢ়া যে 'দক্ষিণ রাঢ়' (অর্থাৎ সুহ্ম), তাও উক্ত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কেই বলা হয়েছে।[১] সুতরাং উত্তর রাঢ় বা ব্রহ্মও যে গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের রাজধানী 'বিজয়পুর' যে উত্তর রাঢ় বা ব্রহ্ম-দেশের অন্তর্গত ত্রিবেণী-সংগমের নিকটে অবস্থিত ছিল, তাও পবনদূত কাব্যের (শ্লোক ৩৩-৩৬) বর্ণনা থেকে জানা যায়। সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বর দেবপাল-প্রমুখ পাল-রাজাদের অন্যতম মুখ্য রাজধানীও এই ব্রহ্মদেশে (অর্থাৎ উত্তর রাঢ়ে) গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ কোনো নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর সেজন্যই তাঁদের শাসনাধীন সমগ্র দেশটাই আল মাসুদি-র বিবরণে রুহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম নামে আখ্যাত হয়েছে। মনে হয় প্রসিদ্ধ গৌড়রাষ্ট্রই এক কালে ব্রহ্ম (রুহ্ম) নামেও অভিহিত হত।

টীকাকার মল্লিনাথ (চতুর্দশ শতক) 'রঘুবংশ' কাব্যোক্ত 'সুহ্মৈঃ' শব্দের টীকায় বলেছেন—"সুহ্মৈঃ সুহ্মদেশীয়ৈঃ ব্রহ্মদেশীয়ৈঃ রাজভিঃ ইতি বল্লভো ব্যাচষ্টে।" এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, 'ব্রহ্ম' নামক একটি প্রাচ্য জনপদ

---

১. বস্তুতঃ গৌড়রাষ্ট্র যে কখনও কখনও সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় কান্যকুব্জের মৌখরি-বংশীয় অধিপতি ঈশানবর্মার হরাহা অভিলেখে (ষষ্ঠ শতক) এবং কবি বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহো' (গৌড়বধ) নামক কাব্যে (অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ)। বাক্‌পতিরাজ ছিলেন কান্যকুব্জেরাজ যশোবর্মার সভাকবি। দ্রষ্টব্য গ্রন্থের শেষে 'অনুষঙ্গ' বিভাগে 'গৌড়' প্রসঙ্গ।

খ্যা রাজ্য' টীকাকার বল্লভদেবের (দ্বাদশ শতক) অজ্ঞাত ছিল না। বল্লভদেব পবনদূত-রচয়িতা কবি ধোয়ী-র কাছাকাছি সময়েরই লোক।

সুখের বিষয় ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে (১৯৪৮) এবং দুটি মানচিত্রে সুহ্ম ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছেন, এ বিষয়ে ইতিহাসাচার্য হেমচন্দ্রের মতান্তরের কথা তাঁর জানা থাকা সত্ত্বেও। এটা আমার পক্ষে কম আনন্দ ও সন্তোষের বিষয় নয়।

এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—(১) প্রবোধচন্দ্র সেন: *Some Janapadas of Ancient Radha* (**Indian Historical Quarterly, 1933 September, pp. 521-34**), 'প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয়'—দুই মানচিত্র সহ (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৩ বৈশাখ-আষাঢ়) এবং 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস' গ্রন্থ (১৯৭৩), ভূমিকা, পৃ v-vi। (২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত History *of Bengal*, vol. *I* (**1943 May**), **Ch. I, pp. 9, 33, 36 ; Ch. VI, p. 122** এবং **Ch. XVI, p. 655**। (৩) নীহাররঞ্জন রায়: 'বাঙালীর ইতিহাস' (১৯৪৮। বাং ১৩৫৬ মাঘ), তৃতীয় অধ্যায়, পৃ ১৪৭ এবং ৫ ও ৬নং মানচিত্র।

২। বঙ্গ

কেউ কেউ মনে করেন **বঙ্গ** নামের উল্লেখ আছে বৈদিক ঐতরেয় আরণ্যকে। কিন্তু অনেকে তা স্বীকার করেন না। বঙ্গ নামের প্রথম সংশয়াতীত উল্লেখ পাওয়া যায় বোধায়নের ধর্মসূত্রে। কিন্তু ঐ ধর্মসূত্রের সময়ে বঙ্গ অনার্য-জনপদ বলেই গণ্য ছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও (খ্রী-পূ দ্বিতীয় শতক) বঙ্গজনপদ আর্যাবর্তভুক্ত বলে স্বীকৃত হয় নি। মনুসংহিতা রচনাকালে (খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক) বঙ্গজনপদ আর্যাবর্তের অন্তর্গত বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। রামায়ণ এবং মহাভারত রচনার সময়ে বঙ্গজনপদ আর অনার্য বা ম্লেচ্ছ-ভূমি বলে অবজ্ঞাত ছিল না।

৩। গৌড়

গৌড়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় পাণিনির ব্যাকরণে (আনু. খ্রী-পূ পঞ্চম শতক), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রে। কিন্তু গৌড় ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে গৌড়ের গৌরবখ্যাতি বাংলাদেশের বাইরে বহুদূর

পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মা গৌড় ও বঙ্গ এই দুই রাজ্যই অধিকার করেন। বোধ হয় এসময় থেকেই সমগ্র বাংলাদেশ 'গৌড়বঙ্গ' এই যুক্ত নামে পরিচিত হতে থাকে। পরে বঙ্গাধিপতি পালসম্রাট্‌রা 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করার ফলে সমগ্র বাংলাদেশ শুধু গৌড় নামেও পরিচিত হতে থাকে। সপ্তম-অষ্টম শতকের সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে যে 'গৌড়ী রীতি'-র উল্লেখ দেখা যায় তাও আসলে বঙ্গীয় রীতিরই নামান্তর মাত্র। অথচ বঙ্গ বা বঙ্গাল নামের গুরুত্ব কখনও কমে নি। তাই বাদশা আকবরের রাজত্বকালে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশকেই বলা হল 'সুবা বাঙ্গালা'। এইভাবে গৌড় ও বাঙ্গালা সমার্থক বলে গণ্য হল। বাদশা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (সপ্তদশ শতক) শায়েস্তা খানের শাসনাধীন 'সুবা বাঙ্গালা'কে 'গৌড়-মণ্ডল' নামে উল্লেখ করার নিদর্শন আছে। রামমোহন ও মধুসূদনের গৌড় শব্দের প্রয়োগ এই ঐতিহ্যেরই অনুবর্তন মাত্র।

এ প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, গৌড় নামের গুরুত্ব শুধু ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। এই নাম সামাজিক ক্ষেত্রে রাঢ়, বরেন্দ্র বা বঙ্গ নামের মতো কোনো গুরুত্ব অর্জন করতে পারে নি। তাই শেষোক্ত তিন নাম এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে। কিন্তু গৌড় নাম একেবারেই অচল হয়ে গেছে।

নির্দেশিকা

উদ্ধৃতি

ব্যক্তি

ভাষা ও সাহিত্য

বিবিধ